বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান

ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়
এম. এ, পি. আর. এস, পি. এইচ. ডি,
স্যার আশুতোষ স্মৃতি স্বর্ণপদক প্রাপ্ত
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ক্যালকাটা পাবলিকেশনস্
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক ঃ
মলয়েন্দ্র কুমার সেন
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৫৮

প্রচ্ছদ ঃ মনীন্দ্র মিত্র

মুদ্রক ঃ
এঞ্জেলা প্রেস এণ্ড পাবলিসিটি
৭এ, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট
কলিকাতা-১

উৎসর্গ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ও
'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' অধ্যাপক
ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ও
হাওড়া বিজয়কৃষ্ণ গার্লস কলেজের উপাধ্যক্ষা
শ্রীমতী বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীচরণকমলেষু

সূচী

নিবেদন

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিস্তীর্ণ ভূমিতে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে বহুবিধ প্রভাব। এই প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে অনেকে বলেছেন একদিকে সুপ্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য অন্যদিকে নবাগত পাশ্চাত্য সাহিত্যের হাত ধরেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আবির্ভাব ঘটেছিল। তাই তাঁরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উপর অন্য সাহিত্যের প্রভাবকে দুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। প্রথমতঃ সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব, দ্বিতীয়তঃ পাশ্চত্য সাহিত্যের প্রভাব। ইতিপূর্বে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য প্রভাব নিয়ে বহু গবেষণা-গ্রন্থ রচিত হয়েছে এবং এখনও রচিত হচ্ছে। কিন্তু এই দুই প্রভাবের আড়ালে আর একটি সক্রিয় প্রভাব যে বাংলা সাহিত্যকে চিরকাল প্রেরণা দিয়ে এসেছে সেটি লক্ষ্য করা হয়নি; তা হচ্ছে মৌখিক ঐতিহ্য বা লৌকিক প্রভাব।

পৃথিবীর সব দেশেই সাহিত্যের দুটি ধারা, একটি লিখিত এবং অপরটি অলিখিত। সংস্কৃতিরও দুটি রূপ, একটি শাস্ত্রীয় রূপ, অপরটি লৌকিক রূপ। সাহিত্য ও সংস্কৃতির এই দুটি রূপ যে ভিন্ন নয়, পরস্পরের সঙ্গে বিশেষ ভাবে সংযুক্ত সে বিষয়ে এতদিন লক্ষ্য করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর লোকসাহিত্য গ্রন্থে বলেছেন "—গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যেই অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে।…এইরূপ নিম্নসাহিত্য এবং উচ্চ সাহিত্যের মধ্যে একটি বরাবর ভিতরকার যোগ আছে। যে অংশ আকাশের দিকে আছে তাহার ফুল এবং ডাল পালার সঙ্গে মাটির নিচেকার শিকড়গুলার তুলনা হয় না—তবু তত্ত্ববিদদের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে।"

রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্যটিকে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করে বর্তমান আলোচনায় দেখাতে চেয়েছি যে আধুনিক বাংলা সাহিত্য কেবলমাত্র পাশ্চাত্য সাহিত্যের 'প্রোডাক্ট' নয়, বা সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিকের অনুকরণেই এই সাহিত্য গড়ে ওঠে নি, এর পিছনে আছে একটি লৌকিক ঐতিহ্যের অনুপ্রেরণা। লোক সাহিত্যও লৌকিক সংস্কৃতির বহু উপাদানে (বিষয়বস্তু ও

আঙ্গিকগত) সমৃদ্ধ হয়ে আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে একান্তভাবে বাঙ্গালী ও বাঙ্গলাদেশের সাহিত্য তা বিশেষভাবে প্রমাণ করেছে।

এ ধরনের ব্যাপক ও বিস্তৃতভাবে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উপর লৌকিক প্রভাব' এর কাজ ইতিপূর্বে হয়নি। তাই উল্লেখযোগ্য রেফারেন্স গ্রন্থের অভাবে কেবল মাত্র আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মূল্যবান উপদেশের উপর ভিত্তি করেই আমাকে একটি সম্পূর্ণ নুতন পথে কাজ করতে হয়েছে। নির্দেশক গ্রন্থ 'রেফারেন্স বুক' ছাড়াই কাজ করতে গিয়ে একটি নুতন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয়েছে সেটি হচ্ছে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গ্রন্থগুলির ভিতরে যে লৌকিক ঐতিহ্য ও উপাদানের ধারা প্রবাহিত তাকে প্রমাণ করতে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত লোক সাহিত্যের ও সংস্কৃতির উপাদানগুলি বিশেষভাবে উদাহরণ হিসাবে ব্যবহার করতে হয়েছে। লিখিত সাহিত্যের সঙ্গে সাদৃশ্যমূলক তুলনার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্র থেকে সংগৃহীত লোক সাহিত্যের বা মৌখিক সাহিত্যের ব্যবহার ইতিপূর্বে ব্যাপকভাবে হয়নি।

বর্তমান গ্রন্থে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের পিছনে লোকায়ত সংস্কৃতির বিচিত্র প্রভাব কি ভাবে ক্রিয়াশীল ছিল তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় উপস্থিত করা হয়েছে। বাংলা উপন্যাসের সূচনার যুগে বঙ্কিম থেকে শুরু করে পরবর্তী ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় পর্যন্ত বাংলা উপন্যাস কিভাবে লৌকিক উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তার কিছু কিছু নমুনা ও পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নাটক, কাব্য ইত্যাদির মত উপন্যাসের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য প্রভাবের পাশাপাশি আর একটি তৃতীয় প্রভাব বিদ্যমান—সেটি হচ্ছে লৌকিক ঐতিহ্যের ধারা। লোকায়ত সংস্কৃতির প্রাণরসেই পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে প্রত্যেক জাতির প্রাণরস। লৌকিক ঐতিহ্য ছাড়া কোন জাতির সাহিত্য ও সংস্কৃতি সংবর্দ্ধিত হতে পারে না।

আমার লোকসংস্কৃতির দীক্ষাগুরু ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যকে প্রণাম জানাই। তাঁর দীর্ঘ ভূমিকাটি আমার গ্রন্থটির কেবল মূল্যবৃদ্ধিই করেনি লোকায়ত সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের নবমূল্যায়ণের যে প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে তাকে প্রকৃত মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করছে।

আমার শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা শ্রীমতী বিনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে

আমার প্রণতি নিবেদন করি। কারণ তাঁদের মূল্যবান উপদেশ ও সস্নেহ পরামর্শ এ গ্রন্থটি প্রকাশের পথ সুগম করে দিয়েছে।

বাংলা সাহিত্য একাডেমির পরিচালক শ্রদ্ধেয় শ্রীবিনয় সরকার, বন্ধুবর ডঃ তুষারকান্তি মহাপাত্র, অধ্যাপক সনৎকুমার মিত্র ও শ্রীরবীন্দ্র নাথ গুপ্তকে আমার গ্রন্থ রচনায় নানা ক্ষেত্রে উৎসাহ, পরামর্শ এবং প্রত্যক্ষ সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আর যে দুজনের প্রত্যক্ষ সাহায্য এবং সক্রিয় পরামর্শ না হলে গ্রন্থটির এত দ্রুত প্রকাশ সম্ভবপর হোত না সেই দুই বন্ধুবের শ্রীমলয়েন্দ্র কুমার সেন এবং শ্রীসনৎ বসুকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাই। তাঁদের কার্যাবলী ধন্যবাদের অতীত বলেই তাঁদের ধন্যবাদ জানালাম না।

ভূমিকা

কোনও কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত যুক্তিতর্ক এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ-প্রয়োগ ব্যবহার করিয়া এই কথা প্রমাণিত করিয়াছিলেন যে, পাশ্চাত্য জগতে প্রাচীন ও মধ্য যুগে প্রচলিত সমগ্র কথাসাহিত্য ভারতবর্ষ হইতে নানা সূত্রে সেই দেশে গিয়াছিল, তারপর সেইখানে গিয়া তাহা নানা আঞ্চলিক রূপ লাভ করিয়াছে। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে দেখা যাইবে যে পাশ্চাত্য জগৎ আধুনিক কথাসাহিত্যে যে সমৃদ্ধিই লাভ করুক না কেন, তাহার ভিত্তি ভারতীয় উপাদানে গঠিত হইয়াছিল। আর এই কথাও সত্য, পাশ্চাত্য জগতের সকল দেশেই লৌকিক কথাসাহিত্য ক্রম-বিকাশের সূত্রে আধুনিক কথাসাহিত্যে পরিণত হইয়াছে। বাংলা দেশে যেমন খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষার সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে আধুনিক কথাসাহিত্যে জন্ম হইয়াছে, পাশ্চাত্য কোনও দেশেই তাহা হয় নাই। সেখানে সর্বত্রই লৌকিক কথাসাহিত্যই ক্রমবিকাশ লাভ করিয়া যুগের জীবন ও চিন্তাধারার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক কথাসাহিত্যের রূপ লাভ করিয়াছে।

খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে যখন সর্বপ্রথম বাংলা উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হইল, তখন তাহার মধ্যে পাশ্চাত্য উপাদান যতখানি ছিল, ততখানিই যদি প্রাচ্য উপকরণও না থাকিত, তবে তাহা এই দেশের পাঠক সমাজ কিছুতেই গ্রহণ করিত না, তাহা মুষ্টিমেয় চিন্তা ও ভাব-বিলাসীর সৃষ্টি বলিয়া সাধারণ পাঠক পরিত্যাগ করিত। অথচ আমরা দেখিতে পাইলাম, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি প্রথম আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই রূপকথার মত বাংলার সাধারণ জনসমাজের মধ্যে অতি সহজেই প্রচার লাভ করিল। অনেক সময় সেই যুগের ঠাকুমা-দিদিমারা রূপকথার সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশ নন্দিনী' 'দেবী চৌধুরানী' ইত্যাদির কাহিনী মুখে মুখে তাঁহাদের শিশু শ্রোতৃমণ্ডলীকে শুনাইতেন। (বর্তমান লেখক তাঁহার নিরক্ষরা দিদিমার মুখ হইতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরানী'র কাহিনী শৈশবে সর্বপ্রথম শুনিয়াছিল।) অথচ সেই যুগে চলচ্চিত্রের প্রচলন হয় নাই, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কাহিনীগুলি নিরক্ষর সমাজের মধ্যে মুখে মুখেই সেদিন প্রচার লাভ করিয়াছিল এবং ইহাদের শ্রোতৃবর্গ তাহা জীবনে গ্রহণ করিয়াছিল, সময় এবং সুযোগ মত তাহারাই তাহা নিজেরা প্রচার

করিয়াছে। তাহার ফলেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের কাহিনী আজও জাতির কিংবদন্তীর মত হইয়া আছে। সারা উত্তর বাংলা জুড়িয়া 'দেবী চৌধুরানী' ও 'আনন্দ মঠে'র কিংবদন্তী ছড়াইয়া আছে, কোন্নগরে গেলে এই কথা কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে এখানে 'বিষবৃক্ষে'র নায়িকা সূর্যমুখীর পিত্রালয় ছিল, কাঁথির সমুদ্রতীরে কাপালিকের আশ্রম কিংবা অধিকারীর কালীবাড়ী এখনও লোকে দেখাইয়া দেয়। অথচ ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত বাংলা সাহিত্যের পাশ্চাত্ত্য ধারার সমালোচকগণ ত একেবারে উদ্ধৃতি সহযোগে দেখাইয়া দিবেন যে বঙ্কিমচন্দ্র স্যার ওয়ালটার স্কটের উপন্যাস 'আইভান হো' কিংবা আরও কত লেখকের রচনার কোন্ কোন্ অংশ কি ভাবে অনুকরণ করিয়া তাঁহার উপন্যাসগুলি রচনা করিয়াছেন।

এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, বঙ্কিমচন্দ্র যদি তাঁহার উপন্যাসগুলি একান্তভাবে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণ করিয়াই রচনা করিতেন, তাহাদের মধ্যে যদি বাঙ্গালীর জীবন-সংস্কারের বহির্মুখী এবং অন্তর্মুখী গভীরতর স্পর্শ কিছু না থাকিত, তবে তাহাদের কাহিনী বাঙ্গালীর জীবনের সর্বস্তরে এমন কিংবদন্তী সৃষ্টি করিতে পারিত না। জাতির জীবনের সঙ্গে যদি যোগ নিবিড় না হয়, কিংবা জাতীয় ঐতিহ্য হইতে যদি বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে তবে কিছুতেই কোন বিষয় এত ব্যাপক জাতীয় স্বীকৃতি লাভ করিতে পারে না। কি ভাবে বঙ্কিমচন্দ্র কিংবা পরবর্তী কালের অন্যান্য কয়েকজন সার্থক ঔপন্যাসিকও জাতির ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা কোনদিনই আমরা বিচার করিয়া দেখি নাই। যে ধারায় আমরা বাংলা উপন্যাসের এতকাল বিচার করিয়া আসিয়াছি, তাহা পুরাপুরি পাশ্চাত্ত্য ধারা। অথচ আমাদের কথাসাহিত্য বিচারে যে একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন, তাহা আমরা কেহ স্বীকার করি নাই। তাহার ফলে আমাদের কথাসাহিত্য কেবলমাত্র পাশ্চাত্ত্যের কাছে কতখানি ঋণী তাহাই জানিতে পারিয়াছি, হয় ত তাহা বেশ খুঁটিনাটি করিয়াই জানিয়া আমরা নিজেদের উপর পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাজাত বিস্ময়কর বিজ্ঞতার বোঝা চাপাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়াছি, কিন্তু তাহাতে প্রকৃত সত্যের উদ্ঘাটনে কোনও সহায়তা হয় নাই।

কি কারণে একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রূপকথার মত নিরক্ষর সমাজেও বাঙ্গালীর মুখে মুখে ছড়াইয়াছিল? কি কারণে এখন পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের কথাসাহিত্য বাঙ্গালীর সকল শ্রেণীর পাঠক-পাঠিকার সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু হইয়া আছে? যদি ইহারা পাশ্চাত্ত্য উপকরণে ভারাক্রান্ত হইত, তবে কি এই গৌরব লাভ

করিতে পারিত ? এই কথা আমরা বুঝি নাই। বঙ্কিম-শরৎচন্দ্রের গুণ অপেক্ষা আমাদের পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান যে বেশী তাহাই আমরা প্রমাণ করিবার জন্ত ব্যগ্র, সেইজন্ত বঙ্কিম-শরৎচন্দ্রের নাম করিয়া আমরা আমাদের পাশ্চাত্ত্য সমালোচনার ধারায় গভীর জ্ঞানের পরিচয় দেই, কিন্তু উক্ত ঔপন্যাসিকদিগের প্রকৃত গুণের উপলব্ধি করিতে পারি নাই। অতএব আমাদের সমালোচনা এই পর্যন্ত কেবল একদেশদর্শী হইয়াছে, সকল দিক হইতে বিচার করিয়া যথার্থ মূল্যায়নে সার্থক হইয়া উঠিতে পারে নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস তাহার জন্মমুহূর্ত হইতেই যে বাঙ্গালীর হৃদয়ে হরণ করিয়াছিল, তাহার কারণ ইহা নহে যে তিনি স্যার ওয়ালটার স্কটের সার্থক অনুকরণ করিয়াছিলেন, কিংবা সেই দিনকার প্রচলিত কথায় তিনি 'বাংলার স্কট' ছিলেন। বরং কথাটি ঠিক তাহার বিপরীত—তাহা এই যে তিনি ধ্যান-ধারণায় বাঙ্গালী ছিলেন, তাঁহার উপন্যাসকেও কেবল বাংলা উপন্যাস নহে, বাঙ্গালীর উপন্যাস করিয়া রচনা করিয়াছিলেন ; আজকাল আমরা বাংলা উপন্যাস পড়ি সত্য, কিন্তু বাঙ্গালীর উপন্যাস পড়ি না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসকেও যদি খাঁটি বাঙ্গালীর উপন্যাস করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারিতেন, তবে তাহা কিছুতেই নিরক্ষর জনসাধারণেরও হৃদয় হরণ করিতে পারিত না। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে যে কথা সব চাইতে বেশি প্রয়োজনীয়, তাহা তিনি স্কটের নিকট হইতে কতখানি ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা নহে, বরং তিনি বাঙ্গালীর জীবন হইতে কতখানি উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমরা বঙ্কিম সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া স্কটের সম্পর্কে আমাদের পাণ্ডিত্য যত প্রকাশ করিয়াছি, বাঙ্গালীর জীবন সম্পর্কে ততখানি জ্ঞান প্রকাশ করিতে পারি নাই। যদি তাহা পারিতাম, তাহা হইলে বঙ্কিম-রচনার প্রকৃত মূল্যায়ন হইতে পারিত। তাহার অভাবে এই কথা আমাদের স্বীকার করিতেই হইবে যে এখন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের এবং সেইভাবেই পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যিকদেরও যথার্থ মূল্যায়ন হইতে পারে নাই। বর্তমান গ্রন্থকার এই গ্রন্থে বাংলা কথাসাহিত্যের আলোচনার ক্ষেত্রে সেই সম্পূর্ণ উপেক্ষিত দিকটির প্রতি আমাদের সর্বপ্রথম ব্যাপক ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাহার ফলে এখন আশা করা যায় যে বাংলা কথাসাহিত্যের আলোচনায় আনুপূর্বিক পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতি আরোপ করিবার পূর্বে এই দিকটির প্রতিও সকলে লক্ষ্য করিবেন। কারণ, ইহার গুরুত্ব সম্পর্কে এখন আর কেহ উদাসীন হইলে তাঁহার আলোচনা পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক হইতে পারিবে না।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমরা 'বিজয়-বসন্ত' ও 'গুলে বকাওয়ালী'র যুগ হইতে

যে এক মুহূর্তেই বঙ্কিম যুগে আসিয়া পৌঁছিয়া গেলাম; তাহা কি করিয়া এত সহজে সম্ভব হইল? 'বিজয়-বসন্তে'র যুগ হইতে 'দুর্গেশনন্দিনী'র যুগে পৌঁছিতে হইলে যে তাহা কিছুতেই এক মুহূর্তে সম্ভব হইতে পারে না, পাশ্চাত্ত্য জাতির মধ্যেও দীর্ঘকাল ধরিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে তবেই জাতির রস-সংস্কারের মধ্যে রূপকথার জগৎ হইতে উপন্যাসের জগতে উত্তরণ সম্ভব হইতে পারে, রবীন্দ্রনাথ তাহা জানিতেন। সেইজন্য বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির আবেদন তাঁহার কাছে বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছিল। কিন্তু তিনিও ইহার প্রকৃত রহস্য কি ছিল, তাহা গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করিয়া উপলব্ধি করিতে যান নাই।

একদিকে রূপকথার রোমান্টিক পরিবেশ এবং আর একদিক দিয়া বাঙ্গালী জীবনের একেবারে মূল শিকড় এই দুইটি বিষয় অবলম্বন করিয়াই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাস রচনায় সেই দিন প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রূপকথার রোমান্টিক পরিবেশ রক্ষা করিবার ফলে বঙ্কিমচন্দ্রের রস কিংবা রুচির দিক দিয়া বাঙ্গালী সাধারণ পঠেক-পাঠিকার মধ্যে কোনও আকস্মিকতা-জনিত বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। কারণ, এই কথা সত্য, আমরা তখনও 'বিজয়-বসন্তে'র প্রভাব কাটাইয়া উঠিতে পারি নাই। সেইজন্য জনসাধারণের গ্রহণযোগ্য করিয়া কথাসাহিত্য রচনা করিবার জন্য তাহার পরিবেশটি রক্ষা করিবার প্রয়োজন ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করিয়াছেন। কি ভাবে যে সেই দায়িত্ব পালিত হইয়াছে, এই যাবৎ আর কোনও বঙ্কিম-সাহিত্যের সমালোচকই তাহা বুঝাইয়া বলেন নাই, বর্তমান গ্রন্থে তাহাই করা হইয়াছে। সুতরাং ইহার বিষয় এবং বিশ্লেষণ বাংলা কথাসাহিত্যের প্রচলিত সমালোচনার মধ্যে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার জন্য গ্রন্থকারের প্রতি কাহারও যাহাতে কোনও অশ্রদ্ধা কিংবা অবিশ্বাস প্রকাশ না পায়, সেই জন্যই আমার এই 'ভূমিকা'র অবতারণা।

যাঁহারা বঙ্কিম সাহিত্যের উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাবের বিষয় লইয়া 'গবেষণা' করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টি যদি কেবল মাত্র পাশ্চাত্ত্যমুখী না হইয়া কিছু পরিমাণেও গৃহমুখী হইত, তাহা হইলে তাঁহারা নিজেরাই বুঝিতে পারিতেন যে বঙ্কিমের উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাব নিতান্ত গৌণ বরং ঐতিহ্যের প্রভাবই বেশী। এমন কি, তাঁহার উপর পাশ্চাত্ত্য প্রভাব কোনও গবেষণার বিষয়ই নহে। আকস্মিক ভাবে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব আমাদের উপর নিজের অধিকার স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া আমরা দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পশ্চিমদিকেই তাকাইয়া ছিলাম। সেই ভ্রান্তি আজ পর্যন্ত কাটিল

না ; সেই জন্য বঙ্কিমের সম্পর্কে এই পর্যন্ত অশ্রুত নূতন কথা কিংবা নূতন চিন্তা স্বভাবতই বঙ্কিম-সমালোচনার পাঠকদিগকে আঘাত করিতে পারে। অতএব তাঁহার সম্পর্কে কোনও নূতন কথা বলিতে গেলে, তাহা বিশেষভাবে বুঝাইয়া বলিবার আবশ্যক আছে, নতুবা একটি প্রতিষ্ঠিত ভ্রান্ত ধারণা কিছুতেই দূর হইতে পারে না। সেই জন্য বিষয়টি এখানে একটু বিস্তৃত করিয়াই বলিতেছি, তাহা হইলে গ্রন্থকারের বক্তব্যগুলি সম্পর্কে পাঠকদের কোনও অস্পষ্টতা থাকিবে না। আলোচনার সুবিধার জন্য এখানে কেবলমাত্র বঙ্কিমের উপন্যাসগুলির কথাই বলা যাইবে।

রসের দিক দিয়া বাঙ্গালীর রূপকথা এবং বিষয়ের দিক দিয়া বাঙ্গালীর ঘরের কথা এই দুই লইয়াই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সার্থকতা। অথচ এই যে দুই বিষয় লইয়া বঙ্কিমের উপন্যাসের সার্থকতা সেই বিষয় দুইটিই আজ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়াছে। কেহ কেহ তাঁহার উপন্যাসে বাঙ্গালীর ঘরের কথা সম্পর্কে কিছু কিছু বলিয়াছেন, কিন্তু তাহাও যে পাশ্চাত্ত্য আলোকে উদ্ভাসিত তাহাও বলিয়াছেন, সুতরাং ঘরের কথা কি ভাবে আসিয়াছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই।

বাঙ্গালীর জীবনের উপর প্রেম এবং দৈবের প্রভুত্বের কথাই বঙ্কিমচন্দ্র নানা ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন ; অন্যান্য বিষয় যেমন বীরত্ব, দেশাত্মবোধ ইত্যাদি গৌণ স্থান অধিকার করিয়াছে মাত্র। বাংলার রূপকথারও মূল বিষয় জীবনের উপর প্রেম এবং দৈবের প্রভাব ; তাহার উপর যে সকল অন্যান্য বিষয় আছে, তাহা গৌণ স্থান অধিকার করিয়া আছে। রূপকথার রাজকন্যা ও রাজপুত্রের জীবনে যে দুঃসাহসিক প্রেমের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তাহারই কথা বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'র মধ্যে প্রায় একই পরিবেশে ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং যে পাঠক মধুমালা ও মদনকুমারের রূপকথার কাহিনীর মধ্যে দুঃসাহসিক প্রেমের কথা শুনিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, তাহার কাছে 'দুর্গেশনন্দিনী' কোনও আকস্মিকতা সৃষ্টি করতে পারিল না। আকস্মিকতার জন্যই পাঠকের মন বিরূপ হইতে পারে, ঐতিহ্যের ধারা অনুসরণের মধ্য দিয়ে তাহা কদাচ হইতে পারে না।

বঙ্কিমচন্দ্র সেইদিন যদি বাঙ্গালীর রস-সংস্কারের জাতীয় ঐতিহ্যের ধারা হইতে বিচ্যুত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার রচনা পাঠক-সমাজে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিত, তাহা অতিক্রম করিয়া তাঁহার জনপ্রিয়তা অর্জন করা কিছুতেই সম্ভব হইত না।

আঠারো

বাংলায় রূপকথার মধ্যে দৈবের প্রভুত্ব যে কত প্রবল তাহা 'কাজল রেখা' নামক সুপরিচিত রূপকথাটি হইতে জানিতে পারা যায়। 'মধুমালা'র যেমন সর্বজয়ী প্রেমের প্রভুত্ব, 'কাজলরেখা'র তেমনই দৈবের প্রভুত্ব, রূপকথায় এই দুইটী শক্তিই নর-নারীর জীবনকে যেমন নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও তাহাই করিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের মধ্যেই সেদিন বাঙ্গালী সমাজ তাহার রূপকথা শুনিবার তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছে। সেই যুগের যে ঔপন্যাসিক যে পরিমাণে জাতীয় রসের উপকরণ দিয়া তাঁহার রচনা সমৃদ্ধ করিতে পারিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণেই সার্থক, যিনি যে পরিমাণে তাহা দিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, তাঁহার রচনাও সেই পরিমাণে ব্যর্থ এবং জনপ্রিয়তা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

অনেকে মনে করেন, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে তত্ত্ব প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; এমন কি, তিনি নিজেও তাঁহার শেষ জীবনের তিনখানি উপন্যাসে গীতার অনুশীলন তত্ত্বের ভিত্তির উপর কাহিনী স্থাপন করিয়াছেন বলিয়া নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার ফলে তাঁহার সাহিত্যের সমালোচকগণও এই বিষয়ে গভীর ভাবে কোনও কথা বিচার না করিয়া তাঁহারই কথায় ধাবিত হইয়া ইহাদের মধ্য হইতে অনুশীলন তত্ত্ব উদ্ধার করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

কিন্তু এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে, কোনও তত্ত্বের উপর উপন্যাস প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে না, কেবল মাত্র তত্ত্ব-নিরপেক্ষ জীবনরসের উপরই তাহার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ জীবনের তিনখানি উপন্যাসের মধ্যেও কোনও তত্ত্ব প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে নাই, একান্ত বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবন-রসই তাহাদের মধ্যে প্রভুত্ব লাভ করিয়াছে। অনুশীলন-তত্ত্ব ক্ষীণতম উপলক্ষ মাত্র হইলেও তাহা কদাচ ইহাদের মূল লক্ষ্য হইতে পারে নাই; 'দেবী চৌধুরানী'র মধ্যে 'অনুশীলন-তত্ত্ব' কদাচ মুখ্য হইয়া উঠিতে পারে নাই; বাঙ্গালীর জীবনের একটি অতি ক্ষুদ্র অথচ শাশ্বত মানবিক আকাঙ্ক্ষা ইহার মুখ্য স্থান অধিকার করিয়া ইহার অনুশীলন-তত্ত্বের স্বপ্ন-প্রাসাদকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছে। বাঙ্গালী জীবনের অতি ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষার কথা বলিয়াছি, কারণ, প্রফুল্ল যখন অনুশীলন-তত্ত্বের অভ্যাস করিতেছিল তখন গীতার সেই মহৎ তত্ত্ব অভ্যাসের মধ্যেও সে এক বিষয়ে ভবানী ঠাকুরের অবাধ্য হইল। 'একাদশীর দিন সে জোর করিয়া মাছ খাইত। গোবরার মা হাট হইতে মাছ না আনিলে, প্রফুল্ল খানা, ডোবা, বিল, খালে আপনি ছাঁকা দিয়া মাছ ধরিত, সুতরাং গোবরার মা হাট হইতে একাদশীতে মাছ আনিতে আর আপত্তি করিত না।'

বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির মধ্যেই 'দেবী চৌধুরানী'র মূল তত্ত্বটি বিধৃত, অনুশীলন-তত্ত্বের মধ্যে নহে। সধবা বাঙ্গালী নারীর একাদশীতে মাছ খাওয়ার সংস্কারের শক্তিটি বঙ্কিমচন্দ্র এখানে প্রফুল্লর জীবনে যে ভাবে অনুভব করিয়াছেন, গীতার অনুশীলন-তত্ত্বের প্রভাব সেই ভাবে অনুভব করিতে পারেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র প্রফুল্লর জীবনে গীতার অনুশীলন-তত্ত্বের প্রভাব অপেক্ষা একাদশীর দিনে তাহার মাছ খাওয়ার সংস্কার যে প্রবলতর বলিয়া অনুভব করিয়াছেন, তাহার মধ্যে তাঁহার তত্ত্বচিন্তা অপেক্ষা বাঙ্গালীর জীবন-চিন্তা যে অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। ইহার ভাষাটিও পর্যন্ত লক্ষ্য করিবার মত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিতেছেন, প্রফুল্ল...'আপনি ছাঁকা দিয়া মাছ ধরিত।' গীতার অনুশীলন-তত্ত্বের অভ্যাসের মধ্যেও বাঙ্গালী জীবনের একটি ক্ষুদ্রতম সংস্কার আসিয়া প্রফুল্লর তত্ত্বচিন্তাকে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। বাঙ্গালী উপন্যাস-পাঠক তত্ত্বের কথা জানে না, তত্ত্বের কথা বুঝে না, কিন্তু তাহার মধ্যে এখানে বাঙ্গালী জীবনের যে একটি নিখুঁত বাস্তব সংস্কারের কথা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করে।

তারপর বক্তব্য এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র এই ভাষা কোথায় পাইলেন? যে উপন্যাসে অনুশীলন-তত্ত্বের কথা বলিতে চাহিয়াছেন বলিয়া নিজেই বলিয়াছেন, সেই উপন্যাসে এই যে বাঙ্গালীর একান্ত নিজস্ব মুখের ভাষা আসিয়া কি ভাবে স্থান লাভ করিল? তিনি বলিতেছেন, 'আপনি ছাঁকা দিয়া মাছ ধরিত।' বাংলার প্রচলিত মনসার ব্রতকথায় আছে,...'ছোট বউ বলিল, আমার মাছের পোনা খাইবার সাধ হইয়াছে, এই বলিয়া সে গামছা ছাঁকিয়া মাছের পোনা ধরিল।' দেখা যাইতেছে, বঙ্কিমচন্দ্র এই ভাষাই এখানে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহার ফলে প্রাত্যহিক জীবনের গ্রাম্য ভাষা এখানে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়া গীতার অনুশীলন-তত্ত্বের মত একটি নিগূঢ় তত্ত্বকথার পরিবেশকে আচ্ছন্ন করিয়া দিয়াছে। সুতরাং বঙ্কিমের উপর এখানে গীতার তত্ত্বকথা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ জীবন সত্য হইয়া উঠিয়াছে, অথচ সেই জীবন কত ক্ষুদ্র, কত সঙ্কীর্ণ, কুসংস্কারের ছায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া তাহা ডালপালা মেলিয়া বিকাশ লাভও করিতে পারে নাই। সেই তুচ্ছ জীবনকেও প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিবার জন্য বঙ্কিমের কত সতর্কতা, কত নিপুণতা।

'দেবী চৌধুরানী'তে একাদশীর দিনে মাছ না পাইলে প্রফুল্লর 'ছাঁকা দিয়া মাছ ধরিয়া' খাইবার বিষয়টিই আমি বলিব এই উপন্যাসের মূল বিষয়, অনুশীলন-তত্ত্ব মূল বিষয় নহে। কারণ, অনুশীলন-তত্ত্ব 'দেবী চৌধুরানী'র কাহিনীর পরিণতি

নিয়ন্ত্রিত করে নাই, বরং তাহা করিয়াছে প্রফুল্লর এই বিশিষ্ট আচরণটি। অর্থাৎ ইহার মধ্যেই কাহিনীর পরিণতির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে ভবানী পাঠকের সমস্ত পরিকল্পনাটি ব্যর্থ হইতে চলিয়াছে, প্রফুল্লকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার যে 'দেবী চৌধুরানীর স্বপ্ন গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা সফল হইবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু মোহগ্রস্ত ভবানী পাঠক তাহা বুঝিল না। এখানেই এই উপন্যাসের ট্রাজিডি, এই দিক দিয়া বিচার করিলে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে প্রফুল্লর মিলনে তাহা 'কমেডি' হইতে পারে নাই।

আরও একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যায়। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর অপরিসর গার্হস্থ্য জীবনের ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ সংস্কার দ্বারা যে কি ভাবে কাহিনীর পরিণতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, তাহাও দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার কোনও উপন্যাসেই বাঙ্গালীর জীবন-সংস্কার, তাহা যত ক্ষুদ্রই হউক, তাহা কেবলমাত্র কাহিনীর বাহিরে রাখেন নাই, ইহাকে কাহিনীর একেবারে মূল ভিত্তি করিয়াছেন। তাঁহার বহু উপন্যাস যে দৈব নির্ভরতার উপর পরিকল্পিত হইয়াছে, তাহাও সাধারণ বাঙ্গালীর একান্ত জীবন-সংস্কার-ভিত্তিক, কোনও পাশ্চাত্ত্য আদর্শ কিংবা বৃহত্তর জীবন-ভাবনা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নহে। তাঁহার 'কপাল কুণ্ডলা'র কাহিনীরও পরিণতি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে, বাঙ্গালী জীবনের একটি লৌকিক কুসংস্কার। যেমন,

"এক প্রহর রাত্রি অতীত হইলে কপালকুণ্ডলা গৃহ হইতে একাকিনী বাহির হইলেন। নবকুমার দেখিতে পাইয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিলেন, বলিলেন, 'কোথা যাইতেছ?'

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, শ্যামাসুন্দরী স্বামীকে বশ করিবার জন্য ঔষধ চাহে, আমি ঔষধের সন্ধানে যাইতেছি।

নবকুমার পূর্ববৎ কোমল স্বরে বলিলেন, ভাল, কালি ত একবার গিয়াছিলে? আজি আবার কেন?

ক। কালি খুঁজিয়া পাই নাই, আজি আবার খুঁজিব।

নবকুমার অতি মৃদুস্বরে কহিলেন, ভাল, দিনে খুঁজিলে ত হয়।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, দিবসে ঔষধ ফলে না।

নব। কাজই কি তোমার ঔষধ তল্লাসে? আমাকে গাছের নাম বলিয়া দাও। আমি ঔষধি তুলিয়া আনিয়া দিব।

ক। আমি গাছ দেখিলে চিনিতে পারি, কিন্তু নাম জানি না। আর তুমি তুলিলে ফলিবে না। স্ত্রীলোকের এলোচুলে তুলিতে হয়।'...

কপালকুণ্ডলার জীবনের সর্বশেষ বিয়োগাত্মক পরিণতি বাঙ্গালীর গ্রাম্য জীবনের এই একটি নিতান্ত সাধারণ এবং তুচ্ছ কুসংস্কার বা লোক-বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করিয়াছে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র 'বাংলার স্কট' নহেন, বরং বাংলার মাটির খাঁটি মানুষ, কাহারও কোনও প্রভাবের বিন্দুমাত্র পরিচয় ইহাতে নাই, বাঙ্গালী জীবনের একটি নিতান্ত লৌকিক বিশ্বাসের উপর ইংরাজি লেখক তথাকথিত স্কট প্রভাবিত বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনীর ইহা বহিরঙ্গগত অলঙ্করণ মাত্র নহে, বরং তাহার পরিবর্তে কাহিনীর শেষ পরিণতির প্রাণকেন্দ্র স্বরূপ। অর্থহীন তুচ্ছ লোক-বিশ্বাস যে বাঙ্গালীর জীবনকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিত, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসের মধ্য দিয়া সেই দিকে যত গভীর দৃষ্টি রাখিয়াছেন, কোনও ইংরেজি কথাসাহিত্যের উপাদানের উপর তত রাখেন নাই।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস যে প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সেইদিন বাঙ্গালী পাঠকের হৃদয় অধিকার করিয়া লইয়াছিল, তাহার কারণ, বহু তত্ত্ব ও নীতিকথার মধ্য দিয়াও তিনি ইহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ জীবনের রূপটিকেও অবহেলা করেন নাই। বাংলা উপন্যাস যদি যথার্থই বাঙ্গালীর উপন্যাস হইতে হয়, তবে তাহা যে উপেক্ষা করা যায় না, তাহা বঙ্কিমচন্দ্র সেদিনও যেভাবে বুঝিয়াছিলেন, সেই ভাবে পরবর্তী কালেও অনেকে বুঝিতে পারেন নাই। সেইজন্য কথাসাহিত্য রচনায় বঙ্কিম সেই যুগে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা আর কাহারও ভাগ্যে সম্ভব হয় নাই। কারণ, বঙ্কিম বাঙ্গালীর ঘরের সংবাদ যত রাখিতেন, ইংরেজি সাহিত্যের সংবাদ তাহা অপেক্ষা বেশি রাখিতেন না। বর্তমান যুগের কথাসাহিত্যিকগণ তাঁহার সম্পূর্ণ বিপরীত, অর্থাৎ তাঁহারা বাহিরের সংবাদ যত রাখেন, ঘরের সংবাদ সেই তুলনায় কিছুই রাখেন না। কিন্তু বাহিরের সংবাদে আর যাহাই হোক না কেন, ঘরের কাজ হয় না।

বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদানের ব্যবহারের দিক দিয়া বঙ্কিমের পরবর্তী কালে কি অবস্থার সৃষ্টি হইল, তাহাও একটু বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। বঙ্কিমের পরবর্তী কালে উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়া যতখানি জীবনের এবং সমাজের তত্ত্ব কথার সন্ধান করিয়াছেন, তাহার বাস্তব রূপটি তত গভীর ভাবে প্রত্যক্ষ করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে রোমান্স বা কল্পনাকে ব্যাপক ভাবে অবলম্বন

করা সত্ত্বেও বাঙ্গালীর গার্হস্থ্য জীবনের অনেক খুঁটি-নাটি বিষয়ের বাস্তব রূপ প্রায় সর্বক্ষেত্রেই রক্ষা করিয়া কল্পনা-ভিত্তিক রচনার উপরও মধ্যে মধ্যে একান্ত বাস্তবের প্রলেপ দিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'আইডিয়া' বা একান্ত ভাব-ভিত্তিক উপন্যাসগুলির অনেক ক্ষেত্রে তাহাদের খুঁটি-নাটি বিষয়ে এই বাস্তব রূপ প্রকাশ পাইতে পারে নাই। সেই জন্য তাঁহার উপন্যাসগুলি যতখানি 'বাইরে'র ততখানি 'ঘরে'র হইয়া উঠিত পারে নাই। এই কথা সত্য যে তাঁহার ছোট গল্পগুলির মধ্যে অনেক সময় বাঙ্গালীর 'ঘরোয়া' পরিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু তথাপি তাহা প্রধানতঃ ভাবমূলক এবং নাগরিক ও অভিজাত সমাজ-ভিত্তিক বলিয়া প্রকৃত পক্ষে বঙ্কিমের মধ্যে যে গুণ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা ইহাদের মধ্যে পাইতে পারে নাই।

বঙ্কিমের পরই যে বাংলা ঔপন্যাসিকের মধ্যে বাঙ্গালীর খুঁটিনাটি জীবনের বহু বিচিত্র সংস্কার সর্বাপেক্ষা বাস্তবানুগ হইয়াছে, তিনি শরৎচন্দ্র। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের পরই বাংলা কথাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রই সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। যাহাতে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের জনপ্রিয়তা, তাহার মধ্যেই শরৎচন্দ্রেরও উপন্যাসের জনপ্রিয়তা প্রকাশ পাইয়াছে। বাংলা সাহিত্যের এই দুইজনের কথা বাদ দিলে বাংলার গৃহকে এমন সর্বস্ব করিয়া আর কেহ উপন্যাস রচনা করেন নাই।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া আজ পর্যন্ত বাংলা কথাসাহিত্যের কেহ বিচার করেন নাই। সেইজন্য বাংলা কথাসাহিত্যের প্রকৃত সার্থকতা এবং তাহার ব্যর্থতা যে কোথায় কি ভাবে দেখা দেয়, তাহা কেহই বুঝিতে পারেন নাই। আমাদের দেশের কথাসাহিত্যের সমালোচনা আমাদের 'গৃহমুখী' নহে; কারণ, সার্থক কথাসাহিত্যিকগণ জাতির গৃহের যে গভীর সংবাদ রাখেন, ইংরাজী শিক্ষাবিলাসী সমালোচকগণ সেই সংবাদ রাখেন না। সেইজন্য পাশ্চাত্ত্য উপন্যাসের জীবন এবং আমাদের দেশের সামাজিক উপন্যাসের জীবনে যে বিশ্বাস এবং সংস্কারগত পার্থক্য আছে, তাহা আমরা অনুভব করিতে পারি না; এক অভিন্ন পাশ্চাত্ত্য বিচারের মানদণ্ড দিয়া আমরা আমাদের সমাজের উপন্যাসেরও বিচার করিতে চাই। সেই বিচার আমাদের নির্ভুল হইতে পারে না; যেখানে প্রকৃত গুরুত্ব দিবার কোনও আবশ্যকতা নাই, সেখানে আমরা গুরুত্ব দিই, যেখানে তাহার আবশ্যক আছে, সেখানে আমরা তাহা পরিত্যাগ করি।

বর্তমান গ্রন্থের লেখক ডক্টর শ্রীমান্ সুভাষচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার লোক-সাহিত্যের একজন পরম নিষ্ঠাবান্ গবেষক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিষয়ের

স্নাতকোত্তর বিভাগে প্রথম যে বৎসর আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া লোক-সাহিত্য বিষয়ের একটি পত্রের প্রথম দিন হইতে অধ্যাপনার সূত্রপাত করি, সেইদিন হইতেই তিনি আমার ছাত্র; ছাত্র কেবল ক্লাসের মধ্যেই নহে, কিংবা সহরের সভাস্থলে আলোচনা-চক্রেই নহে—ছাত্র তিনি তারপর হইতে আজ পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় পনর বৎসর যাবৎ পশ্চিম বাংলার নানা দুর্গম অঞ্চলের গ্রাম-গ্রামান্তরের সংগ্রহ শিবিরে, ধুলিধূসরিত গীতনৃত্যের আসরে, প্রায় সর্বত্র।

তাঁহার এই বিষয়ক্ গবেষণা ও পরিশ্রমের ফলস্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি নানা উচ্চ সম্মানজনক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছেন। তিনি এই গ্রন্থে বাংলা কথাসাহিত্য সমালোচনার সর্বপ্রথম একটি নূতন ধারার সূত্রপাত করিয়া এই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। প্রথম প্রকাশের নানা ত্রুটি বিচ্যুতি সত্ত্বেও একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি এই গ্রন্থে যে পাঠক মাত্রেই দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে, এই বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ।

দীর্ঘকাল যাবৎ আমাদের কথা সাহিত্য সমালোচনার যে একটি সনাতন ধারা প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার মধ্যে এতদিন পর যে একটি নূতন ধারা সংযোজিত হইল সেইজন্য বাংলা সাহিত্যের পাঠক মাত্রেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিবেন।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

সূচনা

গল্পের প্রতি আকর্ষণ মানুষের চিরকালের। সেই আদিম যুগে মানুষ যখন গুহায় বসবাস করতো, শিকার করে তাদের জীবন অতিবাহিত হোত, প্রকৃতির দুর্যোগ দুর্বিপাকের মধ্যে মানুষ যখন ছিল প্রকৃতির কাছে একান্তভাবে অসহায়, যখন মানুষের কোন ভাষা ছিল না—আকারে ইঙ্গিতে নিজেদের মধ্যে বার্তা ও ভাব বিনিময় করতো—তখন থেকেই মানুষের গল্প শোনার প্রবৃত্তি অত্যন্ত সক্রিয় রূপ নিয়েছিলো। পরে যখন আদিমানব পাথরের বুকে আঁক কাটতে শিখল, দুর্বোধ্য শব্দের মধ্য থেকে বোধ্যভাষায় আবির্ভাব ঘটলো, তখন গল্পশোনা ও গল্প কথকের আগ্রহ আরো ব্যাপকতর হল। আরো পরবর্তী যুগে মানুষ যখন শিকার ছেড়ে কৃষিকাজ আরম্ভ করেছে, গুহা ছেড়ে ঘর বেঁধেছে—জীবনে যখন স্থিতি এসেছে, শস্য বপনের পর শস্য কর্তনের সময় পর্যন্ত অখণ্ড অবকাশ পেয়েছে তখন তারা কেবল গান গায় নি, বা ছড়া বেঁধে অবকাশ উদযাপন করে নি, গল্প রচনা করে অবসর বিনোদন করেছে—মানুষের গল্প শোনার প্রবৃত্তি আরো দুনিবার হয়ে উঠেছে। আরো পরবর্তী যুগে পাথরের ও চামড়ার পাত্রে, তালপাতার পুঁথিতে মানুষ আঁক কেটেছে, শ্রুতিকে লিখনের মধ্যে ধরে রাখার চেষ্টা করেছে তখনও সেই গল্প, কাহিনী ও আখ্যান। পৃথিবীর আদি সাহিত্য বা শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলি রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড ওডিসি সমস্তই কাহিনীমূলক। এরপর এই গল্প কাহিনী আখ্যানের দুটি ভাগ হয়ে গেছে—একটি লিখিত গল্প কাহিনী বা আখ্যান—যা লিখিত কাব্য সাহিত্যে স্থায়ীরূপ লাভ করলো, অপর ধারাটি মৌখিক গল্প কাহিনীর ধারা। ইংরাজীতে একে বলা চলে written story এবং Unwritten বা oral story। পৃথিবীর সবদেশেই এই দুধারার গল্প কাহিনী—লিখিত কথা সাহিত্যের মধ্যে আজ যা উপন্যাস বা ছোটগল্প রূপে আখ্যাত হয়েছে এবং মৌখিক কথা সাহিত্যরূপে লোকসাহিত্যের মধ্যে যা রূপকথা, ব্রতকথা, উপকথা, ইতিকথা, পুরাকথা সাহিত্যের নামে চিহ্নিত হয়েছে। আদিযুগের আখ্যানমূলক রচনাগুলি আলোচনা করলে দেখা যায় সেই সব মহাকাব্য ইত্যাদির গল্প, কাহিনীগুলি বহু পূর্ব থেকেই জনশ্রুতিতে মৌখিক ভাবে প্রচলিত ছিল, যা পরবর্তী কালে প্রতিভাধর স্রষ্টার হাতে পড়ে লিখিত রূপ লাভ করেছে। রামায়ণ ও মহাভারতের গল্প ও কাহিনীগুলি বিশ্লেষণ করলে বেশ বোঝা যায় এগুলি এককালের প্রচলিত

মৌখিক কাহিনী ও গল্পের একত্রিত সংগ্রথিত রূপায়ণ মাত্র এবং বিভিন্ন যুগে লিপিকার কথক ও গায়কের হাতে পড়ে বহু কাহিনী সংযোজিত হয়েছে এবং বহু কাহিনী পরিত্যক্ত ও রূপান্তরিত হয়েছে। মৌখিক কাহিনীর রূপান্তর ও পরিবর্তন—এর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরবর্তী যুগে বহু লোকশ্রুতি মূলক কাহিনী লিখিত সাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত হলেও অলিখিত মৌখিক গল্পকাহিনীর ধারা কিন্তু লোকায়ত সমাজ জীবনে বর্তমান রয়ে গেল। আদিম যুগের সেই গল্প শোনার প্রবৃত্তি থেকেই পরবর্তী লোকসমাজে আরো অভিনব নূতন নুতন বিষয় নিয়ে গল্প তৈরী হতে লাগলো এবং লোক সাহিত্যের কথা (Tale) বিভাগটি ক্রমশঃ সমৃদ্ধতর হতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে লিখিত সাহিত্যের মাধ্যমে গল্পবলার ঝোঁক লক্ষ্য করা গেল। এরই ফলে রচিত হয়েছিলো পৃথিবীর সব দেশে প্রাচীন লিখিত গল্পকথার সাহিত্য যেমন ভারতবর্ষে হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, বৌদ্ধজাতক, কথাসরিৎ সাগর, বেতাল পঞ্চ বিংশতি, দশকুমার রচিত, বৃহৎ 'কথা মঞ্জরী, মধ্য প্রাচ্যের সহস্র রজনীর কথিত আরব্য উপন্যাস, ইটালীতে ডেকামেরণ প্রভৃতি। একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় এই সব লিখিত প্রাচীন গল্পকথার সঙ্গে মৌখিক গল্পকথার একটা যোগসূত্র চিরস্থায়ী হয়ে রয়ে গেল। কারণ এই প্রাচীন গল্পকথা গুলি লিখিত হলেও মৌখিক ভাবে এর প্রচার কিন্তু অব্যাহত রইলো। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিশেষ করে বেনফে, টমসন ইত্যাদি গবেষকগণ মনে করেন ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে রূপকথা (Fairy Tales, Marchen) কিংবা, উপকথা (Animal Tales) ইত্যাদি প্রচলিত আছে তা একটি সুদূর অতীতে ভারতের সঙ্গে ইউরোপের যোগাযোগ সূত্রেই ভারত থেকে ইউরোপে প্রচারিত হয়েছিল। তবে ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচার লাভ করার ফলে তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক রূপ লাভ করেছিলো, কিন্তু এই সব গল্পকাহিনীর মধ্যে ভারতের যোগসূত্র যে বর্তমান তা বিষয় বা Motif গুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। স্ক্যানডিনেভিয়ান রূপকথা সিণ্ডেরিলার মূল মোটিফ যেমন বিমাতার অত্যাচার, আমাদের দেশের শীত-বসন্তের রূপকথাটির ও মূল অভিপ্রায় বিমাতার অত্যাচার (Step Mother Motif)। কেবল মাত্র ইউরোপেই নয়, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলেও এই সব ভারতীয় গল্পকথা মৌখিক ও লিখিত ভাবে প্রচারিত হয়েছিলো। তাই আজও ব্রহ্মদেশে, মালয়, সুমাত্রা বালিদ্বীপ, কাম্বোডিয়া, শ্যামদেশ, চীন ও জাপান—ইত্যাদি এশিয়া খণ্ডে প্রাচীন ভারতবর্ষের লিখিত ও মৌখিক কথাসাহিত্যের বহু মূল কাহিনী, পরিবর্তিত কাহিনী এবং কাহিনীর ও

গল্পের খণ্ডাংশ শুনতে পাওয়া যায়। সুতরাং বলা যায় ভারতবর্ষের প্রাচীন ও মধ্যযুগে লিখিত ও মৌখিক কথাসাহিত্যের যে বিপুল ঐতিহ্য গড়ে' উঠেছিল তার মিলিত রূপ কেবল ইউরোপ এশিয়ার লিখিত ও মৌখিক কথাসাহিত্যকে প্রভাবিত করে নি, পরবর্তী যুগে আধুনিক কথা সাহিত্য উপন্যাস, ছোটগল্প, রোমান্স ইত্যাদিকেও প্রভাবিত করেছে।

পৃথিবীর তাবৎ লিখিত ও মৌখিক আখ্যান সাহিত্যের বৈশিষ্ট্যগতভাবে দুটি শ্রেণী। প্রথমতঃ যখন আমরা রামায়ণ মহাভারত, ইলিয়ড, ওডিসি ইত্যাদি পাঠকরি তখন আমাদের মনে দুটি জিনিস দ্রুত অঙ্কিত হয়ে যায়, তা হচ্ছে আখ্যানের চমৎকারিত্ব ও জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টি। কাহিনীগুলি পাঠ করতে করতে এই সমস্ত গল্প ও কাহিনীর বৈচিত্র্য ও অভিনবত্ব যেমন আমাদের মুগ্ধ করে, ঠিক তেমনি যেসব চরিত্র নিয়ে এই আখ্যানগুলি লিখিত তারা সকলেই তাদের নিজস্ব তীক্ষ্ণতা ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব নিয়ে আমাদের অন্তরে স্থায়ী আসন লাভ করে। রাম, লক্ষ্মণ, ভরত, সীতা, প্রমীলা, রাবণ, বিভীষণ, ইন্দ্রজিৎ, দুর্যোধন, কর্ণ, ভীষ্ম, অর্জুন, যুধিষ্ঠির, একিলিস, আগামেনন, প্যারিস, হেক্টর, হেলেন, ইউলিসিস—এদের প্রত্যেকে তাদের ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য নিয়ে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বকে স্পষ্ট করে তাদের কথাবার্তা ও আচার আচরণের ভিতর দিয়ে আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে—এদের আচরণএর সঙ্গতি এবং সংলাপের নিজস্বতা আমাদের কাছে এদের প্রত্যেককে স্বতন্ত্র ভূমিকায় উজ্জ্বল করে, যদিও মহাকবিগণ সচেতন ভাবে কোথাও এদের চরিত্র বিশ্লেষণ করেন নি। কিন্তু ঘটনার প্রবাহ তাঁদের রচনায় এক মুহূর্ত ও গতিহীন হয়নি, ফলে লেখকের গভীর অনুভূতি ও কল্পনার সঙ্গতির জন্য ঘটনা বিবৃতি (Narration) এবং ধর্মতত্ত্ব আলোচনার মধ্যেও এই চরিত্রগুলির সজীবতা ও আত্মবৈশিষ্ট্য আমাদের আজও মুগ্ধ করে। দ্বিতীয়তঃ আর একপ্রকার গল্প বা কাহিনী আছে যার মুখ্য আকর্ষণ উদ্দেশ্যমূলক বা চমকপ্রদ ঘটনাবলীর একত্র সমাবেশ, এই গল্পকাহিনীর মধ্যে আমরা চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য পাইনা, বরং সেখানে সমাজচিত্র, রোমান্স, বাস্তব জীবনের বিক্ষিপ্ত ইঙ্গিত স্পষ্ট হয়ে ওঠে। পৈশাচীভাষার লিখিত গুণাঢ্যের 'বৃহৎকথা', পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধজাতক, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কথাসরিৎসাগর বৃহৎ কথামঞ্জরী, দশকুমার চরিত, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র—ইত্যাদি গ্রন্থ ও কাহিনী গুলিকে এর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এই সব গল্প কাহিনীর কতকগুলি পশু-পক্ষীর রূপকচ্ছলে নীতিতত্ত্ব ও মানবপ্রকৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে·

কতকগুলিতে নিরঙ্কুশ রঙিন কল্পনার সাহায্যে অসম্ভব ও অবাস্তব ঘটনা পরম্পরার মাধ্যমে জীবনের রহস্যময় আকস্মিক দিকটা কখনও অঙ্কিত হয়েছে কখনও বা জীবনের মধুরময় স্বপ্নকুহেলী ঘেরা রোমান্সের অংশটি ব্যক্ত হয়েছে, এইসব গল্প কাহিনীতে চরিত্রগুলি যেমন অস্পষ্ট, ছায়াবৃত, কুহেলিকায় ঢাকা অন্ধকারাচ্ছন্ন, তেমনি ঘটনা-চমৎকারিত্বের মায়ার আড়ালে চরিত্রগুলো অর্ধ-পরিস্ফুট। এখানে আমরা মানুষের চরিত্র সম্পর্কে যত না বেশী কৌতূহল তার চেয়ে বেশী ঘটনার ঘনঘটার জালে নিজেদের জড়িয়ে ফেলার প্রতি আগ্রহান্বিত।

উপন্যাসের আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই গল্প কাহিনীর এই দুটি ধারা মৌখিক ও লিখিত সাহিত্যে বর্তমান ছিল। এর থেকে প্রেরণা ও উপকরণ সংগ্রহ করে ও পরবর্তী যুগের পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গীতে এই সব গল্প কাহিনীর বৈশিষ্ট্যগুলির রূপান্তর সাধন করেই পৃথিবীর সব দেশেই আধুনিক উপন্যাসের উদ্ভব। মানুষ যখন কেবলমাত্র শ্রেণীর প্রতিনিধি নয়, যখন সে নিজস্ব তাৎপর্য ও পরিচিতিতে প্রতিষ্ঠিত তখনই তার বিচিত্র জীবন কাহিনী নিয়ে উপন্যাস রচিত হয়েছে।

বাংলা উপন্যাসের মধ্যে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এই সব প্রাচীন লিখিত গল্প কাহিনীর যেমন প্রভাব আছে, ঠিক তেমনি মৌখিক গল্প সাহিত্যে যাকে লোককথা (Folk Tale) বলা হয় সেই সব রূপকথা, ব্রতকথা, উপকথা, ইতিকথা ও পুরাকথাগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে আধুনিক বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের মধ্যে। উপন্যাস হচ্ছে সমগ্র মানব সমাজের উত্থান-পতন আশা-নৈরাশ্যের চলমান কাহিনী। প্রেম-প্রতিহিংসা, স্নেহ-বাৎসল্য, ন্যায়-অন্যায় —মানুষের মধ্যে প্রবৃত্তিগত যে দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ আছে ঔপন্যাসিক তাকেই তুলে ধরেন জীবনের চালচিত্রে। অপরপক্ষে রূপকথা মাত্রেরই বিষয়বস্তু প্রেম ও রোমান্স, উপকথা মাত্রেরই জীবন-নীতি ও সমাজ দর্শন, ব্রতকথার লক্ষ্য মানব জীবনের ঐহিক আকাঙ্ক্ষা ও প্রাত্যহিক কামনা বাসনার পরিতৃপ্তি, পুরাকথার মধ্যে আছে আদিম ও লৌকিক সমাজের সংস্কার ও বিশ্বাসের নেপথ্যভূমি, আর ইতিকথায় পাওয়া যায় অতীত লোকের ছায়ময় প্রেক্ষাভূমি। আধুনিক উপন্যাস, বিশেষ করে বাঙলা উপন্যাসগুলি পর্যালোচনা করলে লৌকিক কথাসাহিত্যের এই সমস্ত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এর উপাদানগুলি যে আধুনিক উপন্যাসের মধ্যেও সংহত হয়েছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। এখানেই বর্তমানের উপন্যাসের সঙ্গে অতীতের আখ্যান কাহিনী ও প্রচলিত লোককথার উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও ভাবগত দার্শনিক মিল (Philosophical similarity) দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ আঙ্গিকের দিক দিয়ে বলা যায়, উপন্যাস

ও রোমান্স উভয়েই লিখিত কথাসাহিত্যের অন্তর্ভূক্ত হলেও উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য আছে। উপন্যাস প্রাত্যহিক জীবনের প্রত্যক্ষ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, রোমান্সএ কল্পনা, স্বপ্ন এবং সৌন্দর্যের আধিক্য, মৌখিক লোক কথাসাহিত্যের রূপকথাকে যদি রোমান্স এর আঙ্গিকগত পূর্ব রূপ বলা যায়, উপকথা ব্রতকথাকে উপন্যাসের পূর্বরূপ বলা চলে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দী থেকেই ইংরেজী Novel বা Prose Fiction অর্থে উপন্যাস শব্দটির ব্যবহার আরম্ভ হওয়ায় তখন থেকেই Romance ও Novel উভয় অর্থেই উপন্যাস কথাটি ব্যবহার হতে আরম্ভ করে। 'উপন্যাস' শব্দটি যে বাংলা সাহিত্যে 'Romantic Tale' অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে আসছে, Arabian Nights এর বাংলা অনুবাদ 'আরব্য উপন্যাস' শব্দ ব্যবহারে তা লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসেই হোক আর রোমান্সই হোক সাহিত্যের আসল কথা হল জীবনসত্যের প্রকাশ। রূপকথার উদ্দাম, বন্ধনহীন কল্পনার লীলাবিহারের মধ্যে যেমন মাঝে মাঝে জীবন সত্যের আভাস ও ব্যঞ্জনা ফুটে ওঠে বলে তা রূপকথা হয়েও সাহিত্যের মর্যাদা পায়, তেমনি রোমান্সের মধ্যে এই রূপকথার কল্পনার উদ্দামতা, ও স্বপ্নের বন্ধনহীনতা কোন কোন ক্ষেত্রে থাকা সত্ত্বেও জীবন সত্যের প্রতিভাসে তা আধুনিক কথাসাহিত্যের অঙ্গীভূত হয়। রূপকথা কল্পনাশ্রিত রোমান্টিক সৃষ্টি, তথাপি তা সাহিত্য। কারণ তাতে জীবন সত্যের সীমাকে লঙ্ঘন করে কল্পনাকে অবাধ প্রশয় সব সময় দেওয়া হয় না। ঠিক তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র ইত্যাদি রোমান্স ও উপন্যাস রচয়িতাগণ অনেক সময় রূপকথার কল্পনা বিহারে ভেসে গেছেন বটে কিন্তু তার মধ্যে জীবন সত্যকে প্রতিভাত করে তাদের রচনাগুলিকে সত্যকারের শিল্প সৃষ্টিতে পরিণত করেছেন। 'দুর্গেশ নন্দিনী' রোমান্স হলেও এতে মানব প্রকৃতির পরিচয় অনেকটা হাল্কা ও স্বপ্নবিষ্ট হলেও এর মধ্যে বাস্তব স্পর্শের অভাব নেই, তিলোত্তমা ও আয়েষা প্রেমে রূপকথার কল্পনার—স্বপ্ন ও সৌন্দর্যময় রোমান্সের একটু বাড়াবাড়ি থাকলেও বিমলা, আসমানি ও বিদ্যাদিগগজের চরিত্রে বাস্তব জীবনের দিকটা স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। কতুলখাঁর হত্যা, তিলোত্তমা অন্তরে প্রেমের উন্মেষ, আয়েষার আত্মবিসর্জন ও অন্তর্দ্বন্দ্ব এ সমস্ত দৃশ্যগুলি মানবিক আবেগ বর্ণনায় জীবন সত্যকে উদ্ভাসিত করেছে। রূপকথার রোমান্সের উপাদান গ্রহণ করেও তাই দুর্গেশ নন্দিনী সার্থক শিল্প সৃষ্টিতে পরিণত হয়েছে। 'কপাল কুণ্ডলা'র আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট পরিপূর্ণ রোমান্স এবং রূপকথা ধর্মী। কেবল তাই নয় অলৌকিকতা বা supernaturalismই-কপাল কুণ্ডলার মূল পরিবেশটি তৈরী করেছে যার পিছনে আছে কাপালিক

(Magic performer) এর তান্ত্রিক ক্রিয়া কলাপ যার সঙ্গে আদিম যাদু ক্রিয়ার সঙ্গতি লক্ষ্যণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র একজন প্রকৃত সমাজ তত্ত্ববিদের মত দেখিয়েছেন পরিবেশই মানুষের অন্তঃ প্রকৃতির এবং বাহ্য প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য গুলিকে তৈরী করে। কপাল কুণ্ডলার স্বভাব নিস্পৃহ ও ধর্ম মোহভিভূত চিত্তে যে প্রেমের রং ধরেনি তার কারণ ঐ কাপালিকের অতিপ্রাকৃত আবহাওয়ায় লালিত পালিত হওয়া। শরৎচন্দ্রের 'দেনা পাওনা' উপন্যাসের 'ষোড়শী মধ্যে ঠিক বিপরীত পরিণতি লক্ষ্য করা যায়, সেখানে প্রচলিত সমাজ জীবনে যে নারী প্রকৃতি গড়ে উঠেছিল, চণ্ডীমার দেবীত্বে তা গ্রাস করে নিতে পারেনি, তাই ষোড়শী আবার অলকায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। শ্রেষ্ঠ রোমান্স ও রূপকথার যে লক্ষণ অনিবার্য ঘটনা পরিণতির একমুখিতা ও নিগূঢ় ভাবসঙ্গতি তা কপালকুণ্ডলার মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'পূর্বে কি ছিল এবং পরে কি পাইলাম। তাহা দুই কালের সন্ধি স্থলে দাঁড়াইয়া আমরা এক মুহূর্তেই অনুভব করিতে পারিলাম, কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয় বসন্ত, সেই গুলেবকাওলি, সেই বালক ভুলানো কথা? কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য।' বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সগুলি তাই রূপকথার উপাদানে সমৃদ্ধ হলেও তা শিল্পের সীমাকে অতিক্রান্ত করে সত্যকার উপন্যাস শিল্পের মর্যাদা লাভে ধন্য হয়েছে, তাই সেদিন রোমান্স বিরোধী বাস্তব সত্যকে প্রকাশ করতে যেয়ে তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তার স্বর্ণলতা উপন্যাসটি রচনা করে পরিচয় পত্রে বলেছিলেন: 'Fictions to please should wear in face of truth।' এই 'truth' বলতে তিনি জীবনসত্য বুঝেন নি, কারণ রোমান্স এর মধ্যেও জীবনসত্য থাকে, তিনি আসলে জীবনের প্রত্যক্ষ বাস্তবসত্যকেই বুঝিয়েছেন, প্রত্যক্ষ ঘটনার অবিকল বর্ণনা মাত্রই যেমন সাহিত্য নয়, তেমনি নীতিকথার মধ্যে যে সত্যই থাকুক তাও কাব্যসত্য নয়। তারকনাথের রচনার মধ্যে প্রত্যক্ষ ও বাস্তব জীবনের বর্ণনা যতই নিখুঁত হোক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সগুলির মধ্যে রূপকথার প্রভাব থাকলেও তা জীবনসত্যকে ও জীবনোপলব্ধিকে সার্থকভাবে প্রকাশ করেছে। অতীত ও কল্পজগতের মানুষের মধ্যেও চিরকালীন মানুষের মানবিক অনুভূতিগুলির সন্ধান পাওয়া যায়। তাই রূপকথার মধ্যেও প্রেম-ভালবাসা, স্নেহ বাৎসল্য, প্রতিহিংসা ষড়যন্ত্র সব কিছুরই সন্ধান মেলে। সেখানে রূপকথার রাজকন্যা ও তিলোত্তমার মধ্যে কিংবা, ব্রতকথার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণীর সঙ্গে

স্বর্ণলতার কোন পার্থক্য থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্রের এখানেই কৃতিত্ব যে বাংলাদেশের রূপকথা, ব্রতকথা, উপকথার নানা উপাদান এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপকরণে তাঁর উপন্যাসগুলিকে সমৃদ্ধ করেও আধুনিক শিল্প বিচারের ক্ষেত্রে সেগুলিকে রসত্তীর্ণ করেছেন।

তৃতীয়ত: লোকজীবন ও লোক সমাজের নানা আচার-আচরণ, বিধি নিষেধ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, বারব্রত, লোকগীতি, ছড়া, ইত্যাদি নানা লৌকিক বিষয় ও উপাদানকে গ্রহণ করে বাংলা উপন্যাস তার বিষয় বস্তুর দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়েছে, এ ছাড়াও উপন্যাস রচনাটি যত সমৃদ্ধ হয়েছে, উপন্যাসের বাস্তবতা ও বাস্তব জীবন যত সমাজের অভ্যন্তরে এসে প্রবেশ করেছে ততই সেখানকার লোকায়ত মানুষও তার সংস্কার, বিশ্বাস, কিংবদন্তী, প্রবচন, উৎসব পর্ব-পার্বণগুলি প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত হয়ে বাঙলা উপন্যাসে লোকায়ত উপাদান ব্যাপকতর ভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্করের উপন্যাসগুলি তার সার্থক দৃষ্টান্ত। কিভাবে আদিম ভূত ও আত্মার বিশ্বাস, যাদুবিদ্যা, ডাইনীতন্ত্র, বিশেষ বিশেষ লৌকিক অনুষ্ঠানাদি, আজও সমাজ দেহের অভ্যন্তরে কিভাবে বিশ্বাসের আকারে বর্তমান আছে তাও আজকের উপন্যাসের মাধ্যমে আমাদের কাছে অনুভূত হবে। কিভাবে একটি লৌকিক সংস্কার নারী চরিত্রের মাধ্যম হিসাবে কাজ করে সক্রিয়ভাবে সমাজ দেহে বর্তমান তার পরিচয় আছে দেবীচৌধুরানী উপন্যাসের প্রফুল্ল চরিত্রের মধ্যে, শ্রীকান্ত উপন্যাসের অন্নদাদিদি চরিত্রের মধ্যে। এই লোকবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠানগুলি লৌকিক ধর্মের আচারের ও বিশ্বাসের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত। একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন: ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান নিবিড়ভাবে মানুষের শরীর, রোগ ব্যাধি, জন্ম, শৈশব, কৈশোর ও যৌবন, মৃত্যু ও অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া, গৃহপালিত জীবজানোয়ার, পাখী, ঘর-বাড়ী, কৃষি, ধর্মীয় পবিত্রস্থান, পবিত্রপুস্তক, স্বপ্ন, মানসজীবন, দৈনন্দিন কাজকর্ম, চলাফেরা, শোওয়া-খাওয়া, ঘুম জাগরণ, রান্না-বান্না ও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে জড়িত, সবচেয়ে বড় কথা, মানুষ ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করেছে অনিশ্চিয়তা দুর করার জন্য। অচিন্ত পূর্ব ঘটনা মানুষকে দেব-দেবী ও ঐশী শক্তির সন্ধান করতে বাধ্য করেছে। ধর্মের মাধ্যমেই এবং যাদুবিদ্যার সহায়তায়, প্রার্থনা, কোরবানী (বলিদান) ও অন্যান্য বহু ক্রিয়ানুষ্ঠানের সাহায্যে লোক সমাজ স্ববিশ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত করতে চায়, এবং এই কাজটি সমাধা করতে যেয়ে মানুষ অতীন্দ্রিয় ও দেব-দেবীর অস্তিত্বকে পূর্ব-নির্ধারিত বিষয় হিসাবে মেনে নিয়েছে। এই অতীন্দ্রিয় শক্তি দেব-দেবী, দৈত্য ও ভূত-প্রেত

হিসাবে প্রকাশ পায় এবং মানুষের কাজকর্মকে প্রভাবিত করে। এসব দেব-দেবী, ভূত-প্রেত ও দৈত্যকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে, এবং স্ব-জীবনে মঙ্গল আনতে ও দুর্বিপাক থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মানুষ একদল শক্তিধর ব্যক্তিকে মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে। এরাই হল লোক সমাজে পুরোহিত, শামান, গুণীন (Magician)। এরা হল মানব সমাজ ও অতীন্দ্রিয় শক্তির মধ্যে যোগাযোগকারী মাধ্যম। বাংলা উপন্যাসের অধিকাংশ ক্ষেত্র জুড়েই ছড়িয়ে আছে এই লৌকিক উপাদান—চরিত্র, বিষয়বস্তু ও বিশ্বাসের মধ্যে।

এছাড়া বাংলা উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে নানা লৌকিক ক্রিয়া (Ritual) ও উৎসবানুষ্ঠান (Festival) এর বিচিত্র বর্ণনা। পারিপার্শ্বিক রচনা ও পরিবেশ সৃষ্টিতে এবং চরিত্র সৃষ্টির পটভূমিকা নির্মাণে এর ভূমিকা অসাধারণ। তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' উপন্যাসটির মধ্যে নানা লোকায়ত পর্ব-পার্বণ, উৎসব, পূজানুষ্ঠান উপন্যাসটির পটভূমিকা হিসাবে কাজ করায় উপন্যাসটির লোকায়ত মানুষগুলি যেমন সজীব ও স্পষ্ট হয়েছে, ঠিক তেমনি উপন্যাসটির গঠনকার্যে বাস্তবতা ও জীবনধর্মীতা অত্যন্ত প্রখর হয়েছে। ফলে উপন্যাসটি কালজয়ী হয়েছে। লৌকিক ক্রিয়ার সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যায় যে। ধর্মীয় বিধি বিধানকে কার্যকরী ভাবে সার্থকতায় মণ্ডিত করাই ক্রিয়া। প্রার্থনা, স্তব-সঙ্গীত, নৃত্য নিবেদন, কোরবানী বলি প্রদান ইত্যাদি উৎসর্গ এবং দান-খয়রাত-অতিথিসৎকার ইত্যাদি এর অন্তর্গত। অন্যদিকে অনুষ্ঠান (ceremony) বলতে অনেক ক্রিয়ার বা রিচুয়ালের যুগপৎ প্রয়োগ বোঝায়, বছরের বিশেষ সময়, গাজন, দুর্গাপূজা, ঈদ, বড়দিন পালিত হলে দেখা যায় সেখানে পর পর কতকগুলি ক্রিয়া পালিত হচ্ছে। ক্রিয়ানুষ্ঠানকে আমরা (Ritual এবং ceremony) এর একত্রিত রূপ বলতে পারি। জীবনের নানা আপদে-বিপদে, বিবাহে মৃত্যুকালে, নামকরণে যে ক্রিয়া গুলি হয় তা অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত (individual), কিন্তু যে সমস্ত বিপদাপদ একটি গোটা সমাজ, জনগোষ্ঠী বা একটা দেশকে আক্রান্ত করে তখন সামাজিকভাবে ক্রিয়ানুষ্ঠানের পালা শুরু হয়। অতি বৃষ্টি, বন্যা, অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, মড়ক ও অন্যবিধ রোগ-ব্যধির প্রকোপ দেখা দিলে সমবেত ক্রিয়ানুষ্ঠান পালিত হয়। উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে সম্মিলিত শিকার, সমবেত মাছ ধরা ও ফসল তোলার সময়ে এধরনের ক্রিয়ানুষ্ঠান পালিত হয়। 'হাসুলীবাকের উপকথায়' ও 'গণদেবতা'য় বহু ক্ষেত্রেই এধরনের গোষ্ঠী উৎসব ও আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াদির বর্ণনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মেলিনো ওস্কির মতামত খুবই গুরুত্ব পূর্ণ : আদিম সংস্কৃতির অঙ্গীভূত

হয়ে আছে আদিম যাদুবিদ্যা—এই যাদুবিদ্যার উপাদান মন্ত্র, আচার অনুষ্ঠান ও বিধি নিষেধের মাধ্যমে বর্বর মানুষ ভাগ্য ও দৈব ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত ও জয় করতে চায়। যাদুবিদ্যা তখন সমৃদ্ধি লাভ করে, যখন মানুষ বিজ্ঞানের মাধ্যমে বিপদাপদকে জয় করতে পারে না। শিকারে, মাছ ধরায়, যুদ্ধকালীন সময়ে, প্রেমের মুহূর্তে, বৃষ্টি ও মৃত্যুর ছায়াপাত ঘটলে যাদুবিদ্যা জাঁকালো হয়ে দেখা দেয়। তারাশঙ্করের 'রাধা' উপন্যাসে যাদুবিদ্যা ডাইনীতন্ত্রের কথা যেমন বিস্তারিত ভাবে উপস্থিত হয়েছে ঠিক তেমনি কপালকুণ্ডলা, পথের পাঁচালী, আরণ্যক প্রভৃতি উপন্যাসে এসব যাদুক্রিয়া, ডাইনীতন্ত্রের অন্যান্য লৌকিক আচার মূলক ক্রিয়ানুষ্ঠানের বহু বর্ণনা উপস্থিত হয়েছে। অপর দিকে লোকসংস্কার ও লৌকিক বিশ্বাসের ফলে বাঙলা উপন্যাসের চরিত্রগুলি বিশেষ করে নারী চরিত্রগুলি কিভাবে গঠিত হয়েছে তারও অসংখ্য উদাহরণ উপস্থিত করা হয়েছে। প্রভাত মুখোপাধ্যায় এর 'রত্নদীপ উপন্যাসে দেখা যায় রূপকথার দৈব সংঘটনের মোটিফটি একটি নারীর জীবনের বেদনাময় সংঘাত ও ট্র্যাজেডীর করুণ পরিণতি সৃষ্টি করেছে। একটি জমিদার বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী সন্ন্যাস গ্রহণের পর পারিবারিক সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেছিলো। পরে পিতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যু সংবাদ শুনে বাড়ি ফেরার পথে অকস্মাৎ রেলগাড়িতে এক ক্ষুদ্র ষ্টেশনে তাঁর মৃত্যু হয়। সেই ষ্টেশনের সহযোগী ষ্টেশন মাষ্টার রাখাল ভট্টাচার্যের সঙ্গে এই জমিদার পুত্র ভবেনের সাদৃশ্য ছিল। মৃত ভবেনের ডায়েরী পড়ে তার জীবন কাহিনী জেনে নেয়। ঐ সময় রেলের চাকরি থেকে বরখাস্ত হবার পর ভবেন সেজে ঐ জমিদারী হস্তগত করার জন্যে ভবেনের গ্রামে আসে। জাল ভবেন সমস্ত পরীক্ষাতেই উত্তীর্ণ হল বটে কিন্তু ব্রহ্মচারিণী-বেশধারিণী, কঠোর ব্রত-সাধনে ব্রতী বৌরাণীকে দেখে তার সঙ্কল্প বিচলিত হয় এবং সে তার অঙ্গ স্পর্শ করার দুঃসাহসকে মনে স্থান দিতে পারল না। সুতরাং সেও এক ব্রতের অছিলা করে বৌরাণীর সান্নিধ্য ত্যাগ করে চলতে থাকে। পরে সমস্ত প্রকাশিত হওয়ার পর এই নিদারুণ আঘাতে বৌরাণীর জীবনদীপ নির্বাপিত হ'ল—তাঁকে চিতাশয্যায় শায়িত করার সময় দেখা গেল তাঁর বিয়ের স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ বাসরে খেলার কড়িগুলি তাঁর অঞ্চলে বাঁধা আছে। এই কাহিনীটিকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় লোক সংস্কার এবং লৌকিক বিশ্বাস কিভাবে বাঙলা দেশের নর নারীর চরিত্রকে প্রভাবিত করে আছে। ভবেনের মৃত্যুর আকস্মিকতাও রাখালের চেহারার সাদৃশ্য সৃষ্টির মধ্যে যেমন রূপকথার দৈব ও অলৌকিকতার মোটিফ বিদ্যমান, ঠিক তেমনি ব্রতধারিণী বৌরাণীকে স্পর্শ না

করা এবং বৌরাণী আঁচলে বিবাহ বাসরের কড়ি বাঁধার ঘটনা দুটির মধ্যে লৌকিক সংস্কার ও লোক বিশ্বাসে এর পরিচয়টি ফুটে উঠেছে। এইভাবে দেখলে দেখা যায় বাংলা উপন্যাসের আঙ্গিক ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে লৌকিক উপাদানগুলি এসেছে কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষ ভাবে। কখনও আঙ্গিকগত ভাবে উপন্যাসের গঠনকে প্রভাবিত করেছে, কখনও বিষয়বস্তুতে লোককথার প্রভাব এসেছে, কখনও চরিত্র সৃষ্টিতে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারে বিশেষভাবে সাহায্য করেছে, কখন পরিবেশ রচনায় লোক উৎসব, যাদু বিশ্বাস, লোকাচারঘটিত ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠানগুলি বিশেষভাবে সাহায্য করেছে এবং বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদানের প্রভাব বৃদ্ধি করেছে।

এবার বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের সূচনায় বাংলা গদ্য সাহিত্যের আদিযুগের লিখিত গল্প কথায় লোককথার প্রভাব কত কার্যকরী ছিল তা সংক্ষেপে আলোচনা করলে বাংলা উপন্যাসের পূর্ব রূপটি আমাদের স্পষ্ট হবে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার, সেই সুপ্তি, কোথায় গেল সেই বিজয় বসন্ত, সেই গুলেবকাওলি, সেই বালক ভুলানো কথা। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য থেকে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে বিজয় বসন্ত ও গুলেবকাওলির ন্যায় দেশী ও বিদেশী রূপকথা বাঙালী পাঠকের গল্প শোনার প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করতো। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত বিজয় বসন্ত এর রূপকথাটি অবলম্বন করে 'কীর্তি বিলাস' নাটকটি রচনা করেন। রূপকথাকে নির্বিশেষ বৈশিষ্ট্য থেকে মুক্ত করে ইনিই সর্বপ্রথম নাটকের মধ্যে লোকসাহিত্যের উপাদানকে আধুনিক সাহিত্যের বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করেন। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে হরিনাথ মজুমদার বাঙলা দেশের এই সুপরিচিত রূপকথাটির একটি গদ্য উপাখ্যানের রূপ দেন। 'গুলেবকাওলি'র রূপকথা ধর্মী উপাখ্যানটি উনবিংশ শতকের গদ্য, নাটক ও কাব্য—তিনরূপেই প্রচলিত ছিল। অনেকে মনে করেন মধ্য যুগে মুসলমানদের এদেশের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে আরবী ও পারসী ভাষার ভিতর দিয়ে এক শ্রেণীর রোমান্টিক কথা সাহিত্য 'আরব্য-উপন্যাসে'র মত এদেশে প্রচার লাভ করে। 'গুলেবকাওলি'র গল্পটি সেভাবেই এসে থাকবে। আবার অনেকে বলেন ১৭২২ খৃষ্টাব্দে ইজ্জত উল্লাহ নামক এক বাঙ্গালী মুসলমান কবিই এই গল্পটিকে বাংলা কাব্য থেকে পারসী ভাষায় রূপান্তরিত করেন, মূল কাহিনীটি বাংলা ভাষায় এদেশেই রচিত। উনবিংশ শতকে এই কাহিনীটিরই ধারা অনুসরণ করে বহু কবি, নাট্যকার ও গদ্য উপাখ্যান

রচয়িতা কাব্য, নাটক ও গদ্য উপাখ্যান রচনা করেছিলেন। এর মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের আচার ও বিশ্বাস যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি বাঙলা দেশের প্রচলিত রূপকথার মোটিফ ছোটরাণীর দুর্ভাগ্য দৈব, নিষেধ (Taboo) হঠাৎ অন্ধত্ব, হঠাৎ চক্ষুষ্মান হওয়া, দুষ্প্রাপ্য বকাওলি পুষ্পের অলৌকিক ক্রিয়া, পরীরাজ্য ইত্যাদি গুলিও সমস্ত গল্পটিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, অপর দিকে রূপকথায় যে শাশ্বত মানবিক বৃত্তির প্রকাশ ঘটে তা দ্বারাও এই উপন্যাসটি সমৃদ্ধ হয়েছে। গল্পটি এই : রাজার দুটি রাণী। ছোটরাণী গর্ভবতী হলে জ্যোতিষ গণনা করে রাজাকে বললেন যে এই পুত্র মুখ নিরীক্ষণ করলে রাজা অন্ধ হয়ে যাবেন। ছোটরাণী পুত্র সন্তান প্রসব করতেই রাজা তাকে ও তার পুত্রকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দিলেন। বহুদিন পরে একদিন রাজা যখন পারিষদ বর্গের সঙ্গে ভ্রমণ করছিলেন তখন এক অশ্বরোহী যুবককে দেখে রাজা অন্ধ হয়ে গেলেন। রাজা বড়রাণীর পুত্রদের জানালে তারা তাকে হত্যা করার আদেশ প্রার্থনা করলো। রাজা ইতিপূর্বে ছোটরাণীর পুত্রের রূপগুণ ও পাণ্ডিত্যের কথা শুনে ছিলেন তাই তিনি পুত্রদের নিরস্ত করলেন। ছোটরাণীর রাজার এই দৈব বিড়ম্বনায় দুঃখিত হলেন। এদিকে রাজবৈদ্য বিধান দিলেন যে দুষ্প্রাপ্য বকাওলি ফুলের রস রাজার চোখে দিলে রাজার দৃষ্টি ফিরে পাবেন। ছোট রাজপুত্র ফুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো নৌকা যোগে। পথে পড়লো ফেরদৌসীরাজ্য। সেখানকার রাজকন্যার পণ যে তাকে পাশা খেলায় হারাতে পারবে তাকে তিনি বিবাহ করবেন। বহু রাজপুত্র হেরে কারারুদ্ধ হলেন। কিন্তু এই ছোটরাজ পুত্র রাজকন্যাকে হারিয়ে তাকে বিয়ে করলো এবং বহু অনুসন্ধানের পর পরীরাজ্যে উপস্থিত হয়ে উদ্যানের প্রধান প্রহরীর কন্যাকে বিয়ে করে ঐ পুষ্প সংগ্রহ করলেন এবং পরে পরীরাজ্যের কন্যার সঙ্গে তার বিবাহ হয়ে গেল এবং সেখানেই বসবাস করতে লাগলেন।

উপরোক্ত উপাখ্যানটিতে কেবলমাত্র বাঙলা দেশের রূপকথার সুপরিচিত মোটিফ গুলিই প্রকাশিত হয়নি, লেখক তার মধ্যে আর একটি নুতন জিনিস যুক্ত করেছেন তা হচ্ছে পাত্র-পাত্রীদের নামকরণ। রূপকথার রাজা, রাজপুত্রের, রাজকন্যার কোন নাম থাকে না, সে চরিত্রগুলি নির্বিশেষ, দেশ কাল সীমার কোন বন্ধনের দ্বারা আবদ্ধ নয়। তাই সেগুলি লঘুভার মেঘের মত দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়াতে পারে। শুধু তাই নয় যুগ-যুগান্তরের সমাজ ও দেশ গত বিবর্তনের ও পরিবর্তনের মধ্যেও তারা টিকে থাকে—এমনই লোককথার প্রাণ শক্তি (vitality)। এইরূপ কথাধর্মী উপাখ্যানটির বৈশিষ্ট্য হল যে এর মধ্য দিয়ে

রূপকথা বাঙলা উপন্যাসের রূপে যে রূপান্তরিত হচ্ছে তার আভাস পাওয়া যায়। এখানে লেখক প্রত্যেকটি চরিত্রের আলাদা আলাদা নামকরণ করেছেন—নির্বিশেষ থেকে বিশেষে এনেছেন, স্থানীয় সীমায় বন্ধন ঘটিয়েছেন রাজ্যের নামকরণ এর মধ্য দিয়ে। রাজ্যের নাম 'শর্কস্তান', রাজার নাম 'জৈনল মলুক' রাণীর নাম স্থয়েসা, বড়রাণীর দুই পুত্রের নাম ঋমান ও খোমান, ছোটরাণীর পুত্রের নাম তাজল. প্রথম যে নগরে পদার্পণ করলো তার নাম ফেরদৌসী, পরীকন্যার নাম 'বকাওলি'। এ ভাবে এর মধ্য দিয়েই বোঝা যায় লোককথার কাহিনী, চরিত্রগুলি কিভাবে বাঙলা উপন্যাসের প্রাথমিক যুগে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই একজন বিশেষজ্ঞের ভাষায়: লোককথার মধ্যে চরিত্র এবং দেশকালের যে নির্বিশেষত্ব আছে, তাহাদিগকেই আধুনিক ব্যক্তি স্বাতন্ত্র, প্রতিষ্ঠার যুগে সবিশেষ পাত্রে রূপায়িত করিয়া লইয়াই আধুনিক উপন্যাসের স্থচনা হইয়াছে। লোককথার রাজপুত্রই আধুনিক কথা সাহিত্যের জগৎ সিংহ এবং লোককথার মধুমালাই তিলোত্তমা।" (আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা কথাসাহিত্যের ইতিহাস, সং ১৩৭১, পৃঃ ৫১-৫২)। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে তারাশঙ্কর তর্করত্ন অনুদিত 'কাদম্বরী' প্রকাশিত হয়। এটি বাণভট্ট রচিত সংস্কৃত গদ্য কাব্য (prose Romance) 'কাদম্বরী'র সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। এই গ্রন্থটি রূপকথা ধর্মী এবং এর মধ্য দিয়ে সংস্কৃত সাহিত্যের যে সব উপাখ্যান বা গল্প কাহিনী এতদিন বাঙালী পাঠকের কাছে অলব্ধ ছিল, তা অত্যন্ত নিকটবর্তী হয়ে গেলো। এই পথ অনুসরণ করে ১৮৬৩তে 'পারিজাত কুসুম' নামক একটি গদ্য রোমান্স প্রকাশিত হয়। এর উপাখ্যানটিও রূপকথাধর্মী।

মধ্য যুগ থেকেই বাংলা সাহিত্যে এক শ্রেণীর কথাসাহিত্য বিশেষ করে মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল। এই কথা সাহিত্যের মোটামুটি দুটি ধারা ছিল, একটি মুসলমান ধর্মের ইতিবৃত্ত অবলম্বন করে রচিত, অপরটি প্রধানতঃ লৌকিক প্রণয়োপাখ্যান, এর সঙ্গে কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের কোন মতবাদের যোগ ছিল না। এই লৌকিক প্রণয়োপাখ্যানগুলিকে অপর দুটি ভাগে ভাগ করা যায়: প্রথমতঃ আরবী-পারসী হিন্দী সাহিত্যের বাংলায় অনুবাদ, দ্বিতীয়তঃ বাংলায় প্রচলিত কাহিনীগুলির ইসলামী কৃত রূপ। আরব্যাপারস্যোপন্যাসের এবং হিন্দীর সাহিত্যের নানা কাহিনী বাংলায় অনুদিত হয়ে বাংলার কথাসাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছিলো, ঠিক তেমনি বাংলার রূপকথাগুলির মধ্যে মুসলমান নায়কনায়িকার নাম সংযোজনা করে আরবী-পারসী শব্দের বহুল প্রয়োগ ঘটিয়ে আর একটি নবতর লৌকিক রূপকথার কাহিনীর সৃষ্টি হচ্ছিলো। মধ্যযুগ থেকে উদ্ভূত হয়ে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যে

সব মুসলিম প্রণয়োপাখ্যান প্রচলিত হয়ে আসছিলো তার মধ্যে 'হাতিমতাঈ', 'লাইলা মজনু', 'শিরীফরহাদ' 'ইউসুফ জুলেখা' ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের কাহিনীগুলি সংস্কৃত পুরাণ মহাকাব্য থেকে জন্ম লাভ করে বাঙালী জাতীয় জীবন রসে জারিত হয়ে গেছলো, এই বিদেশী রূপকথাগুলি কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে তাদের অস্তিত্ব রক্ষা করেছিলো বলে বাংলার জাতীয় জীবনের সঙ্গে তা মিশে যায় নি। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে ঐ আরব্য পারস্য রূপকথা, বাংলার প্রচলিত রূপকথা ও সংস্কৃত উপাখ্যান গুলির সংমিশ্রণে একটি নূতন শ্রেণীর লৌকিক কথাসাহিত্যও নয়, অথচ উপন্যাসও নয় একটি নব্যকথাসাহিত্যের সৃষ্টি হচ্ছিলো। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে খোদকার শামসুদ্দিন মুহম্মদ সিদ্দিকী 'ভাব-লাভ নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের কাহিনীটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আরব্য উপন্যাসের কাহিনী এবং বাংলার লৌকিক রূপকথা মধুমালার কাহিনীর সংমিশ্রণে এটি রচিত হয়েছে। এর মধ্যে 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' এবং 'বত্রিশ পুতুলে'র কাহিনীর প্রভাব ও লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং একথা নিসন্দেহেই বলা যেতে পারে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের সূচনায় যে কেবলমাত্র পাশ্চাত্ত্য কথাসাহিত্যের প্রভাব সক্রিয় ছিল তা নয়। বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ধারাকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তিনটি স্বতন্ত্র ধারা কেবলমাত্র সূচনার যুগে বাংলা উপন্যাসকে প্রভাবিত করে নি পরবর্তী যুগের বাংলা উপন্যাসের গতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে নানা ভাবে। যথা : প্রথমতঃ পাশ্চাত্ত্য কথাসাহিত্যের অনুসরণের ধারা, দ্বিতীয়তঃ সংস্কৃত, পালি ইত্যাদি ক্ল্যাসিক্যাল ভাষা ও সাহিত্যের কথা ও আখ্যায়িকার ধারা। তৃতীয়তঃ বাংলা দেশের প্রচলিত লৌকিক কথাসাহিত্যের ধারা। এর সঙ্গে আরও একটি ধারা সংযুক্ত করা যেতে পারে সেটি হচ্ছে আরব্য-পারস্য উপন্যাসের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানের ধারা। তাই কেবল পাশ্চাত্ত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যই নয় দেশী ও বিদেশী লোককথার ধারাও বাঙলা উপন্যাসের সূচনার যুগে তার মানস গঠনে, রোমান্স সৃষ্টির ভিত্তি মূলে অধিকতর ভাবে জল সিঞ্চন করেছে। পরবর্তী অধ্যায়-গুলিতে দেখা যাবে আঙ্গিক ও বিষয়বস্তু গত ভাবে বাংলা উপন্যাস কিভাবে লৌকিক উপাদান গুলিকে আত্মসাৎ করে নিজেকে সংবর্দ্ধিত করেছে।

প্রথম অধ্যায়

লোক ঐতিহ্য, লোকশ্রুতি ও আধুনিক সাহিত্য

॥ এক ॥

Folklore কথাটির অভিধানিক অর্থ দিতে গিয়ে তাত্ত্বিক পণ্ডিত বলেছেন "The traditions, customs, and beliefs of the people as they appear in non-literary tales, songs and sayings. The basic requirement of living folklore is that it be traditional, widely current, and transmitted primarily through memory and practice rather than by the printed page"[১] অর্থাৎ লোক-সাহিত্য হচ্ছে জনমানসের ঐতিহ্য, সামাজিক রীতিনীতি ও বিশ্বাসের এমন সব রূপ যা গল্পে গানে, কথায় এবং প্রবাদে আত্মপ্রকাশ করে। লোক সাহিত্যের তাই নিম্নতম প্রয়োজন হচ্ছে এর ঐতিহ্য, স্বতঃস্ফূর্ততা, যা যত না বেশি লিখিত তার চেয়ে অনেক বেশি জনমানসের স্মরণগত। Jonas Balys বলেছেন—Folklore comprises traditional creations of peoples premitive and civilized. These are achieved by using sounds and words in metric form and prose, and include also folk beliefs or superstitions customs and performances, dances and plays'[২] অর্থাৎ লোকশ্রুতি হচ্ছে আদিম ও সভ্য মানবগোষ্ঠীর ঐতিহ্যগত সৃষ্টির ধারক, ছন্দোবদ্ধ শব্দে এবং গদ্যে, লোকবিশ্বাস, কুসংস্কার রীতিনীতি, নৃত্যগীতাদি-এর অন্তর্ভুক্ত থাকে। এছাড়াও তিনি বলেছেন, Folklore is not a science about a Folk, but the traditional folk science and folk poetry' অর্থাৎ লোকশ্রুতি কেবলমাত্র একটি প্রাকৃতজনের বিজ্ঞান নয়, বরং লোকশ্রুতি ঐতিহ্যানুযায়ী লোকবিজ্ঞান এবং লোককাব্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে লোকসাহিত্যর অন্তরালে লোকঐতিহ্যের একটি স্বতোৎসারিত ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে যাকে বলা চলে লোকসংস্কৃতির প্রাণরস। এই প্রাণরসটির নাম দেওয়া যেতে পারে লোকঐতিহ্য বা Folk tradition। এখন এই লোকঐতিহ্যর স্বরূপটি কি তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। বাংলাদেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। 'বস্তুত, বাঙালীর

ধর্মকর্মের গোড়াকার ইতিহাস হইতেছে রাঢ়-পুণ্ড্র-বঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদগুলির অসংখ্য জন ও কোমের, এক কথায় বাংলার অদিবাসিদেরই পূজা, আচার, অনুষ্ঠান, ভয়, বিশ্বাস, সংস্কার প্রভৃতির ইতিহাস[৩]।

Tradition কথাটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আধুনিকতম প্রাজ্ঞ T. S. Eliot এক জায়গায় বলেছেন, Tradition is not Solely or even primarily the maintenance of certain dogmatic beliefs, these beliefs have come to take their living form in the course of the formation of tradition.[৪]

অর্থাৎ ঐতিহ্য পরিপূর্ণভাবে অথবা প্রাথমিকভাবে কতকগুলির কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের প্রতিপালক নয়। এই বিশ্বাস পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়েছে ঐতিহ্যগঠনের মধ্য দিয়ে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন—"what I mean by tradition involves all those habitual actions, habits and customs from the most significant religious rites to our conventional way of greeting a stranger which represent the blood kinship of the 'same people living in the same place'. It involves a good deal which can be called 'taboo.'[৫] ঐতিহ্য বলতে Eliot বোঝাতে চেয়েছেন যে অভ্যাসগত কার্যাবলী, ব্যবহার এবং রীতিনীতির এক ধর্মীয় সমন্বয়, যা taboo নামক এক বিশেষ শব্দে পরিণত।

এই tradition বা ঐতিহ্যের মধ্যেই মানুষ লালিত পালিত ও সংবর্ধিত। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচেনা, ঠিক তেমনি মানুষের ঐতিহ্য-বহির্ভূত অস্তিত্ব অকল্পনীয়। যুগযুগান্তরের আচার ব্যবহার রীতিনীতি ভাললাগা মন্দলাগার সমন্বয়েই ঐতিহ্যসংগঠিত। এই ঐতিহ্যের আমরা দুটি রূপ কল্পনা করতে পারি। প্রথমতঃ লৌকিক রূপ, দ্বিতীয়তঃ সাংস্কৃতিক বা শাস্ত্রীয় রূপ। প্রথমটিকে আমরা যদি বলি গ্রাম্য বা লোকায়ত রূপ, দ্বিতীয়টিকে বলবো উচ্চতর রূপ। প্রথম রূপটি oral tradition বা মৌখিক ঐতিহ্য) যা লৌকিক ঐতিহ্যরূপেও সুপরিচিত। এই oral tradition-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে Jan Vasnina বলেছেন—oral traditions consists of all verbal testimonies which are reported statement—that is, which have been transmitted from one person to one another through the medium of language'[৬] অর্থাৎ সমস্ত মৌখিক উৎসই লৌকিক

ঐতিহ্য নয়। কেবলমাত্র যেগুলি মৌখিকভাবে বিবৃত যা একব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তিতে কেবলমাত্র ভাষার মাধ্যমে বিবর্তিত হয়।

গুহাযুগের মানুষ যখন অবোধ্য দুর্বোধ্য ভাষায় আনন্দ প্রকাশ করতো তখন সেই আদিমতম আনন্দের উচ্ছ্বাসটিকে আমরা মানুষের আদিম অনুভূতির প্রকাশ বলতে পারি। তারপর সভ্যতার অগ্রসরে কৃষিজীবী মানুষ যখন কর্মের অতিরিক্ত অফুরন্ত সময় পেয়েছে সে আমোদে, আনন্দে মুখরিত হয়ে তাদের অতিরিক্ত সময়কে অতিবাহিত করেছে। এরপর সমাজের অগ্রসরণের পথে নানা আচার বিচার রীতিনীতি ও কর্মপদ্ধতি এসেছে। জটিল হয়েছে সমাজ দেহের অভ্যন্তর, কিন্তু সমাজের সমষ্টিগত আনন্দ সেখানে বাধা পায়নি বরং উৎসাহের সঙ্গে সে রচনা করে চলেছে গান, ছড়া, ব্রতকথা রূপকথা, উপকথা। দিগন্ত বিস্তৃত নদীর তরঙ্গিত জলপথে নৌকা বাইতে বাইতে মাঝি গেয়ে ওঠে—

মন না যেনে দিয়না নয়ন করিগো মানা
নয়ন দিলে যারে জন্মের মতন যে
আরতো তারে পাবিনা।

কিংবা, মা খোকাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে—

চাঁদ দোলে সুয্যি দোলে দোলে নদীর জল
দোলে আমার গোপাল মনি দে দোল দে দোল।

কিংবা, বাংলাদেশের কুমারী ভাদ্রমাসের বাদলের ধারায় গেয়ে ওঠে :

মাথা ঘস্তে রইলাম বস্তে
আর আমাদের কে আছে
মা রইল তেপান্তরে
প্রাণ জুড়াইব কার কাছে ?

এইভাবে লোকায়ত জীবন আর তার ঐতিহ্য সৃজন করে নিয়েছে তার আনন্দ বেদনাকে গানে, ছড়ায়, ব্রতকথায়। মানুষ আরও অগ্রসর হয়েছে চিন্তায় কর্মে ও ধর্মে। সে আরও আধুনিক হবার দিকে পা বাড়িয়েছে। তার সাহিত্য-স্রোত লোকায়ত জীবন থেকে বাঁক নিয়ে আধুনিক জীবনের বিভিন্নস্তরে প্রবেশ করেছে। কিন্তু এই আধুনিকতার শুরু লোক ঐতিহ্যকে বা লোকায়ত জীবনদর্শনকে অস্বীকার করে নয়, বরং স্বীকার করে।

লোকসাহিত্য জনমানসের সৃষ্টি, ব্যক্তির সত্তা যেখানে প্রায় বিলুপ্তির পথে, সেখানে সমষ্টির মনের অন্তরালে থেকে আনন্দ ঝরনা উচ্ছ্বসিত হয়ে সমাজদেহের

অভ্যন্তরে বয়ে চলেছে। সেখানেই এর যথার্থ স্থান। সেখানে সমাজদেহ সংযত, সংহত, দেশ কালের দ্বারা অবিচ্ছিন্ন, লোকসাহিত্য সেই সমাজ মনেরই সৃষ্টি, অপরদিকে আধুনিক সাহিত্য ব্যক্তি মানুষের সৃষ্টি। ব্যক্তির সত্তা যেখানে প্রকট যেখানে ব্যক্তি মনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ বেদনার ঝরনাধারা বয়ে চলেছে সেখানেই আধুনিক সাহিত্যর যথার্থ স্থান। কিন্তু তথাপি লোক ঐতিহ্য এবং উচ্চতর ঐতিহ্যকে যেমন পৃথক করা যায় না একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত, ঠিক তেমনি লোকসাহিত্য এবং আধুনিক সাহিত্য পরস্পর পরস্পরের প্রতি নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি যুক্তি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

(১) A. M. Espinosaর মতে Folklore has very deep roots and its traces are everpresent even among peoples that have reached a high state of culture[৭]—অর্থাৎ লোকশ্রুতির একটি গভীর মূল বা উৎস আছে এবং এর চিহ্ন উচ্চতর কৃষ্টিসম্পন্ন জনমানসের মধ্যেও বর্তমান।

(২) "In actual experience, however folklore and the literary tradition can not be separated in airtight compartments, they are mutually influential and the distinction between 'folk literature' and 'art literature' 'becomes one of degree"[৮] অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে লোকশ্রুতি এবং সাহিত্য ঐতিহ্য সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয় বরং তারা পারস্পরিক প্রভাব সংযুক্ত। তাই লোকসাহিত্য এবং উচ্চতর সাহিত্যের পার্থক্য কেবলমাত্র পরিমাণগত।

(৩) "Art literature often appropriates themes from folklore, usually modifying them to suit their new social environment. Most of the worlds greatest writers have incorporated some themes from folklore into their work[৯] অর্থাৎ উচ্চতর সাহিত্য প্রায়শই লোকসাহিত্য থেকে বিষয়বস্তু আহরণ করে এবং সুবিধামত সামাজিক পরিবেশে পরিশুদ্ধ করে নেয়। পৃথিবীর মহত্তম লেখকবৃন্দ তাঁদের অনেক বিষয়বস্তু লোকশ্রুতি থেকে আহরণ করেছেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে লোক ঐতিহ্য এবং লোকসাহিত্য উচ্চতর সাহিত্য এবং উচ্চতর সংস্কৃতি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি স্মরণযোগ্য :—

'গাছের শিকড়টা যেমন মাটির সঙ্গে জড়িত এবং তাহার অগ্রভাগ আকাশের দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে তেমনি সর্বত্রই সাহিত্যের নিম্ন অংশ স্বদেশের মাটির মধ্যে অনেক পরিমাণে জড়িত হইয়া ঢাকা থাকে[১০]। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, নিম্নসাহিত্য এবং উচ্চ সাহিত্যের মধ্যে একটি ভিতরকার যোগ আছে। যে অংশ আকাশের দিকে আছে তাহার ফুল ফল ডালপালার সঙ্গে মাটির নীচেকার শিকড়গুলোর তুলনা হয়না—তবু তত্ত্ববিদদের কাছে তাহাদের সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ কিছুতেই ঘুচিবার নহে [গ্রাম্য সাহিত্য]

একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞের অভিমত: ধর্মীয় উচ্চাঙ্গ জনপ্রিয় নাট্য সঙ্গীত উৎসবের গান সকলেরই উৎস লোকসঙ্গীত।

[লৌকিক ও রাগসঙ্গীতের উৎস সন্ধানে ডঃ শ্রীকৃষ্ণনারায়ণ রতন ঝংকার | পৃঃ৫৭]

॥ দুই ॥

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর চিন্তা জাগরণ ও বাংলা সাহিত্যের বিরাট বিপ্লব আধুনিক ঐতিহাসিকের নিকট উনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস বা নবজাগরণরূপে পরিচিত। ঐতিহাসিকের মতে—'on 23rd June 1757, the middle age of India ended and her modern age began' ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলাদেশে মুঘল শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মুঘল সম্রাটের সাম্রাজ্য-শক্তির অমোঘ প্রতাপ বাংলার পাঠান আমলের সমস্ত শক্তিকে সুদৃঢ় শাসন ও শোষনের মধ্যে নিক্ষেপ করে এবং ধীরে ধীরে গ্রামীণ সমাজ ও সংস্কৃতি নাগরিক জীবনাদর্শের কবলে পড়ে ম্লান হতে আরম্ভ করে। সামন্তগণ যে মধ্যযুগীয় বাংলার সংস্কৃতির বাহক ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে তা হতবল হয়ে পড়লো। পুরাতন জমিদারের স্থলে যারা ক্ষমতার অধিকার পেলো, তারা শিক্ষা সংস্কৃতির ধার ধারতো না। পরবর্তীকালে কবিগান, আখড়াই প্রভৃতি নিম্নরুচির সংস্কৃতির এঁরাই ছিলেন প্রধান পৃষ্ঠপোষক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"বাংলার প্রাচীন কাব্যসাহিত্য এবং আধুনিক কাব্যসাহিত্যের মাঝখানে কবিওয়ালার গান।' তাই রবীন্দ্রনাথ একে বঙ্গসাহিত্যের ক্ষণস্থায়ী গোধুলি আকাশের অপ্রত্যাশিত পতঙ্গের আগমনের মতো কল্পনা করেছেন এবং বলেছেন, কবিওয়ালাদের গানে, সাহিত্যরসের সৃষ্টি অপেক্ষা খানিক উত্তেজনা উদ্রেকেই প্রধান লক্ষ্য।'

[লোকসাহিত্য/পৃঃ ৫২]

তারপর ক্লাইভ, হেষ্টিংস, কর্ণওয়ালিস ও ওয়েলেসলির শাসন শোষণে অর্ধশতাব্দীর মধ্যে বাংলার সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অভূতপূর্ব পরিবর্তন শুরু হলো। বাঙালির জীবন ও সংস্কৃতি থেকে মধ্যযুগ অপসৃত হলো। ইউরোপের উদ্দাম চঞ্চলতা আমাদের অবরুদ্ধ দ্বারে প্রবল আঘাত হানলো। এই আধুনিকতার অর্থ হলো ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রবাদ মানবতাবাদ জ্ঞানস্পৃহা, সংস্কার মুক্তির আকাঙ্ক্ষা, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ, জাতীয়তাবোধ ও নারীমুক্তির আকাঙ্ক্ষা। জীবন ও সাহিত্যের এই পরিবর্তন বাঙালিকে ও বাংলাসাহিত্যকে আধুনিক করে তুললো। এবং এই আধুনিকতার প্রাগুষার কবি ঈশ্বর গুপ্ত। বাংলাসাহিত্যের প্রখ্যাত ইতিহাসকার ডঃ সুকুমার সেনের মতে: "ঈশ্বর গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও নবীন দুই যুগের মধ্যে সেতুসংযোগ করিলেন[১১]। প্রায় শিক্ষিত হয়েও আধুনিক জীবনের ভাবধারা সম্বন্ধে সচেতন থাকা, কবিতায় পুরাতন পন্থী হয়েও বাস্তব চিত্র অঙ্কন করা, স্বাদেশিক মনোভাব ও রঙ্গব্যঙ্গের তীক্ষ্ণতা সৃষ্টি বা নতুন ও পুরাতনের যুগপৎ প্রভাব স্বীকার করে নেওয়া তাঁর কবি প্রতিভার মানসিক প্রবণতার একটা বড় বৈশিষ্ট্য[১২]। ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে আধুনিকতার স্বাক্ষর থাকলেও লৌকিক জীবনের নানা চিহ্ন তাঁর কাব্যে স্পষ্ট বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় তাই বলা চলে: যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাংলা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা শহরের কবি, তিনি বাংলার গ্রাম্য দেশের কবি।

উনবিংশ শতকের আধুনিকতায় পাশ্চাত্য ও সংস্কৃত প্রভাব থাকলেও একটি লৌকিক ঐতিহ্যের প্রভাব আছে এ যুগের আধুনিক সাহিত্যের স্তরে স্তরে। সমালোচক মোহিতলালের ভাষায়, পশ্চিমের প্রবল প্রভাব শিক্ষা-দীক্ষা, রুচি ও আশা বিশ্বাস—যাহাকে একেবারে জয় করিয়া পাইয়াছিল, তাহারই মধ্যে বাঙ্গালীর বাঙালীতম প্রাণ, সেই পাশ্চাত্য প্রভাবের পীড়নেই ভিতরে ভিতরে গুমরিয়া উঠিল···সর্বস্ব বিসর্জন দিয়া মনুষত্ব হারাইয়া, নারীর যে প্রেম ও স্নেহের আত্মত্যাগ যে এখনও প্রাণে প্রাণে অনুভব করে, এবং করে বলিয়াই এখনও একেবারে বিনষ্ট হয় নাই, সেই অনুভূতি মেঘনাদ বধের কবির বাঙ্গালীত্ব অটুট রাখিয়াছে। বাঙ্গালীর গৃহ সংস্কারের সেই পুণ্যদীপ্তি মধুসূদনের হৃদয়ে তাহার মায়ের সেই স্নেহ অকুলতায় অশান্ত স্মৃতি তাঁহাকে বিধর্ম হইতে রক্ষা করিল।[১৩] এমনি করেই শুরু হয়েছিলো আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের ভিত পত্তন। বাইরের প্রচণ্ড প্রভাবে ভিতরের প্রাণ বস্তু আলোড়িত হয়েছিল। এ আলোড়নের

প্রয়োজন ছিলো, কারণ এতে বাঙালীর সত্যকার প্রাণবস্তুই জাগ্রত হয়ে উঠেছিলো। তাই মধুসূদন আধুনিক মহাকাব্য রচনায় আয়োজনের ত্রুটি রাখেননি। দৃঢ় ভাষা, ঘটনা, কাহিনী, হোমার-মিল্টনের ভঙ্গি, দান্তে-ভার্জিলের কল্পনা এবং সর্বোপরি বিদেশী কাব্যের প্রাণবস্তু, এমনকি বাক্য-ঝঙ্কার পর্যন্ত আত্মসাৎ করবার প্রতিভা সবই ছিলো। সমালোচকের ভাষায় 'কিন্তু কবি সত্যকার কবি বলিয়া, সৃষ্টি রহস্যের অমোঘ নিয়মের বশবর্তী হইয়া যাহা রচনা করিলেন তাহা মহাকাব্যের আকারে বাঙ্গালী জীবনের গীতিকাব্য।'[১৪] সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে ঊনবিংশ শতকের আধুনিকতায় বাইরে অনেক পরিবর্তন হলেও আভ্যন্তরীণ জীবনে নিছক দেশীয় ভাবধারা একেবারে অপসৃত হয়নি। আধুনিকতাব অগ্রদূত মধুসূদনের মেঘনাদ বধ কাব্যে, ব্রজাঙ্গনা গীতিকবিতায় ও চতুর্দশপদ গীতিকবিতায় তার পরিচয় আছে। পরবর্তীযুগে রবীন্দ্রনাথের মধ্য দিয়ে অত্যাধুনিক কবি ও ঔপন্যাসিক নাট্যকারদের মধ্য দিয়ে একটি দেশীয় লৌকিক ঐতিহ্যর ধারা প্রবাহিত হয়ে এসেছে এবং অজস্র লৌকিক উপাদান সংমিশ্রিত হয়ে রয়েছে, তার বহু নিদর্শন পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে উপস্থিত করা হয়েছে।

বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। জয়দেবের গীত-গোবিন্দ ও বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে কৃষ্ণলীলার আদিনাট্য রূপের সন্ধান পাওয়া যায়। এই কাব্যগুলির গান ও সংলাপ থেকে পরবর্তী কালের যাত্রা গানের যে প্রেরণা এসেছিলো তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ঝুমুর ও ধামালীগানেও লৌকিক নৃত্যগীতের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। পরবর্তী যুগের আধুনিক নাটকেও এই শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের গীতিবাহুল্য বা ধারা অনুসৃত হয়েছে। আধুনিক নাট্যকার মনোমোহন বসু থেকে শুরু করে গিরিশচন্দ্র পর্যন্ত নাটকে যে গীতিপ্রাধান্য তার পিছনে আছে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, বাঙলা কৃষ্ণযাত্রা ও পৌরাণিক যাত্রার প্রভাব। এ ছাড়াও আধুনিক নাট্যধারায় আছে লৌকিক নাট্যরীতি ঝুমুর, পাঁচালী, কবিগান, তরজা, যাত্রা প্রভৃতির অনুসরণ, ডঃ সুকুমার সেনের মতে: "মনোমোহন যখন নাটক রচনায় হাত দিলেন তখন স্বভাবতই পূর্বতন যাত্রা পাঁচালীর রীতি তাঁহার নাট্য রচনাকে প্রভাবিত করিল। প্রকৃতপক্ষে মনোমোহনের নাটকগুলি পূর্বেকার নাট্যগীতির সঙ্গে অধুনাতন সংস্কৃত-ইংরেজী পদ্ধতির নাটকের যোগধ্যাসন করিয়া বাংলা নাটকের মোড় ফিরাইয়া দিল। মনোমোহনের পৌরাণিক নাটকে পুরাতন যাত্রা পাঁচালীর কারুণ্য ও ভক্তি

ভাব নূতন করিয়া দেখা দিল। এই ভাব গিরিশচন্দ্রের নাটকগুলিতে বিকশিত ও পরিণত রূপ পাইয়াছে।"[১৬] বাংলা দেশের আধুনিক নাটকের ঐ লৌকিক ঐতিহ্য হচ্ছে যাত্রা পাঁচালী কবিগান তরজা ঝুমুর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন এ কথা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই যে আধুনিক নাট্যধারার সৃষ্টি হয়েছিল তাকে মোটামুটিভাবে গীতাভিনয় নাম দেওয়া যেতে পারে। নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসকারের মন্তব্য ; "ইহা প্রাচীন কৃষ্ণযাত্রা কিংবা নূতন যাত্রার অবশ্যম্ভাবী পরিণতিরূপে আবির্ভূত হইল না, বরং প্রাচীন যাত্রা ও নূতন যাত্রা উভয়েরই ভিত্তির উপর ইংরেজী আদর্শে রচিত বাংলা নাটকগুলির প্রত্যক্ষ প্রভাবের ফলে সৃষ্ট হইল।...ইহার সঙ্গে ভিতর ও বাহিরের দিক হইতে দেশীয় প্রাচীন ও নূতন যাত্রার যোগ ছিল বলিয়া ইহা এক দিক দিয়া দেশীয় রস—সংস্কারের অনুগামী হইয়াছিল। তেমনি অন্য দিক দিয়া যাঁহারা যুগ প্রভাব বশতঃ নূতন রসের অনুরাগী হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহাদের রস পিপাসা চরিতার্থ করিতেও সক্ষম হইয়া উঠিয়াছিল।'[১৭] আধুনিক নাট্য সাহিত্যের নাটকগুলির আঙ্গিক আলোচনা করলে দেখা যায় যে যাত্রা থেকে গীত ও ছড়া, পাঁচালী ও কবিগান থেকে কিছু কিছু সংলাপ পাশ্চাত্য নাটক থেকে নাটকীয়তা ও নাট্যগঠনরীতি এবং সংস্কৃত নাটক থেকে চরিত্র ও ভাষারীতি গ্রহণ করেই আধুনিক নাটকগুলি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। সুতরাং সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য নাট্যাদর্শের সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক নাট্যরীতির সংযোগেই আধুনিক নাট্য সাহিত্যের বিরাট ধারা তৈরী হয়েছিলো। এছাড়া আছে প্রবাদ প্রবচনের ও ছড়ার প্রাচুর্য। এ প্রসঙ্গে একটি বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "ভারতচন্দ্র রামপ্রসাদ ও রামেশ্বরের রস-রচনায় যে প্রবাদ-প্রবণতা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার জের—উনবিংশ শতাব্দীতেও চলিয়াছিল, কিন্তু আধুনিক বাংলা সাহিত্যে প্রবাদ প্রয়োগের সমধিক প্রাচুর্য, দেখিতে পাওয়া যায় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ পাদ পর্যন্ত। ভবানীচরণ, হুতোম ও টেকচাঁদ হইতে আরম্ভ করিয়া দাশু রায়, ঈশ্বর গুপ্ত ও দীনবন্ধু পর্যন্ত বাংলা ভাষায় যে বিচিত্র রস সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা প্রবাদ ও চলতি কথায় সরস খণ্ডগুলিকে বাংলা বাক্য-রীতির ও রসিকতার খাঁটি নিদর্শন হিসাবে সাদরে ও স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করিয়াছিল।"[১৮]

আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্যের পিছনে আছে রূপকথা, ব্রতকথা, গীতিকা ইত্যাদি লৌকিক কথা সাহিত্য ও লৌকিক অখ্যানকাব্যের ঐতিহ্য। উপন্যাসের ইতিহাসকারের ভাষায় : আমাদের লৌকিক গল্প ও রূপকথার মধ্যেও উপন্যাস

সাহিত্যের বিস্ময়কর পূর্বসূচনা পাওয়া যায়। বাস্তবিক, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে রূপকথাই উহার অবাস্তবতা সত্ত্বেও উপন্যাসের দিকে সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়াছে। অন্তত দুইটি দিক দিয়া উপন্যাসের সহিত ইহার সাদৃশ্য বেশ স্পষ্ট ভাবে অনুভব করা যায়। প্রথমতঃ উপন্যাসের মতই ইহার আখ্যানভাগ ইহার সর্বপ্রধান বিষয়বস্তু ও আকর্ষণ, ইহা একটি খাঁটি অবিমিশ্র গল্প···দ্বিতীয়তঃ উহার মধ্যে যথেষ্ট অলৌকিকতা থাকিলেও, উহার আকাশ বাতাসে মায়া-মোহ ইন্দ্রজালের একটি ঘনপ্রলেপ থাকা সত্ত্বেও, একটু সূক্ষ্ম ভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, লেখক ইহাতে মানুষের লৌকিক ও সামাজিক ব্যবহারেরই পরিমাণ দেখাইয়া তাহারই উপর নিজ সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সুতরাং মূলতঃ ঔপন্যাসিকদের যে উদ্দেশ্য, রূপকথার লেখকেরও অনেকটা তাহাই।'[১১] এছাড়া বাংলাদেশের গীতিকাগুলির প্রাকৃতিক পরিবেশ সৃষ্টিতে; চরিত্র নির্মাণে এমন বাস্তবতা বোধের পরিচয় আছে যাদ্বারা পরবর্তী যুগের কথাসাহিত্য বিশেষভাবে প্রভাবিত। বাংলাদেশে লোকবিশ্বাস, লোকগীতি, ছড়া প্রবাদ প্রবচন লোকউৎসব অনুষ্ঠানাদির বহু পরিচয় ও উপাদান ছড়িয়ে আছে—আধুনিক কথাসাহিত্যের অভ্যন্তরে। বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্সগুলির আড়ালে লৌকিক রূপকথার ঐতিহ্য, প্যারিচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহে প্রবাদ-প্রবচন ছড়ার অতিরিক্ত প্রাচুর্য,—শরৎচন্দ্র—তারাশঙ্কর—বিভূতিভূষণ—মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে লৌকিক সংস্কৃতির অজস্র উপাদানে ভরপুর।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে কোন লৌকিক ঐতিহ্যের মধ্য দিয়ে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের বিপুল সম্ভার তৈরী হয়েছে এবং কোন কোন লৌকিক উপাদান নিয়ে আধুনিক বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের দেহ গঠিত হয়েছে তার এক বিস্তৃত পরিচয় উপস্থিত হয়েছে। সেখানে একথা প্রমাণ করা হয়েছে যে আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যের রোমান্স অংশে রূপকথা, ইতিকথা, পুরাকথার অজস্র উপাদান গ্রহণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, ইত্যাদি রোমান্স রচয়িতাগণ। উদাহরণ হিসাবে বলা চলে লোককথা, বিশেষ করে রূপকথার দৈবনির্ভরতা বাংলা সাহিত্যের বহু রোমান্স ও উপন্যাসের আশ্রয় স্থল হয়েছে; বিমাতার অত্যাচার, সপত্নীবিদ্বেষ বহু উপন্যাসের বিষয়বস্তু রূপে চিহ্নিত হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে লৌকিক ঐতিহ্য

॥ এক ॥

মৌখিক ও লিখিত কথাসাহিত্য

পৃথিবীর নানা দেশে বহু প্রাচীন কাল থেকেই কথাসাহিত্য বর্তমান আছে। গল্প শোনার প্রবৃত্তি মানুষের আদিমতম প্রবৃত্তি। গুহাযুগে একদল মানুষ যখন শিকারে বেরুত এবং দীর্ঘদিন পরে শিকার শেষে ওই দল যখন গুহাতে ফিরত তখন সঙ্গে নিয়ে আসত অপেক্ষমান সাথীদের জন্য অনেক বিস্ময় ও অবাক করা কাহিনী। আগুন জ্বেলে তার চার পাশে বসে ঝলসানো মাংস খেতে খেতে শুরু করত তাদের নানা অভিজ্ঞতার কাহিনী, বিভিন্ন বিস্ময়কর ঘটনা, বিচিত্র অলৌকিক গল্পের। একজন বা একদল হয়ত বর্ণনা শুরু করত অর্থাৎ কথকের ভূমিকা নিত। অপরদল অবাক বিস্ময়ে সেই গল্প শুনে যেত। এই হচ্ছে গল্প উৎপত্তির ইতিকথা।

বলা চলে গল্প সৃষ্টির প্রাথমিক যুগ থেকেই গল্প প্রকাশের যে মাধ্যমটি সর্বাধিক জনপ্রিয় তা হচ্ছে মৌখিক ভাবেই কথা বা গল্পের সূচনা। আজও পর্যন্ত সেই কথা বা গল্পের মৌখিক ধারা বর্তমান। তারপর বহু যুগ অতিক্রান্ত হলে যখন গদ্য সাহিত্যের আবির্ভাব হলো, মানুষের জীবনযাত্রা অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়লো —তখন আর কেবল স্মৃতিতে গল্পকে ধরে রাখা সম্ভবপর হ'লনা, লিখিত কথা-সাহিত্যের আবির্ভাব দেখা দিল।

আজ পৃথিবীর সব দেশেই মৌখিক কথাসাহিত্যের পাশাপাশি লিখিত কথাসাহিত্যের ধারা বর্তমান। মৌখিক কথাসাহিত্যের মধ্যে যেমন রূপকথা, উপকথা ও ব্রতকথা ইত্যাদি বিভিন্ন ভাবে বিভক্ত, লিখিত কথাসাহিত্যেরও তাই বিভিন্ন ধারা, উপন্যাস, ছোটগল্প, বড়গল্প ইত্যাদি। মৌখিক কথার সঙ্গে লিখিত কথাসাহিত্যের পার্থক্য এই যে প্রথমতঃ মৌখিক কথাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই সংক্ষিপ্ত, কারণ সংক্ষিপ্ত না হলে স্মৃতির মধ্যে রাখা সম্ভবপর ছিল না। অবশ্য বড় বড় রূপকথা যে নাই তা নয়, তবে সেগুলি বিচার করলে দেখা যায় সেগুলি

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কতকগুলি গল্পের সমষ্টি মাত্র। অধিকাংশ রূপকথা, বা ব্রতকথাই তাই খুবই সংক্ষিপ্ত। একটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো স্পষ্ট হবে।

অভিশাপ

সাতভাই সদাগর আর এক বোন, সদাগররা বোনকে খুব ভালোবাসেন সাতভাই একদিন বাণিজ্যে গেল, যেতে যেতে পথে পড়লো এক ইন্দ্রপুরীর রাজ্য। ডাইনীরা সেইখানে সুন্দরী মেয়ে সেজে থাকে। সুন্দরী মেয়েদের দেখে সাত ভাই সাত কন্যাকে বিয়ে করে দেশে ফিরে এলো। বোন ত বৌদের বরণ করে তুললো, এদিকে বৌরা বোনকে দেখতে পারে না, তাকে সারাদিন খাটায়। দেখে শুনে সাত ভাই বোনের বিয়ে দিলো দুর দেশে। বোন কাঁদতে কাঁদতে শ্বশুর ঘর করতে গেলো। দিন যায়, মাস যায়, ভাইরা কাঁদে বোনের জন্য, কিন্তু দেখতে যেতে পারেনা। কারণ দিনের বেলা যে ডাইনীরা তাদের মাছ করে রাখে। একদিন তারা ভাবলো, আর তো বোনকে না দেখে থাকতে পারেনা। মাছের বেশ ধরেই যাই, নদী দিয়ে তারা যেতে লাগলো।

বোন নাইতে এসেছে নদীর ঘাটে, এমন সময় দেখে সাতটা মাছ তার চারপাশে ঘুরছে, বোন মাছগুলিকে চুপড়ি করে তুলে নিয়ে এল বাড়িতে, যেই কাটতে যাবে অমনি মাছগুলো বলে উঠলো, 'কেটোনা কেটোনা বোন, মোরা তোমার ভাই'। বোনের আর মাছ কাটা হলো না। সে সব কথা শুনলো, তারপর কাঁদতে কাঁদতে মাছগুলোকে চুপড়ি শুদ্ধই তুলে রাখলো।

এদিকে শাশুড়ীর খুব সন্দেহ হলো, বৌ মাছ কাটলো না কেন? বৌ পরদিন যেই ঘাটে গেছে, অমনি সে মাছগুলোকে কেটে রেঁধে ফেললো। এদিকে বৌ ঘাট থেকে ফিরে এসে সব শুনে কাঁদতে লাগলো। তারপর যেখানে আঁশ ফেলা হয়েছে, সেখানে ছুটে গেলো। গিয়ে দেখে সাতটা পদ্ম ফুটে আছে। বোন কাঁদতে লাগলো। এমন সময় এক সাধু সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। সে এক হাঁড়ি মন্ত্রপড়া জল বোনটিকে দিয়ে বললো, এক নিঃশ্বাসে এই জল তুমি সাতটা ফুলের গায়ে যদি ছিটিয়ে দিতে পারো, তাহলে তোমার ভাইরা আবার মানুষ হবে। বোন কিন্তু তা পারলোনা। তখন সাতটা ফুল সাতটা বিরাট বিরাট কুমীর হয়ে নদীতে চলে গেল, আর তাদের বোন কাঁদতে লাগলো।

উপরোক্ত লোককথাটিতে বধূদের নির্যাতন, শাশুড়ী-লাঞ্ছনা, দৈব প্রতিকূলতা ইত্যাদি বিভিন্ন অভিপ্রায় প্রকাশ পেলেও খুব সংক্ষিপ্ত ভাবেই গল্পটি উপস্থিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগে মানুষের জীবনযাত্রা ছিল অত্যন্ত সরল; আজকের জটিলতার যুগে লিখিত কথাসাহিত্য অত্যন্ত জটিল ও বহুমুখী হয়ে উঠেছে। কাহিনী বিচিত্র, চরিত্রের নানা সংঘাত ইত্যাদিতে আজকের লিখিত কথাসাহিত্য জটিলতায় ভরপুর।

তৃতীয়তঃ আধুনিক জীবনকে কেবলমাত্র বাহ্যিক দিক থেকে বিচার না করে, আভ্যন্তরীণ দিক থেকে বিচার বিশ্লেষণ করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে লিখিত কথাসাহিত্যে। ফলে মানব চরিত্রের বিভিন্ন দিক ও জীবনের নানা ঘটনাকে সুগভীর মনস্তাত্ত্বিক সূক্ষ্মতায় বিশ্লেষণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং লিখিত কথাসাহিত্যের দৈর্ঘ্য ও জটিলতা অতিরিক্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। লৌকিক কথাসাহিত্য মূলতঃ ঘটনা প্রধান, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ নাই বললেও চলে। সেখানে রূপক ইঙ্গিতের মাধ্যমে চরিত্র, ঘটনা ও পরিবেশকেরা হয়ে থাকে।

মৌখিক কথার সঙ্গে লিখিত কথাসাহিত্যের সাদৃশ্যও অনেক; মৌখিক কথাসাহিত্যের রূপকথার মধ্যে যেমন আছে রোমান্সের বীজ, তেমনি উপকথা ও ব্রতকথায় আছে উপন্যাসের বাস্তবধর্মিতা। যদিও উপকথা আকারের দিক দিয়ে ছোট গল্পেরই তুল্য, তথাপি বক্তব্য বিষয় এবং তার প্রকাশভঙ্গির মধ্যে ছোট গল্পের সঙ্গে তার পার্থক্য আছে। তবে বাস্তব জীবনদর্শনের মধ্যে উপন্যাস কিংবা ছোট গল্পের সঙ্গে উপকথার পার্থক্য নাই। পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক সভ্যদেশেই তা মৌখিক কথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। লোককথার ধারা অনুসরণ করেই আধুনিক কথাসাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। আধুনিক জীবনের বহুমুখী জটিলতা বৃদ্ধি পাবার সঙ্গে সঙ্গে লোককথারই একটি ধারা লিখিত-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সেই জটিল জীবনের বাস্তব পরিচয়কে রূপ দিতে গিয়ে আধুনিক কথাসাহিত্য উদ্ভূত হয়েছে, কিন্তু এর একটি ধারা নিরক্ষর সমাজের মধ্য দিয়ে এর বহির্মুখী পরিচয়কে অক্ষুন্ন রেখে চলেছে। উপন্যাস কিংবা ছোট গল্পের মধ্যে লোক-কথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি।

মৌখিক কথাসাহিত্যের একটি প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে বৈচিত্রের অভাব। কিন্তু লিখিত কথা সাহিত্যের বিষয়ের মধ্যে অন্তহীন বৈচিত্রের স্বাদ পাওয়া যায়। কতকগুলি সুনির্দিষ্ট মৌলিক বিষয়বস্তু বা "মোটিফ" অবলম্বন করে দেশ দেশান্তরে

একই প্রকৃতির লোককথা রচিত হয়। কিংবা দেশান্তর থেকে সংগৃহীত মৌখিক কথা অতি সহজে অপর দেশ কর্তৃক গৃহীত হয়। মৌখিক কথাসাহিত্যে জাতির নিজস্ব পরিচয়টি সর্বদা ফুটে ওঠে না। বাংলাদেশে শৃগাল সম্পর্কে যে সকল উপকথা প্রচলিত আছে সাঁওতাল পরগনা বা ছোটনাগপুরের আদিবাসীদের মধ্যেও একই উপকথা প্রচলিত আছে। কিন্তু লিখিত কথাসাহিত্যের মধ্যে বিশেষ কথাসাহিত্যিকের জীবনদর্শন ও তার পারিপার্শ্বিক সমাজ জীবনের বক্তব্য ও পরিচয়টি এত স্পষ্ট যে এগুলি একটি নির্দিষ্ট দেশ ও কালের সীমানার দ্বারা চিহ্নিত। সুতরাং বলা যায় মৌখিক কথার যে উদ্দেশ্য এবং যে রূপ আশ্রয় করে তার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে থাকে, তার সঙ্গে আধুনিক কথাসাহিত্যের যোগ ক্রমে অনেক গৌণ হয়ে পড়েছে। কিন্তু তথাপি একথা সত্য মৌখিক কথার মধ্যে চরিত্র এবং দেশকালের যে নির্বিশেষত্ব আছে সেইগুলিকেই আধুনিক ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠার যুগে সবিশেষ ক্ষেত্রে রূপায়িত করে নিয়েই আধুনিক উপন্যাসের সূচনা হয়েছে। লোককথার রাজপুত্রই আধুনিক কথাসাহিত্যের জগৎ সিংহ এবং লোককথার মধুমালাই তিলোত্তমা, শৈলেশ্বরের শিবমন্দিরে এক ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ রাত্রিতে বিদ্যুৎ আলোকের চকিত দর্শনের সঙ্গে পথ চিহ্নহীন দুর্গম অরণ্য মধ্যে রাজকন্যার সঙ্গে হঠাৎ দর্শনের কোন পার্থক্য নাই, যে সমস্ত পার্থক্যটুকু আছে তা কেবলমাত্র চিত্রগত, ভাবগত নয়। মৌখিক কথাসাহিত্যের মধ্যে সমাজ মানসে যে নির্বিশেষভাব চৈতন্যের উদয় হয়, তাকেই আধুনিক লিখিত কথাসাহিত্য সবিশেষ পাত্রে পরিবেষনের দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকে মাত্র।

॥ দুই ॥

রূপকথা ও উপন্যাস

রূপকথা পৃথিবীর আদি রোমান্স। আধুনিক উপন্যাসের মধ্যে যেমন রোমান্সের সর্বপ্রথম আবির্ভাব হয়েছে বলে অনুমান করা হয়, তেমনি মৌখিক কথাসাহিত্যেও পুরাকথা বা মিথের আবির্ভাব সর্বপ্রথম হয়েছে বলে সমাজতত্ত্ব-বিদগণ অনুমান করেন। পুরাকথার কাহিনীতে বাস্তবতার পরিবর্তে অলৌকিতার পরিমাণ বেশী। কিন্তু লোককথার তিনটি ধারা রূপকথা, উপকথা ও ব্রতকথার মধ্যে বাস্তব জীবনের ইঙ্গিত অত্যন্ত স্পষ্ট বলে এগুলির মধ্যে আধুনিক কথা-সাহিত্যের আবির্ভাবের, বীজ নিহিত আছে বলে কল্পনা করা হয়। লোকসাহিত্যে গীতিকা রূপকথা, উপকথা ও ব্রতকথাই কাহিনীমূলক। গীতিকায় পদ্যের

মধ্যে যা বলা হয়ে থাকে, গদ্যে যখন কোন কাহিনী উপস্থিত করা হয় তখন তাকে সাধারণভাবে লোককথা বলা হয়ে থাকে। সাধারণভাবে বাংলা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্যগুলিকে যেমন কাহিনীকাব্য হিসাবে কথাসাহিত্যের অগ্রদূত বলা হয়ে থাকে। গীতিকাও সেরকম লোকসাহিত্য ধারার কথাপর্বের অগ্রদূত।

লোকশ্রুতি মূলক বিষয়বস্তু ও কাহিনীই লোককথার উপজীব্য। আধুনিক কথাসাহিত্যে গল্প রচনার কৃতিত্ব লেখকের। উপন্যাস বা ছোট গল্পগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখকের মৌলিক রচনা, নিজস্ব সৃষ্টি। কিন্তু রূপকথা উপকথা ব্রতকথা একটি মৌখিক জনশ্রুতিমূলক কাহিনীকে অনুসরণ করে সমাজের মধ্যে প্রবাহিত। আপাতদৃষ্টিতে অবাস্তব উপকরণ বাহুল্য মনে হলেও এর একটি সর্বজনীন আবেদন আছে, যার বলে এগুলি কালজয়ী হয়ে অমরত্ব লাভ করে। কোন কোন লোককথা অতিরিক্ত রোমান্সধর্মী, কল্পনার স্বপ্নরাজ্যে এর স্বাধীন বিহার। বাংলায় একে রূপকথা বলা হয়। আবার কোন কোন লোককথায় কল্পনার উদ্দামতা ও বিস্তৃতির অভাব পড়লেই মনে হয় সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা নৈরাশ্যের কাহিনীই এতে প্রকাশ পায়। এ হিসেবে এগুলি আধুনিক কথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। আলিবাবা ও চল্লিশ চোরের কাহিনীটি এর দৃষ্টান্ত।

কতকগুলি লোককথার ভিতর দিয়ে জীবনের ছোট ছোট অসঙ্গতি ও দোষ-ত্রুটি কৌতুকের স্পর্শ লাভ করে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। পশুপক্ষীর চরিত্রের মাধ্যমে একটি মানবিক দুর্বলতা ব্যক্ত হয়ে থাকে। তথাপি এর মধ্য দিয়ে একটি স্বাদু কৌতুক রস প্রবাহিত হয়ে সমাজের চিত্তাকর্ষণ করে থাকে।

রূপকথার পরিবেশ অবাস্তব, স্বপ্নিল ও কল্পনাপ্রধান। অসম্ভব, অবাস্তব ও রোমাঞ্চকর ঘটনার দ্বারা রূপকথা পরিপূর্ণ। এর নায়ক সাধারণতঃ অপরিচিত দেশের এক রাজপুত্র, এক অচেনা রাজ্যে প্রবেশ করে কতকগুলি অসম্ভব বিপদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে পরিণামে সেই দেশের রাজকন্যাকে বিবাহ ও সিংহাসন অধিকার করে। সংক্ষিপ্ত ভাবে রূপকথার আদর্শটি এই : কোন অপুত্রক রাজা দৈবে একপুত্র লাভ করবেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেই রাজপুত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোট রাজপুত্র, ভাগ্যের অন্বেষণে দেশান্তরে নিরুদ্দেশ যাত্রা করবে, এই অভিযানটি হবে তার দুঃসাহসিক অভিযান। বহু বাধা, বিপত্তি উত্থান ও পতনের পর এমন এক রাজ্যে উপস্থিত হবে যে রাজ্যটি হয় মৃত বা ঘুমন্ত শহর, যাদু প্রভাবে সমগ্র রাজ্যটি যাদুময় হবে। তারপর যাদুকরকে বুদ্ধি বা কৌশলের দ্বারা পরাস্ত করে সোনার কাঠির ছোঁয়ায় রাজকন্যার ঘুম ভাঙিয়ে সমস্ত মায়াজাল থেকে

রাজ্যটিকে মুক্ত করে উক্ত রাজ্যেই এক রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব লাভ করে সে সুখে বসবাস করবে।

রূপকথার কাঠামো বিশ্লেষণ করে গভীর ভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে রূপকথার কাঠামোর মধ্যে আধুনিক কথাসাহিত্যের রোমান্সের বীজ নিহিত আছে। রাজপুত্রের বা নায়কের অনির্দেশ্য পথে যাত্রা, দুঃসাহসিক অভিযান, বহু বিপদ বাধা অতিক্রম এবং প্রেমই রূপকথার উপজীব্য। এই গুণগুলির সঙ্গে আধুনিক কথাসাহিত্যে সাদৃশ্য লক্ষণীয়। আধুনিক রোমান্স ও উপন্যাসের মধ্যেও আছে নায়কের অনির্দেশ যাত্রা। জগৎ সিংহের, নবকুমারের, প্রতাপের কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে এই দুঃসাহসিকতা, অসম্ভব বিপদের সম্মুখীন হওয়া বাধা বিপদকে অগ্রাহ্য করার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যাবে। রূপকথায় রাক্ষস-রাক্ষসী, যাদুকর প্রভৃতি এ যুগের বিপদ বাধার প্রতীক। আর শ্রীকান্তের অনির্দেশ যাত্রা সে তো রূপকথার রাজপুত্রের মতই রাজার বৈভব আরাম পরিত্যাগ করে উদ্দেশ্য হীন ভাবে জীবন সন্ধানে বেরিয়ে পড়া, তাই অলৌকিকতার মাধ্যমে রূপকথার বিষয়বস্তুকে উপস্থিত করা হলেও এর প্রেরণা কিন্তু লৌকিক, তাই রূপকের আবরণটি অপসরণ করলেই রূপকথার মধ্যে জীবনের রূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

রূপকথায় দুটি দিক লক্ষ্য করা যায়। একটি মানবিক, অন্যটি অতিমানবিক অর্থাৎ বাস্তব ও অবাস্তব। একটি আর একটিকে অতিক্রম করতে পারেনা বলেই রূপকথার সাহিত্যগুণ যথার্থ ভাবে রক্ষা পায়। রাজার পুত্র লাভের আকাঙ্ক্ষা, বড় রানীর কনিষ্ঠা রানীর প্রতি ঈর্ষা, দৈব উপায়ে পুত্র লাভ, বিকলাঙ্গ পুত্রের অতি-মানবিক ক্ষমতা, ছোট রাজপুত্রের অনন্য সাধারণ ক্ষমতার অধিকারী হওয়া ইত্যাদি অভিপ্রায়গুলি আলোচনা করলে দেখা যাবে রূপকথায় বাস্তব ও অবাস্তবতা পাশাপাশি অবস্থান করে। অলৌকিক উপায়ে পুত্র লাভ করা সম্ভব বা দৈব উপায়ে পুত্র লাভ (Super natural birth Motif)—রূপকথায় এই বহু পরিচিত অভিপ্রায়টি অলৌকিক মনে হলেও আজও সমাজের বিভিন্ন স্তরে সন্তান লাভ যে কেবল জৈব কারণে সম্ভবপর নয়, পিছনে দৈব সহায় থাকা দরকার এ বিশ্বাস প্রচলিত আছে। রূপকথায় আছে "বোঁটা শুদ্ধ ফল" বা সোনার পাখীর মাংস খেয়ে, কিংবা দুধ সরোবরে স্নান করে রানী অন্তঃসত্ত্বা হয়। আধুনিক কথাসাহিত্যেও এই লৌকিক বিশ্বাসের প্রতিফলন আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসে স্বামীকে বশীকরণ করবার জন্য কপালকুণ্ডলা ঔষধ

সন্ধান করেছিল। যথা: "নবকুমার কহিলেন, "কোথা যাইতেছ" ? নবকুমারের স্বরে তিরস্কারের সূচনা মাত্র ছিল না।

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, "শ্যামা সুন্দরী স্বামীকে বশ করিবার জন্য ঔষধ চাহে, আমি ঔষধের সন্ধানে যাইতেছি"। [চতুর্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ]

তারাশঙ্করের 'গণদেবতা' উপন্যাসে অনিরুদ্ধ-পদ্মের নিঃসন্তান জীবনে সন্তান আবির্ভাবের জন্য ঠাকুরের দোর ধরা থেকে শুরু করে ভূতের কাছে দরবার পর্যন্ত হয়েছে। জগন ডাক্তার বলেছিলো, সাপের স্বপ্ন দেখলে কি হয় জানিসতো ? বংশবৃদ্ধি, ছেলে হয়, তোদের কপালে ছেলে নাই, কিন্তু ছিরে নিজে যখন সাপ ছেড়েছে, তখন ওই বেটার ছেলে মরে—তোর ঘরে এসে জন্মাবে। [পৃঃ ১৩৭]

সুতরাং বলা যেতে পারে রূপকথার বহু অভিপ্রায়ই দৈব সহায়ে সন্তানলাভ বিশ্বাসের মত আধুনিক সমাজ জীবনে স্তরে স্তরে সঞ্চিত আছে এবং সেগুলিকে কেন্দ্র করে আধুনিক কথাসাহিত্যের নানা বস্তু রচিত হচ্ছে।

রূপকথায় দেখা যায় কনিষ্ঠা রানী সাধারণতঃ তার বয়োঃগত তারুণ্যের জন্যে অন্যান্য রানীদিগের ঈর্ষার কারণ হয়। রাজার তার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকার জন্য অন্যান্য রানীরা রাজার চক্ষে তাকে পদে পদে হেয় করবার চেষ্টা করে, এই কনিষ্ঠা রানীর প্রতি অন্যান্য রানীদের ঈর্ষার অভিপ্রায়টি কেবল রোমান্সের বিষয় নয়, উপন্যাসেরও বিষয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে সপত্নী বিদ্বেষের জন্য নায়িকা প্রফুল্লকে কিভাবে বিপর্যস্ত হতে হয়েছে এবং পরিশেষে কি ভাবে সৌভাগ্যের চরম শিখরে উঠেছে তা বিশ্লেষণ করলে রূপকথার প্রভাব আধুনিক উপন্যাসের উপর যে কতখানি তার পরিচয় মেলে।

আধুনিক রোমান্স বা উপন্যাসের চরিত্রগুলির বিশেষ করে নায়ক-নায়িকার একটি বিশেষ নাম থাকে। রূপকথার চরিত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নামহীন, কোন কোন ক্ষেত্রে মধুমতী বা কাঞ্চনমালা (কুমারের) ইত্যাদি নাম থাকলেও রাজা রানী, রাজপুত্র, মন্ত্রীপুত্র, কোটালপুত্র, এক ব্রাহ্মণ, এক সদাগর, প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্তি চিহ্নিত করা হয়। রূপকথার স্থান ও পরিবেশের কোন নাম বা সীমানা সাধারণতঃ থাকেনা। 'এক যে ছিল রাজা' বা এক রাজার রাজ্যে বাস করত এক সদাগর'—এরকম আরম্ভ দেখা যায় রূপকথায়। কিন্তু উপন্যাসে নাম ও ধামের নির্দিষ্ট পরিচয় দিয়েই গল্প শুরু হয়, যেমন—'হরিদ্রা গ্রামে একঘর বড় জমিদার ছিলেন, জমিদারের নাম কৃষ্ণকান্ত রায়'। আর রূপকথায়

তেপান্তরের মাঠ, সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার, ক্ষীর সমুদ্র—এ সমস্তই অনির্দিষ্ট।

নিয়তির প্রতি বিশ্বাস ভারতবাসীর মজ্জাগত। সেজন্য এদেশের লোক-সাহিত্যেও এর প্রভাব অত্যন্ত গভীর ও ব্যাপক। বাংলাদেশের রূপকথার নিয়তিবাদের সঙ্গে গ্রীক সাহিত্যের নিয়তিবাদের কোন পার্থক্য নাই। নিয়তি 'বিধাতা পুরুষের' এর রূপ ধারণ করে। শিশুর জন্মের ষষ্ঠ দিবসে নিশীথে সূতিকাগৃহে এসে উপস্থিত হয়, তারপর স্তিমিত আলোকে অদৃশ্য অক্ষরে শিশুর ললাটে তার ভাগ্যলিপি লিখে যান। তিনি অদৃশ্য বলেই অ-দৃষ্ট। সঙ্গোপনেই তাঁর যাতায়াত। কিন্তু যদি কারও এ বিষয়ে কোন ঐন্দ্রজালিক শক্তি থাকে, তবে তিনি তার আগমন ও নির্গমন অনুভব করতে পারেন, তাঁর পথরোধ করে শিশুর ভাগ্যে কি নির্ধারণ করে গেছেন, তাও জেনে নিতে পারেন, কিন্তু তিনি যা লিখে রাখেন তা অমোঘ, তা যতই কঠিন হোক, তার তিলমাত্র ব্যতিক্রম হবার উপায় নাই। এই ভাগ্য বিধাতার নির্দেশেই যে দাসী সে রানী হয়, যে রানী সে দাসী হয়ে তারই পদসেবা করে, ভরা সমুদ্রে নৌকা চড়ায় আটকে যায়। এগুলি কেবল বহিরঙ্গগত অলঙ্কার নয়, এগুলি কাহিনীর ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে, এর দ্বারা জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত হয় বলে সাধারণ সমাজ বিশ্বাস করে থাকে। আর সমাজের বিশ্বাস ও সংস্কারের সঙ্গে গভীরভাবে যোগরক্ষা করে রূপকথা রচিত হয় বলে আধুনিক কথাসাহিত্যের যে উদ্দেশ্য ও প্রেরণা তার মধ্যেও তা পাওয়া যায়। একটি রূপকথার কাহিনীকে বিশ্লেষণ করলে উপন্যাস ও রোমান্সের সঙ্গে রূপকথার সম্পর্কটি আরো স্পষ্ট হবে। রূপকথাটির নাম কিরণমালা।

'এক রাজা মন্ত্রীর পরামর্শে মৃগয়ায় বেরিয়েছেন। দিনে মৃগয়া করেন, রাত্রে গোপনে প্রজার সুখদুঃখের সংবাদ সংগ্রহ করেন। একদিন এক গৃহস্থের বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে রাজা শুনলেন, গৃহস্থের তিন মেয়েতে কথাবার্তা হচ্ছে। বড় মেয়ে বললো যদি রাজবাড়ির ঘেসোড়ার সঙ্গে বিয়ে হয়, তাহলে মনের সুখে কলাই ভাজা খাই'। মেজ বোন বলল, যদি রাজবাড়ির পাচকের সঙ্গে বিয়ে হয়, তবে আমি রাজভোগ খেতে পাই। ছোট বোন বলল, আমার যদি রাজার সঙ্গে দিয়ে হত, তবে আমি রানী হতাম। পরদিন রাজার পাইক এসে তিন বোনকে তুলে পাল্কী চড়িয়ে রাজদরবারে নিয়ে গেল। রাজা বড় বোনের সঙ্গে ঘেসেড়ার, মেজোর সঙ্গে পাচকের বিবাহ দিলেন এবং ছোটকে নিজের রানী করলেন।

কয়েক বছর পর রানীর ছেলে হবে। রানী রাজাকে বললেন আমার মায়ের পেটের বোনদের আনিয়ে দিলে তারা আঁতুর ঘরে যেত। রাজা তাই করলেন। বড় বোন, মেজ বোন রাজবাড়িতে এল। ছোট বোনের রানীর ঐশ্বর্য দেখে তারা হিংসায় জ্বলে উঠলো। তিন প্রহর রাত্রে রানীর ছেলে হল। ছেলে যেন চাঁদের পুতুল। রানীর বোনেরা কাঁচা মাটির ভাঁড়ে ছেলেকে পুরে নদীর জলে ভাসিয়ে দিল। আর রাজাকে বললো, রানীর এক কুকুর ছানা হয়েছে। পর বছর রানীর আবার ছেলে হল। হিংসুটে বোনেরা এবারও ছেলেকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিল এবং রাজাকে বললো, রানীর এক বিড়ালের ছানা হয়েছে। পরের বছর রানীর এক টুলটুলে মেয়ে হল। মেয়েটিকে নদীর জলে ভাসিয়ে দিয়ে বোনেরা বললো, এক কাঠের পুতুল হয়েছে। রাজ্য জুড়ে রানীর অখ্যাতি রটলো। এ রানী অলক্ষুণে, মানুষ নয়; পেত্নি কিংবা ডাকিনী। রাজা রানীকে ত্যাগ করলেন। রাজ্যের লোকেরা তার মাথা মুড়িয়ে দেশের বাইরে বার করে দিল।

ওদিকে এক নিঃসন্তান ব্রাহ্মণ নদীতে স্নান করতে গিয়ে মাটির ভাঁড়ে শিশুর কান্না শুনতে পেল। ব্রাহ্মণ ভাঁড় ধরে দেবশিশু ঘরে নিয়ে এল। পরের বছর আবার এক দেবশিশু, তিন বছরের বছর আর এক দেবকন্যা ঘরে এল। ব্রাহ্মণ আনন্দে দুপুত্র, এককন্যা নিয়ে পরম সুখে ঘর সংসার করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ ছেলেমেয়েদের নাম রাখলেন অরুণ, বরুণ ও কিরণমালা। তিন ভাইবোন চাঁদের মত বাড়ে, ফুলের মত দোলে। ব্রাহ্মণের সংসার যেন আনন্দের হাট। তিন ভাইবোনকে বড় করে ব্রাহ্মণ স্বর্গে গেলেন। এদিকে রাজার সংসারে সুখ নাই। মনের দুঃখে রাজা আবার মৃগয়ায় বেরিয়ে পথে ঝড়ে, তুফানে, বৃষ্টি বাদলে, ক্ষুধায় তৃষ্ণায় আকুল। রাজা ব্রাহ্মণের কুটির দ্বারে দাড়িয়ে বললেন, কে আছ একটু জল দিয়ে বাঁচাও। ভাইবোনে ছুটে জল এনে দিল। নির্জন দেশে এমন সোনার চাঁদ ছেলেমেয়ে দেখে দুঃখী রাজার চোখে জল পড়ে।

কিরণমালা একদিন ভাইদের কাছে আব্দার ধরলো, রাজারবাড়ির ন্যায় অট্টালিকা বানাও। অরুণ বরুণ কিরণমালা মিলে এক অপূর্ব অট্টালিকা তৈরী করলো। একদিন এক সন্ন্যাসী বললেন, উত্তর পূর্ব, পূর্বের উত্তরে মায়া পাহাড় আছে। সেই পাহাড়ে হীরার গাছে সোনার ফল ফলে, সোনার পাখী ডাকে, যে এসব আনতে পারবে, সেই বীর। অরুণ তা আনবার জন্য যাত্রা করলো। কিন্তু মায়া পাহাড়ের দেশে অপ্সরীর মায়ায় পড়ে আর ফিরলোনা, পাথর হয়ে গেল। বরুণ-এরও সেই দশা হলো। এবার কিরণমালা যাত্রা করলো। যেই

কিরণমালা পাহাড়ে উঠলো, অমনি চারদিক থেকে দৈত্য দানব, বাঘ, ভাল্লুক, ভূত, পেত্নী, হাতী, ঘোড়া সাপ এসে পথ ঘিরে ধরলো। এর পর উঠলো ঝড় তুফান মেঘের গর্জন। বজ্রধারায় বৃষ্টি নামলো। কিরণমালার কোন দিকে খেয়াল নাই। তার পায়ের তলায় পাহাড় টলে গেল, পাথর গলে গেলো, কিরণমালা তরতর সরসর করে সোনার ফল হীরার গাছের তলায় হাজির হল। অমনি হীরার গাছে সোনার পাখী বলল, এসেছো ভালই হয়েছে তীর ধনুক নাও, ঝরনার জল, ফুল নাও, আমাকে নাও, তারপর ডঙ্কায় ঘা দাও। সব নিয়ে কিরণমালা পাহাড়ের গায়ে সোনার ঝারির জল ছিটিয়ে দিল। চক্ষের পলকে সকল পাথর লক্ষ লক্ষ রাজপুত্র হয়ে গেল। তারা হাত জোড় করে বলল, সাত যুগের ধন্য বীর, অরুণ বরুণ বললো, মায়ের পেটের ধন্য বোন। তিন ভাইবোন বাড়ি ফিরে এসে বাগানে হীরার গাছ পুঁতলো, আর সোনার পাখীকে বললো, এখানে বস, তিন ভাইবোনের ঐশ্বর্য দিনে দিনে বাড়তে লাগলো। ক্রমে সব খবর রাজার কানে গেল। সোনার পাখীর নির্দেশে একদিন তিন ভাইবোন রাজাকে নিমন্ত্রণ করলো। রাজা পুরী দেখে, পুরীর ঐশ্বর্য দেখে অবাক। এযে ইন্দ্রপুরীকেও হার মানায়।

রাজা খেতে বসেছেন। থালায় বাটীতে, রেকাবে থরে থরে সাজানো কত খাবার, গন্ধে ঘর ভরপুর। রাজা খাবারে হাত দিয়েই বললেন, এসব কি মানুষে খায়? উত্তর শুনলেন, মানুষের কি কুকুর ছানা হয়? কে এই কথা বলছে? রাজা দেখলেন মাথার উপর সোনার পাখি। পাখী বললো রাজা মশাই, মানুষের পেটে কি কাঠের পুতুল হয়? রাজা সব বুঝতে পারলেন। সোনার পাখী আবার বললো, রাজা মশাই এরাই আপনার পুত্র কন্যা। রাজা অরুণ বরুণ কিরণমালাকে বুকে টেনে নিলেন। সোনার পাখীর নির্দেশে নদীর ওপারের কুঁড়ে ঘর থেকে তাদের দুঃখিনী মাকে নিয়ে আসা হল। আবার রাজ্যে আনন্দের হাট বসলো।

উপরোক্ত কিরণমালা রূপকথাটির অভিপ্রায়গুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রথমতঃ পরিত্যক্ত শিশু-এর প্রধান অভিপ্রায় বা ঘটনা যা গল্পের মূল রসটিকে ধরে রেখেছে। আধুনিক কথাসাহিত্য পরিত্যক্ত শিশুর কাহিনীকে কেন্দ্র করে বহুঘাত প্রতিঘাত মূলক উপন্যাস বা গল্প লেখা হয়েছে। এমন ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ সুযোগও ভাগ্য অভিপ্রায়। তিন ভাইবোন এবং তাদের নিজস্ব আশা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে তিনজনের তিন রকমের ভাগ্য

পরিবর্তন ঘটেছে, একজন তার আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী ঘেসেড়ার বউ হয়েছে, অন্যজন রাজবাড়ির পাচকের স্ত্রী, ছোটবোন একেবারে দরিদ্র কন্যা থেকে রানীর পর্যায়ে উঠেছে। ভাগ্যের এই পরিবর্তন এবং সুযোগ লাভ আধুনিক উপন্যাসেও লক্ষ্য করা যায়। দরিদ্রের ঘরের বহু কন্যা রূপ ও গুণের বলেও ভাগ্যের জোরে একজন বড়লোকের গৃহিণী হয়। অন্যেরা হয়তো দরিদ্র স্বামীর গৃহে কষ্টে দিন কাটায়। তৃতীয়তঃ ভগিনীদের হিংসা রূপকথার একটি সুপরিচিত অভিপ্রায় এখানেও উপস্থিত। আমাদের সমাজজীবনে এরূপ হিংসা প্রবৃত্তি মানুষকে কত নীচে নামায় তার দৃষ্টান্ত যত্র তত্র পাওয়া যায়। এবং সেই দৃষ্টান্ত অবলম্বন করে বহু উপন্যাস রচিত হয়েছে আমাদের দেশে। চতুর্থতঃ—ভাগ্য বিপর্যয় অভিপ্রায়, বোনেদের হিংসা ও চাতুরীতে রানীর জীবনে বিপর্যয় এসছে, বহু দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। আধুনিক কথাসাহিত্যের মধ্যে ভাগ্য বিপর্যয়ের বহু কাহিনী বিবৃত আছে। এখানেই রূপকথার সঙ্গে রোমান্স ও উপন্যাসের সাদৃশ্য।

পরিসমাপ্তিতে একটি মন্তব্য উপস্থিত করে রূপকথার সঙ্গে কথাসাহিত্যের সম্পর্কের আলোচনা শেষ করা যেতে পারে, মন্তব্যটি এই :

"আমাদের লৌকিক গল্প ও রূপকথায় উপন্যাস সাহিত্যের বিস্ময়কর পূর্বসূচনা পাওয়া যায়। বাস্তবিক, প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে রূপকথাই উহার অবাস্তবতা সত্বেও উপন্যাসের দিকে সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর হইয়াছে। অন্ততঃ দুইটি দিক্ দিয়া উপন্যাসের সহিত ইহার সাদৃশ্য বেশ স্পষ্ট ভাবে অনুভব করা যায়।

প্রথমতঃ উপন্যাসের মতই ইহার আখ্যান ভাগ ইহার সর্বপ্রধান বিষয় বস্তু ও আকর্ষণ। ইহা একটি খাঁটি, অবিমিশ্র গল্প ধর্মকাব্যের মত ইহার গল্পাংশটি শুধু কোন ধর্মতত্ত্ব প্রমাণ বা দেবতার মাহাত্মকীর্তনের উপায় মাত্র নহে।

দ্বিতীয়তঃ, উহার মধ্যে যথেষ্ট অলৌকিকতা থাকিলেও, উহার আকাশে বাতাসে মায়া মোহ ইন্দ্রজালের একটি ঘনপ্রলেপ থাকা সত্বেও, একটু সুক্ষ্মভাবে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে লেখক ইহাতে মানুষের লৌকিক ও সামাজিক হারেই পরিণাম দেখাইয়া, তাহারই উপর নিজের সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সুতরাং মূলতঃ উপন্যাসিকেরও যে উদ্দেশ্য, রূপকথার লেখকেরও অনেকটা তাহাই, এবং ধর্মকাব্যের অপেক্ষা রূপকথায় এই উদ্দেশ্য আরও প্রত্যক্ষ ভাবে, সরল ও প্রবলভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন। ধর্মের কুহেলিকার মধ্যে ইহাকে ম্লান হইতে দেন নাই। মোট কথা ধর্মকাব্যের সহিত তুলনায় রূপকথা ধর্মের

অনধিকার প্রবেশ হইতে অধিকতর মুক্ত সেইজন্য খাঁটি আখ্যায়িকার গুণ সমুহ ইহার মধ্যে প্রকটতর হইয়াছে। এই সমস্ত দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে উপন্যাসের সহিত ইহার নিকট সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না।[১]"

ধর্মীয় আখ্যায়িকায় দেবদেবীর প্রাধান্য প্রকট, তাঁদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যে মানুষের কর্মস্বীকার, জীবনদান, পুনর্জীবনলাভ ও নানা অলৌকিক ঘটনা সন্নিবেশিত হয়েছে। রূপকথায় মানুষই উপজীব্য, মানুষের সুখদুঃখ আশা নিরাশা আনন্দবেদনা রূপকথার বিষয়। উপন্যাসেও তাই। পার্থক্য অলৌকিকতা ও ঘটনার সম্ভাব্যতায়। কিন্তু উপন্যাস যেখানে ঘটনাবিস্তারে আলৌকিকতাকে আশ্রয় করেছে সে অনেক ক্ষেত্রে লোকঐতিহ্যের সাহায্য নিয়েছে। এটাই সাদৃশ্য।

॥ তিন ॥

উপকথা ও উপন্যাস

পশুপক্ষীর চরিত্র অবলম্বন করে যে সকল কাহিনী রচিত হয়ে থাকে বাংলার 'লোকসাহিত্যে, তাই উপকথা নামে প্রচলিত, উপকথা রূপকথার সঙ্গে তুলনায় অধিক বাস্তব। রূপকথার অলৌকিকতা বা রহস্যময়তা উপকথায় প্রায়শই অনুপস্থিত। উপকথায় সাধারণ ভাবে মনুষ্যজীবনের অসঙ্গতি, নানা সুখদুঃখের কাহিনী, দুর্বলতা ও বোকামির পরিচয় পশুপক্ষীর রূপকে উপস্থিত হয়। পশুপক্ষী এখানে উপলক্ষ, আসল লক্ষ্য মানবজীবনকে রূপায়িত করা। এজন্য কথা-সাহিত্যের সঙ্গে উপকথার সম্পর্ক অধিক বলে মনে হয়। এই শ্রেণীর কাহিনীর উদ্দেশ্য প্রধানতঃ দুটি—প্রথমত: কৌতুক—সৃষ্টি, দ্বিতীয়তঃ নীতি প্রচার। এছাড়াও উপকথার মুল উদ্দেশ্য মনে হয় অন্য, তা হচ্ছে পশুপক্ষীর রূপকে জীবনের কাহিনীকে, মানুষের বিচিত্র বৈশিষ্ট্য সকলকে প্রকাশিত করা। উপন্যাসেরও মুল বক্তব্য জীবনকে বাস্তবভাবে রূপায়িত করা। কয়েকটি উপকথা উপস্থিত করলে আধুনিক কথাসাহিত্যে উপন্যাস গল্প ইত্যাদির সঙ্গে উপকথার সাদৃশ্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

---

১ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা / ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ৫ম সং। পৃঃ ১২

বোকা জামাই ও শাশুড়ীর লাঞ্ছনা

এক গ্রামে এক দরিদ্র চাষী বৌ ও তার পুত্র বাস করতো। পুত্রটি ছিল অতন্ত বোকা, সামাজিক আচার আচরণ কিছুই জানতো না। ভালো করে বসা বা গুছিয়ে কাপড় চোপড় পরাও সে জানত না। কিন্তু এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও সে পার হয়ে গেল বিয়ের বাজারে। এক কৃষক কন্যার সঙ্গে বোকা চাষীর বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর জামাই এর নিমন্ত্রণ হল শ্বশুর বাড়িতে। অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন শ্বশুরের বাড়ি যাবার পূর্বে তার মা বোকা ছেলেকে নানা উপদেশ দিতে লাগলেন। আর বিশেষ করে শিখিয়ে দিল শ্বশুর বাড়িতে যখন খেতে দেবে তখন যেন সে আসন পিঁড়ি হয়ে পা মুড়ে বসে এবং ভুলেও যেন উবু হয়ে না বসে, ওটা শিষ্টাচার নয়। বোকা চাষা বাবু সেজে গেল শ্বশুরবাড়ি, আসবার সময় মা বলেছিলো সকলকে প্রণাম করতে। কাজেই সে একধার থেকে সকলকে প্রণাম করল, এমনকি নিজের অবগুণ্ঠনবতী স্ত্রীকে পর্যন্ত। যাইহোক যথাসময়ে আহারের ডাক পড়লো। বহু যত্ন করে মধ্যবিত্ত চাষী শ্বশুর জামাইকে একখানা বড় পিঁড়ি দিল বসবার জন্য। বোকা জামাই বহু চেষ্টা করে তার উপর পা মুড়ে বসল। অনভ্যস্ত অবাধ্য পা দুটি বার বার তার বিরুদ্ধাচরণ করে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছিল। অবশেষে যখন শাশুড়ী ঠাকুরণ বড় জামবাটী করে একটি বড় রুই মাছের মাথা দিয়ে মাছের ঝোল নিয়ে তার পাতের কাছে এলেন। তখন মৎস্য দর্শনে অন্যমনস্ক বোকা জামাই এর অবাধ্য পা সজোরে গিয়ে লাগলো অবনত শাশুড়ীব মুখে এবং মাছের বাটী ছিটকে স্থান লাভ করলো উঠানে, ভাত তরকারী ছত্রাকার হয়ে গেল। শ্বশুর ভীষণ রেগে গেল এই ভেবে যে এত যত্ন করা সত্ত্বেও জামাই কিনা লাথি মারল শাশুড়ীর মুখে। তারপর যা হওয়া স্বাভাবিক তাই-হল। অর্ধচন্দ্র দিয়ে জামাইকে বিদায় করা হল।

কাঁদতে কাঁদতে বোকা চাষীর ছেলে ফিরে এলো তার মায়ের কাছে. মা সব শুনে বহু কষ্টে আবার সব মিটমাট করে দিলেন [২৪ পরগনা থেকে ১৯৬৬ সালে সংগৃহীত]

উপরোক্ত উপকথাটিতে বোকা জামাই-এর যে বোকামীর পরিচয় এবং তজ্জনিত শাশুড়ীর লাঞ্ছনার কাহিনীর বিবৃত হয়েছে সেটি সাধারণভাবে বাংলা-দেশের বহু উপকথায়রই অভিপ্রায়। আধুনিক কথাসাহিত্যের বহু উপন্যাসে জামাই এর বোকামি ও শাশুড়ীর লাঞ্ছনার কাহিনী শুনা যায়, আসলে উপকথার মধ্যে সব কিছুই কিছুটা তির্যক ভাবে, বিপরীত অর্থে একটি বক্তব্যকে

উপস্থিত করা হয়। বাংলাদেশের জামাই-এর দল শ্বশুরবাড়ির কাছে প্রায়শই বিভীষিকা তুল্য। আর শাশুড়ির দ্বারা বধূ নির্যাতন বাংলাদেশের একটি সাধারণ ব্যাপার। উপকথার মধ্যে তাই যেমন প্রায়শই বাঘ বোকা, আর শেয়াল চালাক হয়। তেমনিই জামাইকে বোকা করে তার বোকামির ফল স্বরূপ তার উপর নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হয় এবং শাশুড়ীর লাঞ্ছনার কাহিনীও কৌতুক আকারে প্রকাশ করা হয়। প্রভাতকুমারের বলবান জামাতা ও রবীন্দ্রনাথের রাজটীকা' গল্পে জামাই এর বোকামি ও তার লাঞ্ছনার হাস্যরসাত্মক কাহিনী উপস্থিত করা হয়েছে।

ডাইনীরা যে কতরকম ছলাকলা, গুপ্তবিদ্যা, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও মন্ত্রশক্তির অধিকারী তার উদাহরণ পাওয়া যায় পৃথিবীর তাবৎ লোক কথায়, কাহিনীতে ও লোকবিশ্বাসে। ডাইনী সম্পর্কে একটি বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে তারা মানুষের রক্ত শোষণ করে মানুষকে নির্জীব করে মেরে ফেলে। মনুষ্য রক্ত শোষণকারী এই ডাইনীর একটি উপকথা পাওয়া গেছে ঝাড়গ্রাম মহকুমার ডোমজুড়ি গ্রাম থেকে। উপকথাটি এই :

এক বাড়িতে একটি লোক তার বৌ আর মা থাকতো। এই তিনজন ছাড়া একজন মজুর থাকতো। শাশুড়ি ও বৌ ছিল ডাইনি। একদিন বাড়িতে পিঠা তৈরী হলো, সমস্ত পিঠাই সেই লোকটি আর মজুরটি খেয়ে ফেলেছে। বৌ কেবলই বলে, কি খাব, খাব, শাশুড়ীও বলে, কি খাব। তখন ছেলেটার দেহ থেকে তার মা রক্ত শুষে খেয়ে নিল একটা বড় খড় দিয়ে। মজুরটা সবই দেখেছে। সে ভাবল যে এবার তার দেহ থেকে রক্ত শুষে নেবে, তাই ভয়ে সারা রাত্রি সে আর ঘুমালোনা।

সকাল হলো, লোকটি তার মজুরকে বললো তার সঙ্গে সে যাবে। মজুর বললো, তুমি গিয়ে কি করবে। তখন সেই লোকটি বলল যে তার গায়ে বড ব্যাথা হয়েছে, কিন্তু কেন হয়েছে তা সে বুঝতে পারছেনা। মজুরটি তখন বলল যে তার একটা কথা আছে, বলতে কিন্তু সে ভীষণ ভয় পাচ্ছে। তার মনিব তাকে অভয় দিয়ে বললো যে তার যা বলবার আছে তা সে বলতে পারে কোন ভয়ের কারণ নেই। তখন মজুরটি তাকে সব কথা খুলে বলল, এবং তার ঘরে থাকতে রাজী হলো না। একথা বলে সে চলে গেল, আর সেই লোকটিও মরে গেল। মজুরটির আর নাগাল পাওয়া গেল না।

উপরোক্ত উপকথাটির অন্তর্গত ডাইনী বিশ্বাসের যে কাহিনী বিবৃত হয়েছে তা আধুনিক কথাসাহিত্যকেও কিভাবে প্রভাবিত করেছে তার দুটি প্রমাণ এখানে উপস্থিত করা যেতে পারে, তারাশঙ্করের "ডাইনী" গল্পের পরিকল্পনায় লৌকিক উপকথাগুলির এবং লৌকিক বিশ্বাসের পরিপূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান, 'ভূত-প্রেত দৈত্য-দানব ডাকিনী-যোগিনী সম্পর্কে আদিম মানুষের যে চেতনা ভয়ও কুসংস্কারের মধ্যে লালিত হয়ে বংশ বংশ ধরে মানুষের মনোলোকের অন্ধকারকে আশ্রয় করে আছে তারই বিস্ময়কর প্রকাশ এই গল্পটি। বিভীষণা প্রকৃতিও এখানে ভয়ঙ্করী ডাইনীরই সহোদরা। জলহীন ছায়াশূন্য দিগন্ত বিস্তৃত ছাতি ফাটার মাঠ। গ্রীষ্মকালে শূন্য লোকে ভাসে একটি ধূম-ধূসরতা, নিম্নলোকে তৃণ চিহ্নহীন মাঠে সদ্য নির্বাপিত চিতাভস্মের রূপ ও উত্তপ্ত স্পর্শ। এই মাঠেরই এক প্রান্তে নির্জন আমবাগানে ডাইনীর বাস। তার যখন বছর বারো বয়স একদিন বামুন পাড়ার হারু চৌধুরী তাকে প্রথম সচেতন করে দিয়েছিল যে, সে ডাইনী, তার নজরে বামুনের ছেলে পেট-বেদনায় ছটফট করেছে, সেই থেকে কত অসংখ্য ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যে সে মানুষ নয়। মানুষের দেহ-রস লোলুপা রাক্ষসী। বার বার শুনে শুনে তার নিজেরও বিশ্বাস হয়ে গেছে যে তার নরুণ-দিয়ে-চেরা ছুরির-মত চোখে যাকে তার ভাল লাগে তার আর রক্ষা থাকেনা। তার স্বামীকেও একদিন সে শোষণ করে মেরে ফেলেছিলো। মায়ের কোলে কচি শিশু, স্বাস্থ্যবতী যুবতী মায়ের হয়ত প্রথম সন্তান। হৃষ্ট পুষ্ট নধর দেহ—কচি লাউ ডগার মত নরম সরস। ডাইনীর দৃষ্টি পথে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই তার দন্তহীন মুখে কম্পিত জিহ্বারতলে ফোয়ারাটা যেন খুলে যায়। নরম গরম লালায় মুখটা ভরে ওঠে। যেন শিশুর দেহের সমস্ত রস নিঙড়ে নিঙড়ে পান করছে সে। মুখের লালার মধ্যে স্পষ্ট তার রসাস্বাদ। সুতরাং শুধু জনপদের সর্বলোকেরই নয়, হতভাগিনীর নিজেরও বিশ্বাস সে ডাইনী, কতবার সে দেবতার কাছে কাতর হয়ে মানত করেছে, 'মা, আমাকে ডাইনী থেকে মানুষ করে দাও। আমি তোমাকে বুক চিরে রক্ত দেব। মা মুখ তুলে চাননি। সমস্ত গল্পটির মধ্যে ডাইনী সম্পর্কে মানুষের লৌকিক বিশ্বাসের অলৌকিক পরিবেশ এবং তার সঙ্গে ভাগ্য চক্রে ডাইনী রূপান্তরিত এই হতভাগিনীর প্রতি লেখকের মমত্ববোধ সমগ্র গল্পটি আশ্চর্য শিল্প-কুশল করে তুলেছে। এছাড়া বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর "পথের পাঁচালী" উপন্যাসে একটি 'ডাইনী বুড়ির উল্লেখ আছে, যাকে দেখে বালক অপু অনেক বার ভীত হয়ে ছিলো। আর একটি উপকথায়ঃ

বুদ্ধি যার রেহাই তার

এক শিয়াল, তার স্ত্রী ও দুটি ছানা এক গর্তে বাস করত। একদিন সেই শিয়ালনীর সঙ্গে পথে এক বাঘের দেখা হোল। বাঘ ভাবল, এবার এটাকে খাব। শিয়ালনী বাঘের মতিগতি বুঝতে পেরে তাড়াতাড়ি বললো, শ্বশুর মশাই, আমার সংসারে বড় অশান্তি, আপনার ছেলে আমাকে মার ধোর করে। আমি দুটি ছানা নিয়ে কোন রকমে কষ্টে আছি, আপনি এর বিচার করবেন চলুন।

বাঘ প্রথমে শশুর সম্বোধন করাতে একটু গর্ববোধ করল এবং পরে ভাবলো দুটি ছানা ও স্বামীর সংবাদ পেলে আরও ভালো হয়। তাহলে চারজনকেই একসঙ্গে খাওয়া যাবে। এই সব নানা কথা ভেবে বাঘ বলল, চল চল তোমাদের বিচার করে দিয়ে আসি। শিয়ালনী বলল, আমি আগে আগে যাচ্ছি, আপনি আমার পিছনে পিছনে আসুন।

কিছুদুর যাওয়ার পর শিয়ালের গর্ত এসে পড়ল। শিয়ালনী বলল, আমি গর্তে ঢুকি, তারপর আপনি আসুন। বাঘ বলল, আচ্ছা তাই হবে, শিয়ালনী গর্তের ভিতর ঢুকে গেল, কিন্তু বাঘ ঢুকতে পারলো না। কারণ শিয়ালের গর্ত এত ছোট যে বাঘ ঢুকতে পারেনা। এমন সময় শিয়ালনী গর্তের ভিতর থেকে চিৎকার করে বলল, শ্বশুর মশাই আপনাকে কষ্ট করে আসতে হবে না। কারণ আমাদের ঝগড়াঝাটি সব মিটমাট হয়ে গেছে। এবার আপনি আসুন।

উপরোক্ত উপকথাটিতে বাঘের নির্বুদ্ধিতা ও শিয়ালের বুদ্ধি মত্তার যে পরিচয় পাওয়া এবং যে বিষয় বস্তুটি উপস্থিত করা হয়েছে তার মধ্যে এত স্পষ্ট বাস্তবতার ছাপ আছে যে তার মধ্যে অনেক আধুনিক কথাসাহিত্যের লক্ষণ বিদ্যমান বলেই মনে হয়। বাংলার উপকথায় ক্ষুদ্রের নিকট বৃহৎ সর্বদা বুদ্ধিমত্তায় পরাজিত হয়।

অবিমিশ্র পশুপক্ষীর চরিত্র নিয়েই যে বাংলার উপকথা রচিত হয়েছে তা নয়, অনেক উপকথার মধ্যে পশুপক্ষীর পাশে নরনারী চরিত্র স্থান পেয়েছে। মনুষ্য ও মনুষ্যেতর জীবদের মধ্যে কি সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে এই উপকথা গুলি তার প্রমাণ। পরবর্তী যুগের আধুনিক কথাসাহিত্যে এই লৌকিক উপকথাগুলির ধারা চলে এসেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের "আদরিনী" গল্পে ও শরৎচন্দ্রের "মহেশ" গল্পটিতে। উপকথায় পশুপক্ষীর সঙ্গে মনুষ্য চরিত্রগুলির রূপকথার নরনারী চরিত্রগুলির মতই নির্বিশেষ, এদের যেমন নাম ধাম নেই,

তেমনি কোন নির্দিষ্ট পরিচয় নেই, কেবল একটি ডাইনি, বা এক নাপিত, এক বামুন, বা এক বুড়ি। এ সকল চরিত্রের মধ্যে খুব বেশি বৈচিত্র্যও নাই। বিভিন্ন উপকথায় সাধারণতঃ এই কয়টি মানব চরিত্রই দেখতে পাওয়া যায়, যেমন, জোলা, নাপিত, বামুন, জামাই, শাশুড়ী এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি ও নির্দিষ্ট, যেমন জোলা-নির্বোধ, নাপিত ধূর্ত, বামুন দরিদ্র ও লোভী, জামাই বোকা, তাই এসকল উপকথার মূলরস হচ্ছে হাস্যরস। তাঁতীর নির্বুদ্ধিতায়, নাপিতের চালাকিতে, জামাই এর বোকামিতে যে নিছক হাস্যরস সৃষ্টি হয় তাকে পরিবেশন করাই হচ্ছে, উপকথার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য, পরবর্তী যুগের আধুনিক কথা সাহিত্যের হাস্যরস মূলক গল্পগুলির সৃষ্টির উৎস নিহিত আছে এই উপকথাগুলির মধ্যে।

॥ চার ॥

ব্রতকথা ও উপন্যাস

পৃথিবীর সমস্ত কিছুতেই আত্মার অবস্থান কল্পনা, প্রাকৃতিক বস্তু অলৌকিক ক্ষমতা ও শক্তির বিশ্বাস থেকেই ধর্মের উৎপত্তি। আদিমযুগে মানুষ নিজের মত প্রকৃতির সব বস্তুকেই সজীব বলে ভাবতো। গাছপালা, নদনদী, পাহাড়-পর্বত, আকাশে মেঘমালা, পর্বতশিলা, তারকারাজি—সমস্ত কিছুই আদিম মানুষ জীবন্ত এবং আত্মাসংযুক্ত বলে মনে করতো।'[১] বাংলাদেশের ব্রতকথায় আছে এই আদিম বিশ্বাস, কারণ অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্যে একমাত্র ব্রতকথাতেই বাংলাদেশের আদিম মানুষের সংস্কৃতির, কিছু পরিচয় মেলে। আদিম ধর্ম বিশ্বাস বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে কিভাবে প্রকৃতির পূজায় পর্যবসিত হয়েছিলো এবং যা আজও শাস্ত্রীয় পরিবর্তনের মধ্যেও লুপ্ত হয়ে যায়নি তার সমর্থন হিসাবে একটি মত উদ্ধৃত করা যেতে পারে "প্রকাণ্ড একটা ব্রত প্রকরণ না শিখলে শাস্ত্র পুরাণের জট ছাড়িয়ে আমাদের দেশের হিন্দুধর্মের পুরাণের পূর্বেকার ব্রতগুলির চেহারা বের করে আনা কঠিন। তবে ব্রতগুলি যে 'আর্যপুত্রের এবং আর্যহৃদয়ের ছবি নয়' সেটা ঠিক। আর্যের চেয়ে বরং অনার্যের—অন্য ব্রতদের গৃহলক্ষ্মীর পদাঙ্ক এই সব ব্রতের আল্পনায়, ছড়ায়, ব্রতকথায় সুস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। অনার্য অংশ শাস্ত্রীয় ব্রতগুলির মধ্যেও যথেষ্ট রয়েছে এবং সেই অংশগুলিকে হিন্দু পুরাণে তন্ত্র-মন্ত্রের আবরণে ঢাকবার চেষ্টাও হয়েছে। কিন্তু সব সময়ে সে চেষ্টা সফল হয়নি, দেখি"।[২]

১. The Philosophy of Religion. p. 63 by D. M. Edwards

২. বাংলার ব্রত, পৃঃ ১৯, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

এই আর্য-অনার্য, গ্রাম্য হিন্দু সমাজও আদিম সমাজের মিশ্র ধর্মীয়, ও সংস্কৃতির সার্থক রূপ পাওয়া যায় বাংলাদেশের ব্রতানুষ্ঠান, ব্রতের ছড়া ও ব্রতকথাগুলির মধ্যে, ব্রতকথার মধ্যেই বুঝতে পারা যায় ধর্মের উৎপত্তি হয়েছে মানুষের মৃত্যু ও ধ্বংসের হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের ইচ্ছায়, জীবনের আনন্দলাভ, সমৃদ্ধি ও শক্তি কামনায় পুণ্যিপুকুর। অশ্বত্থ পাতার ব্রত থেকে শুরু করে যমপুকুর সঙ্কটা সমস্ত রকম ব্রতানুষ্ঠানেরই একই কামনা। অশ্বত্থ পাতার ছড়ায় :—

পাকা পাতাটি মাথায় দিলে, পাকা চুলে সিঁদুর পরে,
কাঁচা পাতাটি মাথায় দিলে, স্বর্ণ কান্তি রূপ ধরে।
কচি পাতাটি মাথায় দিলে, কোলে পায় নবকুমার,
শুকনো পাতাটি মাথায় দিলে, সুখ শান্তিতে ঘর ভরে···

এই চিরন্তন কামনাগুলিই ব্রতকথার। এর আদিমতম উৎসটি হচ্ছে বাঁচবার প্রবৃত্তি, জীবনের সংঘর্ষ বা সংগ্রাম প্রভৃতি জৈবিক প্রয়োজন। একটি ব্রতকথা বিশ্লেষণ করলে ব্যাপারটী স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পুণ্যিপুকুর ব্রতকথা

কোন এক গ্রামে ব্রাহ্মণ তার স্ত্রী ও দু'ছেলে এক মেয়ে নিয়ে বসবাস করতো। তারা খুব গরীব, ব্রাহ্মণ ভিক্ষে করে আনে তাই তারা পাঁচ জনে ভাগ করে খায়। এভাবে এদের দিন কাটছিলো। কিন্তু এও বুঝি তাদের আর সহ্য হলো না। পরপর ক'বছর অজন্মা হওয়ার জন্যে জমিদারের খাজনার দায়ে মাথা গোঁজবার কুঁড়ে টুকুও চলে গেল। ব্রাহ্মণ কি আর করে, ছেলেমেয়েদের হাত ধরে মনের দুঃখে ব্রাহ্মণ আর ব্রাহ্মণী পথে নামলো। অনেকদুর হেঁটে শেষকালে তারা এক পুকুরের ধারে এল তখন বেলা দুপুর। ছোট ছেলে খাবার জন্যে বায়না ধরলো। কি আর উপায় সঙ্গে চাট্টি চাল ডাল যা ছিলো তার রাঁধবার আয়োজন করলো ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণ গেল কাঠ যোগাড় করতে। তখন মেয়েটী বললে মা, রাঁধতে দেরী আছে, আমার পুণ্যিপুকুর ব্রতটা সেরেনি। ব্রাহ্মণ বললো—আর ব্রত করে কি হবে মা নারায়ণ আমাদের উপর বিমুখ। মেয়ে বললে, মা, আমি ব্রত করে আসি। এই বলে মেয়েটি পুকুরের পাড়ে গিয়ে খানিকটা জায়গায় পরিষ্কার করে যথাবিধি পুকুরের ব্রত করলে, তারপর ভক্তি ভরে প্রণাম করে বললে, হে নারায়ণ! হে বিপদ ভঞ্জন! হে মধুসূদন! এ বিপদ থেকে আমাদের উদ্ধার কর। আমি আর বাপ মার দুঃখ কষ্ট দেখতে পারি না।

এই কথা বলতে বলতে তার দুচোখে জল দেখা দিল। হঠাৎ তার সামনে বৃদ্ধ-বেশী নারায়ণ উদয় হয়ে বললো, বাছা ব্রত তো তুমি করলে, এই ব্রত ফল স্বরূপ আমায় চাট্টি খেতে দাও, আমি বড়ই ক্ষুধার্ত। মেয়েটী তেজঃ পুঞ্জ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে দেখে বড়ই আশ্চর্য হয়ে বললো, প্রভু আসুন আমার সঙ্গে। এই কথা বলে ব্রাহ্মণকে নিয়ে তার মার কাছে গিয়ে বললে—'মা অতিথি ব্রাহ্মণকে খেতে দাও। মেয়ের কাণ্ড দেখে মা তো আশ্চর্য হয়ে গেল। নিজেরা কি খায় তার ঠিক নেই, এখন অতিথি ব্রাহ্মণকে কি খেতে দেয়। আর ব্রাহ্মণ এলই বা কোথা থেকে। বৃদ্ধবেশী নারায়ণ ব্রাহ্মণীর অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, বাছা আমি তবে চললুম, এই বলে তিনি যখন যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছেন। তখন মেয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠলো, মা আমার ভাগের যা ভাত আছে তাই এই ব্রাহ্মণকে খেতে দিন। আমার আজ ক্ষিদে নেই। ব্রাহ্মণী আর কি করেন। অতিথিকে আসন করে খেতে দিলেন। ভোজনের শেষে ব্রাহ্মণ আর্শীবাদ করে বললেন, তুমি বড় ভক্তিমতী মেয়ে, তুমি রাজরানী হও, মেয়েটী আঁচল খুলে একটী কড়ি দক্ষিণা স্বরূপ ব্রাহ্মণকে দিয়ে প্রণাম করে মুখ তুলতেই দেখলো ব্রাহ্মণ আর নেই এবং শুনতে পেল আকাশ থেকে কে যেন বলছে, আমি বৃদ্ধ বেশী নারায়ণ তোমার পরীক্ষা করলুম। তোমার পুণ্যিপুকুর ব্রত উদযাপন হলো। প্রভাতেই তোমার দুঃখ দূর হবে।

পরদিন ভোর বেলায় রাজার লোক এসে উপস্থিত। কি ব্যাপার না রাজা রাত্রে তার প্রতিষ্ঠিত দেবতার স্বপ্নে আদেশ পেয়েছেন ব্রাহ্মণকে নিজের ভিটায় ফিরিয়ে আনবার জন্যে, আর ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে তার ছেলের বিয়ে দেবার জন্য। তারপর শুভলগ্নে রাজকুমারের সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। আর সেই থেকে পুণ্যিপুকুর ব্রত চারিদিকে প্রচারিত হলো।

বাংলা দেশের ব্রতকথাগুলির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তার বাস্তবতা ও জীবন সম্পর্কিত ধ্যান ধারণাগুলির স্বচ্ছন্দ্য ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। উপরোক্ত ব্রতকথাটিতে যে পরিবেশ, চরিত্রগুলি ফুটে উঠেছে তা একান্ত ভাবে বাংলাদেশের নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের, তাদের আচার আচরণ, রীতিনীতির মধ্য থেকে সেই সমাজজীবনের পরিচয়টিকে ধরে নিতে অসুবিধা হয়না। তাই বলা চলে বাংলাদেশের লোকসাহিত্যে বা লোককথায় কথাসাহিত্যের বীজ লুক্কায়ত ছিল। তার বাস্তবতা ; পরিবেশ সৃষ্টি ও চরিত্র নির্মাণ ইত্যাদি পরবর্তী যুগের আধুনিক কথাসাহিত্যকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করেছে। দৈব অনুগ্রহ বা নিগ্রহ বাংলার

লোককথার বিশেষ করে ব্রতকথার একটি বিশেষ অভিপ্রায়। ব্রতকথার মধ্যে মানবিক আশা আকাঙ্ক্ষারই বিকাশ দেখা যায়, পার্থিব বিষয় আশ্রয় করেই ব্রতকথার বাসনা এবং কামনা ব্যক্ত হয়ে থাকে। সে জন্যে এর মধ্যে অলৌকিকতার, রহস্যময়তার যতই স্পর্শ থাকুক না কেন, এগুলি সাহিত্য গুণ থেকে বঞ্চিত নয়। মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে দৈবের যে প্রভাব অনুভব করে ব্রতকথায় মধ্যে তারই অভিব্যক্তি দেখা যায়। অনেক সময়ই ব্রতকথায় একটি লৌকিক দেবতা লক্ষ্য থাকে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা দৈবেরই রূপক, তা সবিশেষ কোন চরিত্র নয়। দৈব বা অলৌকিকতা এখানে নিয়তি বা ভাগ্যেরই দর্শক। নিয়তি ভাগ্যের দ্বারা মানবজীবন সদা নিয়ন্ত্রিত। দৈব ও অলৌকিকতা সত্বেও ব্রতকথাগুলির সর্বাঙ্গে এমন একটি বাস্তবতার ছাপ আছে যদ্দ্বারা এগুলিকে আধুনিক কথা সাহিত্যের অগ্রদূত বলে মনে হয়। ব্রতকথার দৈব ও অলৌকিক কাহিনীগুলি বহিরঙ্গ অলঙ্কার মাত্র। এগুলিকে নিয়তি বা ভাগ্য হিসাবে ব্যবহার করলে এর সমস্ত কাঠামোতে এমন একটি বাস্তব স্বীকৃতির ছাপ লক্ষ্য করা যায় যা অত্যন্ত বিস্ময়কর। সেজন্য এগুলি নিছক আনুষ্ঠানিক পূজার মন্ত্র হয়ে প্রাণহীন হয়ে পড়েনি। সমাজের গার্হস্থ্য পারিবারিক জীবনের নিখুঁত পরিচয় ব্রতকথাগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে বলে এগুলিকে আধুনিক উপন্যাস সাহিত্যের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক যুক্ত বলেই মনে হয়।

॥ পাঁচ ॥

গীতিকা ও উপন্যাস

ইংরাজীতে যাকে ব্যালাড বলে বাংলায় লৌকিক 'গীতিকা' হচ্ছে তাই। জনশ্রুতিবিদ গীতিকার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে দেখা যায়, প্রথমতঃ একটি সঙ্কটপূর্ণ ঘটনাপ্রধান, একমুখীন কাহিনী থাকবে। দ্বিতীয়তঃ ঘটনা ও সংলাপের মাধ্যমে একলক্ষ্য হয়ে কাহিনী অগ্রসর হবে, তৃতীয়তঃ সম্পূর্ণ আত্মনির্লিপ্ত হয়ে লেখক একটি একান্ত বস্তুধর্মী কাহিনী এতে বর্ণনা করবেন। চতুর্থতঃ কোন নিরবচ্ছিন্ন কাহিনীর ধারা অনুসরণ না করে বিশেষ করে কতকগুলি ঘটনার উপর তীব্রতম আলোক সম্পাত করা হবে, পঞ্চমতঃ পরিবেশ রচনা, কিংবা চিত্র সৃষ্টি গীতিকার উদ্দেশ্য নয় বরং দ্রুত সঞ্চারিত ক্রিয়াই-এর প্রধান পটভূমিকা, ষষ্ঠতঃ গীতিকার চরিত্রগুলি নাটক বা উপন্যাসের মত সুস্পষ্ট ও স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ নয়, বরং

একটি আদর্শ বা ছাঁদ অনুযায়ী চরিত্রগুলি সৃষ্ট। চরিত্র সৃষ্টির চেয়ে 'ক্রিয়া বা এ্যাকশান গীতিকার মূল। সপ্তমতঃ গীতিকার কাহিনী এক ঘটনামুখি হয়ে পরমবিস্ময়, সুগভীর কারুণ্য চরম সঙ্কট ও লোমহর্ষক ভীতভাবের সৃষ্টি করে থাকে, তার মধ্য দিয়েই গীতিকার রূপটি প্রকাশিত হয়ে ওঠে। অষ্টমতঃ লোকগীতিতে সুরই মুখ্য, কথা গৌণ, বরং কথাসুরের অধীন, গীতিকায় কথাই মুখ্য সুর গৌণ।

উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি অনুধাবন করলে আমরা একথা স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারি যে গীতিকা শিক্ষিত ও প্রায়শঃই সচেতন কবি মনের সৃষ্টি। যে সমাজে গীতিকায় উদ্ভব হয় তার একটি প্রাচীন ঐতিহ্য থাকে—এই ঐতিহ্য সংহত সচেতন শিক্ষাপ্রাপ্ত সংস্কৃতি দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত। তাই বলা যায় আদিম সমাজে গীতিকা ছিল না। যে সমাজ বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সঙ্গে মিশ্রণের ফলে এক সমৃদ্ধ জনশ্রুতিমূলক সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছে গীতিকা কেবল তাদের দ্বারা বা সেই সমাজগোষ্ঠীর দ্বারাই রচিত হতে পারে। অনেকে বলেছেন যে গীতিকা হচ্ছে রোমান্সেরই সংক্ষিপ্ত রূপায়ণ. জীবনের গভীরতম বক্তব্যকে অত্যন্ত ক্রিয়াত্মকভাবে, জীবন ও মৃত্যুর নানা বিষয়কে অত্যন্ত সরলভাবে উপস্থিত করা হয়। এখানেই হচ্ছে গীতিকার সঙ্গে কথা সাহিত্যের সম্পর্ক। অন্যান্য লোককথা মতই গীতিকার হচ্ছে আধুনিক কথাসাহিত্যের লৌকিক ঐতিহ্য।

চৈতন্য জীবনীকারদের রচনায় ও মুকুন্দরামের মঙ্গলকাব্যে ষোড়শশতকের ও সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগের সমাজজীবনের বহু বিবরণ উপস্থিত হয়েছে। তৎকালীন সমাজের রীতিনীতি, চালচলন. রুচি-আদর্শ, সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তীর্থপর্যটন, ধর্মবিষয়ক বিচার-বিতর্ক প্রভৃতি বিষয়ের বিবরণ গ্রন্থ-গুলিতে পাওয়া যায় তাকে বাস্তবের সত্য প্রতিচ্ছবিই বলা চলে। মৈমনসিংহ গীতিকার আখ্যায়িকাগুলির রচনা কাল ষোড়শ সপ্তদশ শতক বলেই অনুমিত হয়। অন্যান্য গীতিকার আখ্যায়িকা গুলির রচনা কালও ষোড়শ সপ্তদশ শতক বলেই অনুমিত এই অনুমান ঠিক হলে এগুলির আবিষ্কার আমাদের সাহিত্যিক ক্রমবির্ভনের একটি লুপ্ত অধ্যায়কে পুনরুদ্ধার করেছে। কৃত্তিবাস-কাশীদাস মুকুন্দরামের যুগ ও ভারতচন্দ্র যুগের মধ্যে যে একটি ব্যবধান অনুভূত হয় 'মৈমনসিংহ গীতিকা' তা পূরণ করেছে। বাস্তবতার দিক দিয়ে মুকুন্দরামের নিঃসঙ্গ প্রচেষ্টা এযুগে লক্ষ্য করা যায়, এই গীতিকাগুলি তারই মাঝে মাঝে বাস্তবজীবনকে সার্থক ভাবে প্রতিফলিত করেছে। সুতরাং বাংলা সাহিত্যের বাস্তবতা, চরিত্র সৃষ্টির, কাহিনীর

বস্তুগত ভিত্তিনির্মাণে এই গীতিকাগুলির যে স্বাতন্ত্র মূল্য আছে ইতিহাসের দিক দিয়ে তাকে অস্বীকার করার উপায় নাই। এ প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর একটি মত উদ্ধৃত করা যেতে পারে: "ইহারা মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রের ব্যবধানের উপর সংযোগ-সেতু নির্মাণ করিয়াছে। মুকুন্দরামের একটা বৃহৎ জ্ঞাতি-গোষ্ঠী পরিবারের সন্ধান দিয়াছে ও ভারতচন্দ্রের কৃত্রিম কারুকার্যপূর্ণ, তীব্র দ্যুতি-ঝলসিত রাজ প্রাসাদের ভিত্তি মূলে যে বাস্তব জীবনের মৃত্তিকাস্তর বিদ্যমান তাহা উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইয়াছে। আবার রূপকথার সহিতও ইহাদের একটা নিকট আত্মীয়তা আশ্চর্যরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। গীতি আখ্যানের সহিত "কাজলরেখা" নামক রূপকথাটির একত্র সন্নিবেশ এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহস্যটি স্ফুটতর করিয়াছে। আমাদের সাহিত্যিক আকাশে নিশীথ তারকার ন্যায় রূপকথার যে অপরূপ ফুল ফুটিয়াছে, এই আখ্যানগুলি তাহার বৃন্ত ও মূল, বাস্তবজীবনের যে স্তর থেকে এই রূপকথা রস আহরণ করিয়াছে সেই বিস্মৃত প্রায় প্রতিবেশের উপর ইহারা আলোকপাত করিয়াছে। আকাশের সুদূর কুহেলিকাচ্ছন্ন নক্ষত্রটিও আমাদের সংসার যাত্রার শত প্রয়োজন চিহ্ন, মৃৎপ্রদীপরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। রূপকথার নামগোত্রহীন রহস্যাবগুণ্ঠিত অস্তিত্বের জন্মস্থান নির্ণয় হইয়াছে ও বংশ পরিচয় মিলিয়াছে। কয়লা ও হীরক খণ্ড যেমন মূলতঃ অভিন্ন, তেমনি বাস্তবতা-মূলক করুণ কাহিনী ও রূপকথার অবাস্তব দৈব সংঘটন একই প্রতিবেশ প্রভাব ও মনোবৃত্তির অভিব্যক্তি", যে বাস্তবের কঠোরতা ও নিষ্ঠুরতা মানুষকে শত লক্ষ বাহু বিস্তার করে রূপকথার রাক্ষসীর মতই কণ্ঠরোধ চায় সেখানেই দৈবের প্রতি অলৌকিকতার প্রতি একটা ঝোঁক আসা স্বাভাবিক। ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখা অবাস্তব হতে পারে। কিন্তু এর মধ্যেও মনস্তত্ত্বমূলক গূঢ় সত্যও নিহিত আছে সেজন্যে ময়মনসিংহ গীতকায় যে পরিবেশের পরিচয় মেলে, তার মধ্যে খুব স্বাভাবিক কারণেই রূপকথা জন্মলাভ করেছে। একটি গীতিকার কাহিনী উদ্ধৃত করলে বোঝা যাবে লোককথার সঙ্গে কোন সম্পর্ক বহন করে গীতিকাগুলি আধুনিক যুগের কথাসাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক নির্মাণ করেছে।

মলুয়াপালা

চান্দ বিনোদ বিধবা জননীর একমাত্র সন্তান। অকাল বৃষ্টিতে একবার ক্ষেতের ধান নষ্ট হয়ে গিয়ে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। মা ও ছেলে খুব কষ্টের মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করতে লাগলো। অবশেষে একদিন চান্দ পিঁজরা হাতে আড়ালিয়া

গ্রামে এসে উপস্থিত হল। সেই গ্রামের মোড়লের মেয়ে মলুয়াকে দেখে মুগ্ধ। কিন্তু দারিদ্র্যের জন্যে মলুয়ার বাবা বিনোদের হাতে কন্যাদান করতে অস্বীকার করলেন। বিনোদ ঘরে ফিরে অর্থোপার্জনের উপায় সন্ধান করতে লাগলো। অবশেষে বিদেশ থেকে প্রচুর অর্থ অর্জন করে দেশে ফিরলে, এবার আর মলুয়ার বাবা তার নিকট কন্যা সম্প্রদান করতে আপত্তি করলেন না। বিনোদ মলুয়াকে বিয়ে করে নিজের ঘরে আনল। একদিন গ্রামের কাজি মলুয়াকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হ'ল, এক কুট্টিনী নারী তার নিকট পাঠিয়ে তার পাপ অভিলাষ ব্যক্ত করলো। মলুয়া কুট্টিনীকে অপমান করে তাড়িয়ে দিল। মিথ্যা দেনার দায়ে কাজি এবার বিনোদের জমিজমা বাজেয়াপ্ত করে নিল, ফলে বিনোদের সংসারে পুনরায় দারিদ্র দেখা দিল। শাশুড়ীকে নিয়ে সুতাকেটে পরের বাড়িতে ধান ভেনে মলুয়ার দিন কাটতে লাগলো। কাজি এবার এক নুতন বিপদের সৃষ্টি করলো। বিনোদের উপর এক পরওয়ানা জারি করে নির্দেশ দিল, 'সাত দিনের মধ্যে তোমার সুন্দরী স্ত্রীকে দেওয়ান সাহেবের হাউলীতে নিয়ে উপস্থিত কর, নতুবা তোমাকে জীবন্তে কবর দেওয়া হবে।' বিনোদ আদেশ অমান্য করলো, কাজির পাইক পেয়াদা বিনোদকে জীয়স্তে কবর দিতে নিয়ে গেল, মলুয়াকে ধরে নিয়ে গিয়ে দেওয়ান সাহেবের অন্তঃপুরে উপস্থিত করলো। মলুয়ার পাঁচ ভাই বিনোদকে বাঁচাল, কিন্তু মলুয়া উদ্ধার করতে পারলো না। কৌশলে নিজের নারী ধর্ম রক্ষা করে মলুয়া তিন মাস পর দেওয়ান সাহেবের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেল। কাজীর শূল দণ্ড হল। কিন্তু বিনোদের আত্মীয়গণ মলুয়াকে ঘরে নিতে অস্বীকার করলো। বিনোদ আত্মীয় স্বজনের কথায় মলুয়াকে পরিত্যাগ করে পুনরার বিবাহ করলো। মলুয়া স্বামী পরিত্যাগ করলোনা, সেখানেই দাসীবৃত্তি করতে লাগলো। একদিন বিনোদকে সর্পদংশন করলো, বাঁচবার কোন আশা রইলোনা, মলুয়া তার পাঁচ ভাইয়ের সহায়তায় তাকে বাঁচালো। তথাপি আত্মীয়-স্বজন তাকে ঘরে নিতে নিষেধ করলো। জীবিত থাকলে স্বামীর কলঙ্ক ঘুচবে না মনে করে মলুয়া নদীর জলে ডুবে আত্মহত্যা করলো।

উপরোক্ত গীতিকাটির পালা একটানা ঘটনা সূত্রের দ্বারা নির্মিত হয়নি, বরং তার পরিবর্তে মলুয়ার জীবনের বিশিষ্ট কতকগুলি ঘটনার উপর চকিত আলোক সম্পাত করে কাহিনী উপস্থিত করা হয়েছে। এটি সার্থক গীতিকার লক্ষণ। আবার আধুনিক কথাসাহিত্যের বিশেষ করে উপন্যাসেরও লক্ষণ। আধুনিক উপন্যাসেও একটানা কাহিনী বর্ণনার পরিবর্তে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার

উপর জোর দেওয়া হয় এবং সেই ঘটনাগুলিকে একটি সার্থক পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। দেশে আকস্মিক দুর্ভিক্ষ, চাঁদ বিনোদের বিদেশযাত্রা, মলুয়ার সঙ্গে চাঁদ বিনোদের প্রথম দর্শন, অনুরাগ সঞ্চার, বিবাহ, কাজির লোলুপ দৃষ্টি, কলঙ্কময় জীবন থেকে পরিত্রাণ এবং শেষ পর্যন্ত মলুয়ার আত্মবিসর্জন—এ সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডিত ঘটনাগুলি মলুয়ার জীবনরচনায় অখণ্ড জীবনবৃত্ত রচনা করেছে।

চরিত্রের দিক থেকে বলা যায় সমগ্র গীতিকাটিতে যেভাবে চরিত্রের মিছিল ভিড় করে এসেছে, সবগুলিই যেন আমাদের সংসারের চারপাশের সজীব চরিত্র। মলুয়া, চাঁদবিনোদ, কাজি, মলুয়ার পাঁচ ভাই সবগুলিই একান্তভাবে বাস্তব। মলুয়া সমগ্র পালাটি জুড়ে একটি স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে বিরাজ করছে। জলের ঘাটে চাঁদবিনোদের ঘুমন্ত রূপ দর্শন থেকে শুরু করে ভগ্নতরীতে নিমজ্জিত হয়ে মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত—প্রেম ও মৃত্যুর মধ্যে চরিত্রটি স্বতন্ত্র মূর্তিতে সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। প্রেম, নারীর জীবন। প্রেমের মহত্ত্বে ও সতীত্বের গৌরবদীপ্ত মহিমায় মলুয়ার চরিত্রটি জীবন্ত হয়ে উঠেছে। কেবল মলুয়া চরিত্রটিই নয়, সমগ্র গীতিকা-সাহিত্যের মধ্যে নারী চরিত্রগুলিই প্রাধান্য লাভ করেছে। মলুয়ার পালায় মলুয়া, চন্দ্রাবতীর পালায় চন্দ্রাবতী, কমলা, লীলা প্রভৃতি নায়িকাচরিত্রগুলিই সমগ্র গীতিকাগুলির প্রাণস্বরূপ। গীতিকার এই নায়িকাপ্রাধান্য যে পরবর্তী যুগের বাংলা আধুনিক কথাসাহিত্যকে নায়িকাপ্রাধান্যে অভিষিক্ত করেছে একথা অস্বীকার করা যায়না। এ প্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের উক্তি প্রণিধানযোগ্য: "মলুয়ার প্রেম কি নির্ভীক কি আনন্দপূর্ণ। শ্রাবণের শতধারায় নানা দুঃখ আসিতেছে। কিন্তু এই প্রেমের মুক্তাহার কণ্ঠে পরিয়া মলুয়া চিরবিজয়ী, মৃত্যুকে বরণ করিয়া মৃত্যুঞ্জয়ী হইয়াছে, তাহার পার্শ্বে পালঙ্ক সখীর ত্যাগ কিরূপ স্বল্প কথায় ব্যক্ত। উহা বাক্য দ্বারা পল্লবিত না হইয়াও শ্রেষ্ঠ আদর্শে পৌঁছাইয়াছে। মলুয়ার পূর্বরাগ, বাসর ঘরে স্বামীর আলাপ, কাজির ধৃষ্ট প্রস্তাবের প্রত্যুত্তর এই সমস্ত কি অপূর্ব। এই অতুলনীয় চিত্র জীর্ণ গৃহে অনশনে স্বামীবিরহে, দেওয়ানের হাবলিতে, সর্পদষ্ট স্বামীর পার্শ্বে এবং শেষ দৃশ্যে ডুবন্ত মনপবনের নৌকায় বিচিত্রভাবে সর্বত্র অরুণরাগে উজ্জ্বল। অভাব, উৎপীড়ন, চূড়ান্ত দুঃখ, একদিনের জন্যও তাহাকে ম্লান করে নাই। লীলার লীলাবসান, সোপাইয়ের নির্বাক ও নির্ভীক মৃত্যু, কেনারামের ভক্তি, পাষাণময়ী কাজলরেখার চরিত্রটির সহিষ্ণুতা এবং প্রগাঢ় প্রেম নিষ্ঠার জীবন্ত সমাধি, চন্দ্রার তপোনিরত শান্তি হিন্দুর কি দেওয়ান সাহেবের··· হাবলিতে তাহা মলুয়া দেখাইয়াছে। মলুয়া ও সখিনা বঙ্গরমণীর রণরঙ্গিণীর মূর্তি।

এই দেশের মেয়েরা ফুলের কুঁড়ির মত যেরূপে অনুরাগে ঝরিয়া পড়ে, লীলা ও মদিনার চরিত্রে সেই অনুরাগ মূর্ত্ত। দুঃখ আত্মাকে কিরূপে সহিষ্ণুতা ও ভক্তির বর্মে আবৃত করিয়া রাখে চন্দ্রা তাহা নীরবে দেখাইতেছে”।[১] তাছাড়া অত্যাচারী কাজি দেওয়ান-এর অত্যাচার, হুমরাবেদের নৃশংসতা, অসৎ নেতাই কুটিনী, অর্থলোভী ভাটুকঠাকুর প্রভৃতি চরিত্র ও তাদের কার্যকলাপের যে নিখুঁত চিত্র লৌকিক গীতিকাগুলিতে ফুটে উঠেছে তা বিস্ময়কর, তাই সমালোচক বলেন, “এই বাস্তব উপাদানের প্রাচুর্য্যের জন্যই উপন্যাস-সাহিত্যের অগ্রদূতের মধ্যে ময়মনসিংহ গীতিকার একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। আখ্যায়িকাগুলির মধ্যে তৎকালীন সমাজের যে চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা আংশিক হইলেও বাস্তবতার দিক দিয়া একেবারে নিখুঁত। কি প্রকৃতি বর্ণনা কি চরিত্র চিত্রণ সর্বত্রই এই অকুণ্ঠিত বাস্তবতার চিহ্ন সুপরিস্ফুট,···বাংলার অন্তর বাহিরের আসল স্বরূপটি চিনিতে হইলে আমাদিগকে সংস্কৃত-প্রভাব-নির্মুক্ত পল্লী-সাহিত্যের দিকে চোখ ফিরাইতে হইবে। আমাদের বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যেমন একটা অসংস্কৃত আরণ্য উগ্রতা, ঘনবিন্যাস তরুলতার দুর্ভেদ্য জটিলতা, খাল-বিল-জলাভূমি-পার্ব্বত্য নদীর দুর্লঙ্ঘ্য বাধাসঙ্কুলতা আছে, সেইরূপ আমাদের অন্তরেও নম্র কমনীয়তাও ধর্মানুরাগের সহিত একটা দুর্দমনীয় তেজস্বিতা, দৃপ্ত আত্ম-সম্মানবোধ ও আবেগের অন্ধ মাদকতা ছিল। আমাদের ধমনীতে যে অনার্য রক্ত প্রবাহিত ছিল, তাহাই আর্যসভ্যতা ও ধর্ম সংস্কৃতির প্রভাব উল্লঙ্ঘন করিয়া এইরূপ উগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে”।[২] সংস্কৃত প্রভাবে অনুপ্রাণিত বঙ্গ সাহিত্যের ভিতরে যে বঙ্গসমাজের ও বঙ্গপ্রকৃতির চিত্র পাওয়া যায়, তাকে খাঁটি জিনিস বলা যায় না। এর মধ্যে একটি ভাবমূলক আদর্শ কাজের প্রকাশ আছে। বস্তুতন্ত্রতায় নয়, অথচ আধুনিক কথাসাহিত্যের মধ্যে হঠাৎ বাস্তবতার আবির্ভাব আমাদের বিস্মিত করে। তাই এই গীতিকাগুলি যখন পর্যালোচনা করা হয় তখন স্বাভাবিক ভাবে এই ধারণা মনে জাগে যে আধুনিক উপন্যাসগুলির বাস্তবতার পিছনে আছে গীতিকাগুলির লৌকিক ঐতিহ্য। গীতিকাগুলির মধ্যে নারীর রূপ বর্ণনা, আচার-আচরণ, চরিত্র-চিত্রণের মধ্যে, সংস্কৃত প্রভাব নাই বললেই চলে। আধুনিক কথাসাহিত্যের নায়িকাদের আচার-আচরণ কিংবা রূপ বর্ণনা এর মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের ঐতিহ্য নাই, আছে এই লৌকিক গীতিকাগুলির প্রভাব।

১। মৈমনসিংহ গীতিকা/ভূমিকা/ডঃ দীনেশ সেন সম্পাদিত/৩য় সং/পৃঃ ॥০-॥৵০

২। বঃ সাঃ উঃ ধাঃ / পৃঃ ১৫

তৃতীয় অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে লৌকিক উপাদান

প্যারীচাঁদ মিত্র

আলালের ঘরের দুলাল

বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদ মিত্র সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটি প্রবন্ধে বলেছেন, "বাঙালী লেখকেরা গতানুগতিকের বাহিরে হস্ত প্রসারণ করিতেন না। জগতের অনন্ত ভাণ্ডার আপনাদের অধিকারে আনিবার চেষ্টা না করিয়া, সকলেই ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাণ্ডারে চুরির সন্ধানে বেড়াইতেন, সাহিত্যের পক্ষে ইহার অপেক্ষা গুরুতর বিপদ আর কিছুই নাই।......

এই দুইটি গুরুতর বিপদ হইতে প্যারীচাঁদ মিত্রই বাঙ্গালা সাহিত্যকে উদ্ধৃত করেন। যে ভাষা সকল বাঙ্গালীর বোধগম্য এবং সকল বাঙ্গালী কর্তৃক ব্যবহৃত, প্রথম তিনিই তাহা গ্রন্থ প্রণয়নে ব্যবহার করিলেন এবং তিনিই প্রথম ইংরাজী ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন।

আর তাঁহার দ্বিতীয় অক্ষয় কীর্তি এই যে তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের কাছেই আছে। তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয়না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে, তেমনই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয়না, তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে, প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি 'আলালের ঘরের দুলাল'। প্যারীচাঁদ মিত্রের এই দ্বিতীয় অক্ষয়—কীর্তি।"

[প্যারীচাঁদ মিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাতেই বলা চলে প্যারীচাঁদই 'আলালের ঘরের দুলালে'র মধ্যে স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার থেকে রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। ইংরাজী ও সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা না করে বাঙ্গালা দেশের কথা ও বাঙ্গলার দেশীয় ভাষা নিয়েই যে সত্যিকারের সাহিত্য রচনা সম্ভব সেই ইংরাজীয়ানা ও ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাবের যুগেই প্যারীচাঁদ তাঁর আলালের ঘরে দুলাল গ্রন্থে তা সম্ভবপর করে তুলেছিলেন।

তাঁর গ্রন্থের মধ্যে লৌকিক ছড়া, প্রবাদ, বিশিষ্টার্থক শব্দ প্রয়োগ ইত্যাদিতে ভাষার মধ্যে লৌকিক মানসটি অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে উঠেছে। বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ John Beames তাঁর A Comparative Grammar of Modern Aryan Language of India (1872) গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় লিখেছেন : Mittra...Puts into mouth of each of his characters appropriate method of talking and thus exhibits to the full his extensive-range of vulgar idioms which his language possesses. (P. 86).

বঙ্কিমচন্দ্র

অনেকে মনে করেন বঙ্কিমরচনা সম্পূর্ণ ইংরাজী শিক্ষার ফসল (Product)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট হওয়া, ইংরাজী সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জনকরা, প্রথম ইংরাজীতে নভেল রচনা করা, সিভিলিয়নের চাকরী গ্রহণ করা—এ সমস্ত তাঁর ইংরাজীয়ানার প্রকাশ; পরবর্তী সাহিত্যে সেই ইংরাজীও অন্যান্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রভাব। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে বঙ্কিমচন্দ্রের পাশ্চাত্য প্রভাবিত মানসিকতার পিছনে একটি সদাজাগ্রত লৌকিক মানস প্রবহমান ছিল, যা তাঁর সাহিত্যকে সম্পূর্ণ ইংরাজী বা সংস্কৃত সাহিত্যাশ্রিত না করে লৌকিক প্রভাবের দ্বারাও আচ্ছন্ন করেছে। তার মধ্যে লৌকিক ঐতিহ্য কিরূপ ছিল, লোকজীবন ও লোকশিক্ষাকে কি দৃষ্টিতে তিনি দেখতেন তার একটি সার্থক পরিচয় মেলে তাঁর লোকশিক্ষা নামক প্রবন্ধে: "একটা লোকশিক্ষার উপায়ের কথা বলি, আজ আর নাই। কথকতার কথা বলিতেছি। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে বেদী পিঁড়ির উপর বসিয়া, ছেঁড়া তুলট, না দেখিবার মানসে সম্মুখে পাতিয়া, সুগন্ধি মল্লিকামালা শিরোপরে বেষ্টিত করিয়া, নাদুস নুদুস কালো কথক সীতার সতীত্ব, অর্জ্জুনের বীরধর্ম, ভীষ্মের ইন্দ্রিয়জয়, রাক্ষসীর প্রেমপ্রবাহ, দধীচির আত্মসমর্পণ বিষয়কে সুসংস্কৃতের দ্বারা বক্তা সুকণ্ঠে মদলঙ্কার সংযুক্ত করিয়া আপামর সাধারণ সমক্ষে বিবৃত করিতেন। যে লাঙ্গল চষে, যে তুলা পেঁজে, যে কাটনা কাটে, যে ভাত পায়না সেও শিখিত"। [রচনাবলী পৃ ৩৭৭] অর্থাৎ বঙ্কিম মানসে লৌকিক সংস্কৃতির প্রচারের মাধ্যম যে কথকতা বা বিভিন্ন পাঠ উপরোক্ত অংশে তার স্পষ্ট প্রকাশ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই লৌকিক মানসিকতার উৎস ছিল মানব প্রেম। তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধাদিতে তাই বার বার সাধারণ মানুষ, রামধোন পোদ, হাসিমসেখ, রামা কৈবর্তের দল এসেছে।

তিনি তাদের বোঝবার ও ধরবার চেষ্টা করেছেন, তাঁর বিভিন্ন রচনার মধ্যে। এছাড়া রূপকথা, উপকথা, ছড়া প্রবাদ ও লোকগীতি ইত্যাদির প্রভাবও যে আছে তাঁর অন্যান্য রচনায় নিচে তা উপস্থিত করা হল।

দুর্গেশনন্দিনী

বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রথম উপন্যাস. ; এই উপন্যাসের আখ্যান ভাগেই আছে একটি পরিপূর্ণ রূপকথার আমেজ। যদিও একটি ইতিহাসের প্রেক্ষাপট সেখানে রচনা করা হয়েছে, তথাপি এরই আড়ালে রূপকথার একটি আমেজ সমগ্র উপন্যাসটিতে এক স্বপ্নময় রূপকথার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। যদিও এখানে নায়ক নায়িকার নামকরণ করা হয়েছে, তাদের নির্দিষ্ট রাজ্য রাজধানী ও অতীত ইতিহাস আছে, তথাপি এর মধ্যে রূপকথার রাজপুত্র ও রাজকন্যার রাজারানীর প্রভাবই বেশি পরিলক্ষিত হয়েছে। উপন্যাসের প্রারম্ভেই যে পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে সেটি রূপকথারই পরিবেশ। "৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘ শেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারনের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচল গমনোদ্যোগী দেখিয়া দ্রুত বেগে অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।......অল্পকালের মধ্যে মহারবে নৈদাঘ ঝটিকা প্রধাবিত হইল, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বৃষ্টিধারা পড়িতে লাগিল, ঘোটকারূঢ় ব্যক্তি গন্তব্য পথের আর কিছু মাত্র স্থিরতা পাইলেন না। অশ্ববল্গা শ্লথ করাতে অশ্ব যথেচ্ছ গমন করিতে লাগিল।......অচিরাৎ তড়িতালোকে জানিতে পারিল যে সম্মুখস্থ অট্টালিকা এক দেবমন্দির। কৌশলে মন্দিরের ক্ষুদ্র দ্বারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে দ্বার রুদ্ধ, হস্তমার্জনে জানিলেন দ্বার বহির্দিক হইতে রুদ্ধ হয় নাই। ......দ্বার খুলিয়া যাইবা মাত্র যুবা যেমন মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন, অমনই মন্দির মধ্যে অস্ফুট চীৎকার ধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তন্মুহূর্তে মুক্ত দ্বার পথে ঝটিকাবেগ প্রবাহিত হওয়াতে তথা যে ক্ষীণ প্রদীপ জ্বলিতেছিল, তাহা নিবিয়া গেল।"

এরপর কাহিনী যতই অগ্রসর হয়েছে যত জীবনের জটিলতা প্রবেশ করেছে দ্বন্দ্বসংঘাতের তীব্রতা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, রূপকথা থেকে সরে এসে উপন্যাস জীবনকথার মূল সত্যকেই প্রতিভাত করেছে, কিন্তু এতৎসত্ত্বেও রূপকথার পরিবেশটি অতিক্রান্ত হয়নি।

কপালকুণ্ডলা

কপালকুণ্ডলা বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশ্রেষ্ঠ রোমান্স, আর রূপকথাই হচ্ছে পৃথিবীর আদি ও অকৃত্রিম রোমান্স। রূপকথার মধ্যে কল্পময় স্বপ্নজগৎ উপস্থিত করা হয়েছে, রোমান্সের মধ্যেও তারই প্রকাশ। কপালকুণ্ডলায় বঙ্কিমচন্দ্র যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, যে অলৌকিক প্রাকৃতবিষয়ের সংস্থান করেছেন, যে স্বপ্ন ও কল্পনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছেন, তার থেকেই রূপকথার ঐতিহ্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কাপালিক ও তার লৌকিক কার্যাবলী লৌকিক ঐতিহ্যের অনুসরণ। উপন্যাসটির বর্ণনা উপস্থিত করলে এর সার্থক পরিচয় উদ্ঘাটিত হবে :

"শিখরাসীন মনুষ্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছিল—নবকুমারকে প্রথমে দেখিতে পাইলনা। নবকুমার দেখিলেন, তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইবে। পরিধানে কোন কার্পাস বস্ত্র আছে কিনা, তাহা লক্ষ্য হইল না; কটি দেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত শার্দ্দুলচর্ম আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা, আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রু জটা পরিবেষ্টিত। সম্মুখে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছিল—সেই অগ্নির দীপ্তি লক্ষ্য করিয়া নবকুমার সে স্থলে আসিতে পারিয়াছিলেন। নবকুমার একটা বিরাট দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলেন; ইহার আসনপ্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার কারণ অনুভব করিতে লাগিলেন। জটাধারী এক ছিন্ন শীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন। আরও সভয়ে দেখিলেন যে, সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে। এমন কি, যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালামধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে। নবকুমার মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। অগ্রসর হইবেন, কি স্থান ত্যাগ করিবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কাপালিকদের কথা শুনিয়া ছিলেন। বুঝিলেন, যে ঐ ব্যক্তি কাপালিক"।

Supernaturalism এবং Cannibalism অর্থাৎ অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস ও নরমাংসাহার, পৃথিবীর তাবৎ লোককথার (Folktale) সুপরিচিত অভিপ্রায় (Motif)। কাপালিকের আবির্ভাব, বিভীষিকাময় মূর্তি বর্ণনা, গলিত শবের উপর ধ্যানাসন, নরকপাল, নরমুণ্ডের মালা ইত্যাদি বিষয়গুলি অলৌকিকতার অন্তর্ভুক্ত। এই অলৌকিকতাও ভৌতিক আত্মা বিশ্বাস সম্পর্কে বলা হয়েছে। That barberians should imagine his manes or ghosts of theirs dead to be such active powerfull beings, arises naturally from their notions the soul (Anthropology Vol. II, E. B. Tylor, p. 94]

অর্থাৎ আদিম বর্বর জাতিদের ভৌতিক বিশ্বাসগুলি এসেছে আত্মায় বিশ্বাস থেকেই। শবের আসনে ধ্যান করার প্রথার মধ্যে ও মৃত আত্মার শক্তি ও সামর্থ লাভের ইঙ্গিত আছে। Cannibalism সম্পর্কে বলা হয়েছে—Man eating, also known as Authropology, the eating of human body or parts of it or the drinking of human blood, by human being (S. D. F. M. L. p. 186) কাপালিকদের নরমুণ্ডমালা ধারণ, নবকুমারকে বলি দেওয়া ইত্যাদি তান্ত্রিক আচার-আচরণের মধ্যে এই নরমাংসাহার অভিপ্রায়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। গ্রন্থের একাংশে তারই প্রতিধ্বনি :

নবকুমার পুনার্‌রূপ জিজ্ঞাসা করিলেন "আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছেন ?

কাপালিক কহিল, "পূজার স্থানে।"

নবকুমার কহিল, "কেন ?"

কাপালিক কহিল, বধার্থ।"

এ ছাড়াও দুটি গীত ব্যবহৃত হয়েছে উপন্যাসটিতে, যার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের সঙ্গে লোকসঙ্গীতের সাদৃশ্য আছে।

(১) বলে—পদ্মরানী, বদন খানি। রেতে রাখে ঢেকে।
ফুটায় কলি, ছুটায় অলি, প্রাণপতিকে দেখে ।।
আবার—বগের লতা, ছঁড়িয়ে পাতা, গাছের দিকে ধায়।
নদীর জল, নামলে ঢল, সাগরেতে যায় ।।
ছি-ছি—সরম টুটে কুমুদ ফুটে, চাঁদের আলো পেলে।
বিয়ের কনে রাখতে ফুলশয্যা গেলে ।।
মরি—একি জ্বালা, বিধির খেলা, হরিষে বিষাদ।
পর পরশে, সবাই বসে, ভাঙ্গে লাজের বাঁধ ।।

(২) বাঁধব চুলের রাশ পরবে চিকন বাস
খোঁপায় দোলাব তোর ফুল।
কপালে সিঁথির ধার কঁকালেতে চন্দ্রহার
কাণে তোর দিব জোড়া দুল ।।
কুঙ্কুম চন্দন চুয়া বাটা ভরে পান গুয়া
রাঙ্গা মুখ রাঙ্গা হবে রাগে।
সোনার পুত্তলি ছেলে কোলে তোর দিব ফেলে
দেখি ভাল লাগে কি না লাগে ।।

বিষবৃক্ষ

বিষবৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস, এ উপন্যাসের কিছু গীত ও ছড়ার মধ্যে লৌকিক প্রভাব লক্ষণীয় :

(১) গীত :

শ্রীমুখ পঙ্কজ—দেখবো বলে হে,
তাই—এসেছিলাম এ গোকুলে।
আমায় স্থান দিও রাই চরণতলে।
মনের দায়ে তুই মানিনী,—
তাই সেজেছি বিদেশিনী,
এখন বাঁচাও রাধে কথা কোয়ে,
ঘরে যাই হে চরণ ছুঁয়ে।
দেখবো তোমায় নয়ন ভরে
তাই বাজাই বাঁশী ঘরে ঘরে,
যখন রাধে বলে বাজে বাঁশী
তখন নয়ন জলে আপনি ভাসি।
তুমি যদি না চাও ফিরে,
তবে যাব সেই যমুনা তীরে ;
ভাঙবো বাঁশী তেজ্‌বো প্রাণ,
এই বেলা তোর ভাঙুক মান
ব্রজের সুখ রাই, দিয়ে জলে
বিকাইনু পদতলে,
এখন চরণ নূপুর বেঁধে গেলে, পশিব যমুনা জলে।

(২) সাহিত্যিক ছড়া :—

আয়রে চাঁদের কণা
তোরে খেতে দিব ফুলের মধু, পরতে দিব সোনা
আতর দিব শিশি ভোরে,
গোলাপ দিব কার্চ্চা করে
আর আপনি সেজে বাটা ভোরে
দিব পানের দোনা।

একটি লৌকিক ছড়ার অনুসরণে উপরোক্ত ছড়াটি লেখা, ছড়াটি এই :

আয়রে আয় সোনা
* * *
মাছ কাটলে মুড়ো দোব
ধান ভানলে কুঁড়ো দোব। ইত্যাদি

(৩) গীতি : (ঝুমুরের সঙ্গে তুলনীয়)
কাঁটা বনে তুলতে গেলাম কলঙ্কেরি ফুল
গো সখি কাল কলঙ্কেরি ফুল।
মাথায় পরলেন মালা গেঁথে, কাণে পরলেন দুল।
সখি কলঙ্কেরি ফুল।
মরি মরব কাঁটা ফুটে,
ফুলের মধু খাব লুটে।
খুঁজে বেড়াই কোথায় ফুটে
নবীন মুকুল।

তুলনীয় :

(৪) ছড়া : স্মৃতি শাস্ত্র পড়্‌ব আমি ভট্টাচার্যের পায়ে ধোরে
ধর্মাধর্ম শিখে নিব কোন বেটী বা নিন্দে করে ॥

(৫) গীত : আমার নাম হীরা মালিনী
আমি থাকি রাধার কুঞ্জে আমার ননদিনী।
রাবণ বলে চন্দ্রাবলি
তুমি আমার কমল কলি,
শুনে কীচকে মেরে কৃষ্ণ
উদ্ধারিল যাজ্ঞসেনী।

(৬) ছড়া : বয়স তাহার বছর ষোল
দেখতে শুনতে কালো কালো,
পিলে অগ্রমাসে
আমি তখন থানায় পোড়ে।

(৭) ছড়া : মনের মতন রতন পেলে যতন করি তায়
সাগর ছেঁচে তুলবো নাগর পতন করে কায়।'

(৮) ছড়া : এ ছেলিল বক্‌না গোরু
পর-গোয়ালে জাবনা খেতে

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে একচত্বারিংসপ্তম পরিচ্ছেদে হীরার আয়ির পশ্চাতে বালকের পাল কতকগুলি ছড়া আবৃত্তি করেছিল যার মধ্যে লৌকিক ছড়ারই উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, বঙ্কিমের পাশ্চাত্য মানসিকতার পিছনে যে একটি সদা জাগ্রত লোক-মানস বর্তমান ছিল তা বেশ স্পষ্ট অনুভব করা যায় নিম্নলিখিত কয়েকটি সাহিত্যিক ছড়া থেকে :

৯. ছড়া
হীরার আয়িবুড়ী
গোবরের ঝুড়ি।
হাঁটে গুড়ি গুড়ি,
দাঁতে ভাঙে সুড়ি
কাঁঠাল খায় দেড় কুড়ি।

১০.
রামচরণ দোবে,
সন্ধ্যা বেলা শোবে,
চোর এলে কোথা পালাবে।

১১.
রামদীন পাঁড়ে
বেড়ায় লাঠি ঘাড়ে
চোর দেখলে দৌড় মারে পুকুরের পাড়ে।

১২.
লালচাঁদ সিং
নাচে তিড়িং মিড়িং
ডালরুটির যম, কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম।

এরপর বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, "বালকেরা দ্বারবান্ দিগের দ্বারা নানাবিধ অভিধান—ছড়া শব্দে অভিহিত হইয়া পলায়ন করিল।" (পৃঃ ৩২৯)

লোকসাহিত্যের ছড়া এরূপ অভিধানবহির্ভূত শব্দ দ্বারা পরিকীর্ণ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : "আটঘাট বাঁধা রীতিমতো সাধুভাষার প্রবন্ধের মাঝখানে এই অসংস্কৃত শব্দ ও বাক্য বিন্যাসই ছড়ার বিশেষত্ব, যদিও সেগুলি আটঘাট বাঁধা।

রীতিমতো সাধুভাষার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে দিলে বেমানান হয়ত দেখায় কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই আমাদের লৌকিক মানস আমাদের জ্ঞাতসারে এবং অজ্ঞাতসারে উচ্চতর সাহিত্যের মাঝখানেও ছড়া, প্রবাদ ইত্যাদির ব্যবহার করে ফেলেন।”

ইন্দিরা

ইন্দিরা উপন্যাসের পরিবেশ বাংলা দেশের গ্রাম্যজীবন ও পল্লী প্রকৃতি। স্বাভাবিক ভাবেই সেখানে এসেছে পল্লী প্রকৃতির আচার-আচরণ, ছড়া, প্রবাদ, গীতি ইত্যাদি। পঞ্চম পরিচ্ছেদে ‘বাজিয়ে যাব মল’ অধ্যায়টিতে অমলা ও নির্মলা দুই সখি ছড়ায় যে গীতি রচনা করে নদীর ঘাটে গেয়ে ছিলেন, তার মধ্যে একদিকে লৌকিক মেয়েদের খেলার ছড়ার ভাব যেমন আছে তেমনি তার মধ্যে ছন্দ ও ভাষা ব্যবহারেও ছড়ার পরিচয় আছে। যথা :

অমলা : ধানের ক্ষেতে ঢেউ উঠেছে
বাঁশ তলাতে জল।
আয় আয় সই জল আনিগে
জল আনিগে চল ॥

নির্মলা : ঘাটটি জুড়ে গাছটি বেড়ে
ফুটল ফুলের দল।
আয় আয় সই, জল আনিগে
জল আনিগে চল ॥

অমলা : বিনোদ বেশে মুচকে হেসে,
খুলব হাসির কল
কলসী ধ’রে গরব করে
বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই, জল আনিগে
জল আনিগে চল ॥

নির্মলা : গহনা গায়ে, আলতা পায়ে
কল্কাদার আঁচল

ঢিমে চালে তালে তালে
বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই জল আনিগে
জল আনিগে চল॥

অমলা : যত ছেলে খেলা ফেলে
ফিরচে দলে দলে।
কত বুড়ী জুজু বুড়ী
ধরবে কত জল॥
আমরা মুচকে হেসে, বিনোদ বেশে
বাজিয়ে যাব মল,
আমরা বাজিয়ে যাব মল,
সই বাজিয়ে যাব মল॥

দুই জনে : আয় আয় সই জল আনিগে
জল আনিগে চল।

২. ছড়া : মেয়েটি বড় শ্লোক বলিতে ভালবাসিত, সে আবার বলিল,
"বেশ গো বেশ,
রাঁধ বেশ বাঁধ কেশ
বকুল ফুলের মালা।
রাঙা শাড়ি হাতে হাঁড়ী
রাঁধছে গোয়ালার বালা॥
এমন সময়, বাজল বাঁশী
কদম্বের তলে।
কাঁদিয়ে ছেলে, রান্না ফেলে
রাঁধুনি ছোটে জলে॥"

৩. ছড়া : সুভাষিণীর মেয়ে হেমা অমনই আরম্ভ করিল,
চলে বুড়ী শোণের নুড়ী
খোঁপায় ঘেটুফুল।
হাতে নড়ি গলায় দড়ি
কানে জোড়া দুল। [১ম পরিচ্ছেদ]

৪. ছড়া : সুভাষিণীর মেয়েও বুড়ীকে জ্বালাইল, বলিল,

'বুড়ী পিসী সাজ সাজালে কে ?
যম বলেছে সোনার চাঁদ
এস আমার ঘরে
তাই ঘাটের সহা সাজিয়ে দিলে
সিঁদুরে গোবরে।

৫. ছড়া : শুনিয়া সুভাষিণীর মেয়ে শ্লোক পড়িল—

যে ডাকে যমে।
তার পরমায়ু কমে।
তার মুখে পড়ুক ছাই
বুড়ী মরে যা না ভাই। [ঐ]

৬. যাত্রার ছড়া-সংলাপ :

কামিনী বলিল, 'তুমি যে চিনিবে, বিধাতা কপালে লিখেন নাই, যাত্রায় শোননি ? বলে,

ধবলী বলিল শ্যাম, চেনে তোমারে।
চিনি শুধু কাঁচা ঘাস যমুনার ধারে॥
পদচিহ্ন খুঁজি তব, বংশী শুনে কানে।
ধ্বজা বজ্রাঙ্কুলতায়, গোরা কি তা জানে ? [২১তমপরিঃ]

চন্দ্রশেখর

১. মেয়েলী ছড়া : ঘরে যাব না লো সই
আমার মদনমোহন আসছে ওই।
হায়! যাব না লো সই! [২য় পরিঃ]

২. মেয়েলী সাহিত্যিক ছড়া : স্বামী আমার সোনার মাছি বেড়ায় ফুলে ফুলে
তেকাটাতে এলে সখা, বুঝি পথ ভুলে॥

৩. মেয়েলী সাহিত্যিক ছড়া : কি করিলে প্রাণ সখী, মনচোর ধরিয়ে
ভাসিল পীরিতি-নদী দুই কূল ভরিয়ে।

৪. গীত : আমার মরম কথা তাইলো তাই।
আমার শ্যামের বামে কই সে রাই ?
আমার মেঘের কোলে কই সে চাঁদ ?
মিছে লো পেতেছি পীরীতি—ফাঁদ। [৪র্থ পরিঃ]

উপরোক্ত তিনটি ছড়া ও একটি গীতের বিষয়বস্তু ও বাক্য বিন্যাস লৌকিক ছড়া ও গীতের অনুরূপ। গ্রামের দুইসখী নিজেদের মনের কথা বলছেন। স্বামী তার সোনার মাছি ফুলে ফুলে মধু খেয়ে বেড়ায়, আর সখি বলেছে মন-চোরকে সে পীরিতে-নদীতে ভেসে পড়েছে। গীতের রচনা রীতি ও বিষয়বস্তু—দুই-ই লোকসঙ্গীতের ঝুমুরের পর্যায়ে।

কৃষ্ণকান্তের উইল

১. ছড়া— মনে করি চাঁদা ধরি হাতে দিই পেড়ে
বাবলা গাছে হাত লেগে আঙুল গেল ছিঁড়ে। [৩য় পরিঃ]

দেবী চৌধুরাণী

একটি পরিপূর্ণ লৌকিক ঐতিহ্যের মধ্যেই বঙ্কিম মানসটি সম্পূর্ণভাবে গড়ে উঠেছিল। দেবী চৌধুরাণী উপন্যাসের সামাজিক পটভূমির মধ্যেও অলৌকিকতা, রহস্যময়তার ছাপ আছে। রূপকথার মত অবিশ্বাস্য ঘটনাকে কিভাবে উপন্যাসে রূপ দেওয়া যায় বঙ্কিমচন্দ্রই তার প্রমাণ। আর দেবী চৌধুরাণী উপন্যাস তার উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। উপন্যাসটির কাহিনীর কাঠামো রূপকথার মত। এ ছাড়াও কাহিনীর মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই লৌকিক মানসিকতার স্পষ্টচিহ্ন বর্তমান। উপন্যাসের পঞ্চম পরিচ্ছেদের কিছু সংলাপ উদ্ধৃত করে দিলে এর যাথার্থ প্রমাণিত হবে :

ব্রজ—তা নয়—আমার দুইটি ব্রাহ্মণী আছে জানত ?

ব্রহ্ম—ব্রাহ্মণী ? মা মা মা! যেমন ব্রাহ্মণী নয়ান বৌ, তেমনি ব্রাহ্মণী সাগর বৌ—আমার হাড়টা খেলে কেবল রূপকথা বল—রূপকথা বল—রূপকথা বল। ভাই এত রূপকথা পাব কোথা ?

ব্রজ—রূপকথা থাক্—

ব্রহ্ম—তুমি যেন বল্‌লে থাক, তারা ছাড়ে কই ? শেষে সেই বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর

কথা জান ? বলি শোন, এক বনে বড় একটা শিমুল গাছে এক বিহঙ্গমা বিহঙ্গমী থাকে—

ব্রজ—সর্বনাশ ! ঠাকুরমা, কর কি ? এখন রূপকথা ! আমার কথা শোন !

ব্রহ্ম—তোমার আবার কথা কি ? আমি বলি, রূপকথা শুনিতেই এয়েছ—তোমাদের ত আর কাজ নাই ? [৫ম পরিঃ]

সাগর—ঠান্‌দিদি, একটা রূপকথা বল না।

ব্রহ্ম—কোন্‌টা বল্‌বো, বিহঙ্গম বিহঙ্গমীর কথা বলবো ! একলা শুনবি, তা নুতন বৌটা কোথায় ? তাকে ডাক না—দুজনে শুনবি।

সাগর—সে কোথা, আমি এখন খুঁজতে পারি না। আমি একাই শুন্‌বো। তুমি বল।

ব্রহ্ম ঠাকুরানী তখন সাগরের কাছে শুইয়া বিহঙ্গমের গল্প আরম্ভ করিলেন। সাগর তাহার আরম্ভ হইতে না হইতেই ঘুমাইয়া পড়িল। ব্রহ্মঠাকুরানী সে সংবাদ অনবগত, নারী দুই দণ্ড গল্প চালাইলেন, পরে যখন জানিতে পারিলেন, শ্রোত্রী নিদ্রামগ্না, তখন দুঃখিতচিত্তে মাঝখানেই গল্প সমাপ্ত করিলেন [৬ষ্ঠ পরিঃ]

এ ছাড়া সতীন অভিপ্রায় (step-wife motif) সমস্ত উপন্যাসের একটি মূল বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সুতরাং বলা চলে :

বঙ্কিম উপন্যাসে লোককথা, ব্রতকথা, লোকবিশ্বাস ইত্যাদি কিভাবে কাহিনীর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছে। যেমন :

ভাগ্যবিপর্যস্ত নবকুমারের কাপালিকের হাতে পড়া কাহিনীর সূচনা ও সংঘাত সৃষ্টি করেছে।

জনজীবন বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করাতেই কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে সহজভাবে নিতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবে কাহিনীর পরিণতি হয়েছে ট্র্যাজিক। এখানে কপালকুণ্ডলার ওপরে প্রাকৃতিক প্রভাব (যা পণ্ডিতেরা বলেন) অপেক্ষা লোকবিশ্বাস ও সংস্কার অনেকবেশী ক্রিয়াশীল ছিল।

অর্থাৎ লোকঐতিহ্য ও গ্রাম্যসংস্কার কপালকুণ্ডলার কাহিনী, পরিসমাপ্তি, সংঘাত, সবকিছুকেই নিয়ন্ত্রিত করেছে।

উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বকার আদর্শ পাননি। কারণ ইতিপূর্বে বাংলাসাহিত্যে কোন উপন্যাস রচনাই হয়নি, কেবল কিছু নক্সা জাতীয় সামাজিক রঙ্গব্যঙ্গ ছাড়া। কিন্তু বঙ্কিমের পূর্বথেকেই আমাদের দেশে

তিন ধরনের কথাসাহিত্য গড়ে উঠেছিল। প্রথমতঃ দশকুমার চরিত, কথা-সরিৎ সাগর, কাদম্বরী, স্বপ্নবাসবদত্তা জাতীয় সংস্কৃত ভাষায় কিছু গল্পসংকলন ও দীর্ঘ কাহিনী মূলক আখ্যান জাতীয় রচনা। দ্বিতীয়তঃ লোক প্রচলিত রূপকথা, ব্রতকথা, উপকথা, নীতিকথা, ইতিকথা, পুরাকথা জাতীয় মৌখিক ভাবে প্রবাহিত অসংখ্য লৌকিক কথা ও কাহিনী। তৃতীয়তঃ আধুনিক যুগের আরম্ভে আরবী ফার্সী সাহিত্য থেকে আহৃত কামিনীকুমার, হংসরূপী রাজপুত্র, চকমকির বাক্স প্রভৃতি প্রণয় কিস্সা ও রোমান্স মূলক এ্যাডভেনচারধর্মী কাহিনী। এছাড়াও মধ্যযুগে বাংলাসাহিত্যের বহুল প্রচলিত কাহিনী মূলক মঙ্গলকাব্য গুলির আখ্যান ও সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে রচিত গাথা সাহিত্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির আঙ্গিক বা গঠনরীতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সংস্কৃত সাহিত্যের চেয়ে বাংলার লোককথাগুলি ও আরবী ফার্সী উপাখ্যানগুলিই তাঁকে অধিকতর আকৃষ্ট করেছিল। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের দেহ গঠনের আদর্শগুলি এসেছে মূলতঃ ইংরাজী নাটক, বিশেষ করে সেক্সপীয়র থেকে। সেক্সপীয়রের নাট্যরূপের কৌশল, গল্পবলার ভঙ্গি, কেন্দ্রবদ্ধ রূপ, উপকাহিনীর প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্য, বঙ্কিমচন্দ্রকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু তিনি যে সাক্ষাতভাবে ইংরেজ ঔপন্যাসিক স্কট এর অনুসরণকারী একথা সর্বাংশে সত্য নয়। এই প্রসঙ্গে একজন আধুনিক সমালোচক মন্তব্য করেছেন 'ইংরাজী উপন্যাস বঙ্কিমের মনকে জাগিয়েছে, প্রত্যক্ষ আদর্শ যোগায় নি।'

(বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস : শিল্পরীতি ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, পৃঃ ৩)

সাধারণভাবে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রামমুখীন ছিলেন একথা কোন মতেই অস্বীকার করা যায় না। লোকায়ত জীবন ও জনপদ সম্পর্কেও তাঁর যে গভীর আগ্রহ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় 'বাংলার কৃষক' প্রবন্ধে। সেখানে তিনি বাংলার কৃষক-সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন এবং তাদের অসহায় সামাজিক জীবনকে তুলে ধরেছেন। বাল্য থেকেই তিনি গ্রামকে এবং গ্রামীন মানুষকে উপলব্ধি করেছেন নানাভাবে। লোকসাহিত্য ও লোকায়ত সংস্কৃতির নানা বিষয় ও উপাদান সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন উপন্যাস রচনার সূচনা থেকেই। স্কট ও ডিকেন্সের উপন্যাস পড়ে বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস রচনার প্রেরণা পেলেও তাঁর রচনার প্রথম যুগে তিনি লোকপ্রচলিত বিষয়, নানা লৌকিক গল্প ও কাহিনী, প্রচলিত কিংবদন্তী ইত্যাদিকে বেছে নিয়েছেন। ইতিহাস এবং ইতিহাসআশ্রিত কাহিনীর সঙ্গে এই সব উপাদানের নানা মোটিফকে তিনি বিভিন্ন

জায়গায় যুক্ত করেছেন। কিন্তু উপন্যাসের ক্ষেত্রে যতই তিনি দৃঢ়তা অর্জন করেছেন ততই তিনি লৌকিক উপাদানগুলিকে বেশী পরিত্যাগ করে ইতিহাস ও বাস্তব উপাদানের মধ্যেই আশ্রয় খুঁজেছেন।

বঙ্কিম উপন্যাসের মধ্যে যে সব লৌকিক Motif কাজ করছে তার একটা তালিকা উপস্থিত করা যেতে পারে। বিশিষ্ট লোক সংস্কৃতিবিদ অধ্যাপক ষ্টিথ টমসন পৃথিবীর তাবৎ লোককথাগুলিকে এদের অভিপ্রায় (Motif) অনুযায়ী পুনর্বিভাগ করেন। তিনি A—Z পর্যন্ত পৌরাণিক অভিপ্রায় থেকে শুরু করে Animal, tabu. Magic, the Dead, Marvel, Tests, wise and witch, Orgies বা রাক্ষস, পণ্ডিত ও মূর্খ, Deception বা প্রতারণা, Reversal or Fortune বা ভাগ্য বিপর্যয়, Chance and Fate, Humour বা হাস্যরস ইত্যাদি নানা অভিপ্রায় বা মোটিফকে বিভক্ত করেন। ইতিপূর্বে Aarne Taompson Index of tale types এ লোককথা গুলিকে টাইপ অনুযায়ী তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছিলো।

প্রথমতঃ পশুপক্ষীর কথা বা animal tales-এর অন্তর্গত বন্যপশু, গৃহপালিত পশু, মানুষ ও বন্য পশু, ইত্যাদি উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ সাধারণ লোককথা বা general Folk tales এর অন্তর্ভুক্ত। উপবিভাগগুলি যথাক্রমে দৈব বিড়ম্বনা, দৈব অথবা অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন স্ত্রী-স্বামী বা অন্যান্য আত্মীয়, অলৌকিক কর্তব্য পালন, দৈব সহায়ক, ঐন্দ্রজালিক বস্তু, অলৌকিক শক্তি কিংবা অলৌকিক জ্ঞান, বিবিধ অলৌকিক কাহিনী, ধর্মীয় কাহিনী, রোমান্টিক কথা, বুদ্ধিহীন রাক্ষসের কাহিনী।

তৃতীয়তঃ হাস্যরসাত্মক ও অন্যান্য ছোট-খাটো ঘটনা মূলক কাহিনী (and Anecdotes) যেমন বোকার গল্প, মিথ্যা কথার গল্প, সমস্যামূলক নারী-পুরুষ বিষয়ক গল্প, এগুলিকে সাধারণতঃ type index বলা হয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের বহু উপন্যাসের মধ্যেই এই সব লৌকিক মোটিফের সন্ধান পাওয়া যায়, যথা ম্যাজিক, দৈব বা অলৌকিকতা, অদৃষ্টবাদ অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন স্ত্রী—এ সমস্তই কেবলমাত্র একটি উপন্যাস কপালকুণ্ডলাতেই পাওয়া যায়। এ ছাড়া দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসের মধ্যে আছে সপত্নী বিদ্বেষ, হঠাৎ অর্থলাভ, রঘু ডাকাত রসদৃপ্ত জনকল্যাণ মূলক ডাকাতি ইত্যাদি মোটিফ। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসেও ছড়িয়ে আছে এ ধরণের অজস্র লৌকিক উপাদান যা বঙ্কিমকে উপন্যাসের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করতে হয়েছিল। এ দেশীয় লৌকিক উপাদান ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র

গ্রহণ করেছিলেন আরব্য-পারস্য রজনী ও বিবিধ ফারসী কিস্‌সার নানা কাহিনী ও বিচিত্র লৌকিক গল্প উপাদান। 'হারেমে গোপন প্রণয়'—আরব্য উপন্যাস ও নানা ফারসী কিস্‌সার একটি প্রধানতম 'মোটিফ'। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, উপন্যাসে বিমলা-বীরেন্দ্র সিংহ, ওসমান-আয়েষা, জগৎসিংহ-তিলোত্তমা-আয়েষা, কপালকুণ্ডলায় নবকুমার-মতি, কিংবা রাজসিংহ উপন্যাসে জেবুন্নিসা-মোবারক-চন্দ্রশেখর উপন্যাসের শৈবালিনী-প্রতাপ ইত্যাদি প্রণয়োপাখ্যান গুলিতে এই বিদেশীয় লোককথার মোটিফগুলি লক্ষ্য করা যায়।

আধুনিক উপন্যাস বা ছোটগল্পের জন্মকালের বহু পূর্ব থেকেই নানা ধরনের লৌকিক গল্পকাহিনী মৌখিকভাবে প্রচারিত ছিল। রূপকথা—উপকথার বাইরে ছিল এদের অস্তিত্ব। এইসব লৌকিক গল্পকাহিনীগুলি বয়স্ক শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করত। এসব গল্পে ভুতুড়ে বিষয়, ডাকাতির কাহিনী, প্রেম রোমান্স, দৈবদুর্ঘটনা, দেবতা মানুষের মিলিত কাহিনীই স্থান পেত। আজগুবি, রঙ্গ রসিকতা, অলৌকিক গ্রাম্য কথায় ভরপুর থাকত এইসব কাহিনীগুলি। বঙ্কিমের মার্জিত শিল্পচেতনা এগুলিকে উপাদান হিসেবে গ্রহণ করতে সঙ্কুচিত থাকলেও কোন কোন গল্পকাহিনীতে তিনি এইসব লৌকিক গল্প রীতিকে গ্রহণ করেছিলেন। 'স্বর্ণ গোলক' গল্পটির ভিত্তি এই আজগুবি ভাবনা ও কাল্পনিক গ্রাম্য রঙ্গ রসিকতা। 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত', অন্য জাতীয় রচনা হলেও এর পেছনেও লৌকিক আজগুবি গল্পকথা প্রেরণা স্বরূপ কাজ করেছে। একটা জিনিষ লক্ষ্য করার বিষয়, বঙ্কিমচন্দ্র অধিকাংশ উপন্যাসে যে উপাদানগুলি বারবার ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে অনেকগুলিই লৌকিক উপাদান। যেমন (১) গান, (২) ছড়া, (৩) স্বপ্ন, (৪) অতিলৌকিক সঙ্কেত (৫) জ্যোতিষীর গণনা, (৬) সন্ন্যাসী মহাপুরুষের আবির্ভাব (৭) ডাকাতি (৮) হঠাৎ ধনলাভ (৯) পত্র (১০) উইল। এর মধ্যে শেষ দুটি বাদ দিলে অন্যান্যগুলি লৌকিক উপাদান বা লোককথার মোটিফ।

সুতরাং বলা যেতে পারে বঙ্কিম উপন্যাসে রচনার বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকগত দিক থেকে দেশজ, গ্রাম্য লোকায়ত বিভিন্ন বিষয় নানা ভাবেই ব্যবহার করেছিলেন।

রমেশচন্দ্র দত্ত

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ইতিহাসে রমেশচন্দ্রদত্তের একটী বিশিষ্ট ভূমিকা সকলেই স্বীকার করে থাকেন। পেশায় সিভিলিয়ান হলেও ভারতবর্ষের অর্থনীতি সংস্কৃতি, ইতিহাস সমস্ত বিষয়েই ছিল তাঁর সমান আগ্রহ। রমেশচন্দ্রের পরিবারের

অনেকেই ছিলেন ইংরাজীনবীশ কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয়, এই বংশের কৃতি সন্তানগণ এ দেশের সংস্কৃতিকে কোনদিন অবহেলা করেন নি। বিলাতে শিক্ষাদীক্ষা হওয়া সত্ত্বেও মনের গভীরে তাঁরা ছিলেন এক একজন যথার্থ ভারতীয় এবং খাঁটি বাঙালী। উচ্চ রাজকার্যে যুক্ত থাকা কালেই ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে অগ্রজ যোগেশচন্দ্রকে তিনি একটি পত্রে লিখছেন: I did not think of an appointment in the India council, but of a readership in Indian History, or in Sanskrit in Cambridge, Oxford or London, if my 'History of India' makes a name for itslf. Anything which will give me a position and some little income over and abvove my pension and will enable me to organise an Indian party to represent Indian rights in England and Parliament. এর থেকেই বোঝা যায় ইংরেজী কেতায় মানুষ হলেও ইংরাজের দেওয়া উচ্চপদে চাকুরী করলেও আসলে তিনি ছিলেন খাঁটী দেশীয় মানুষ। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মডার্ণ রিভিয়্যুর জানুয়ারী সংখ্যায় ভগিনী নিবেদিতা একটী দীর্ঘ সম্পাদকীয়তে বলেছিলেন :···unassuming' simple, generous to a fault his expression might be modern, but his greatness within was ancient greatness. Romesh chandra Dutta was a man of his own people. The object of all he ever did was not his own fame, but the uplifting of India. ভগিনী নিবেদিতারই লেখার প্রতিধ্বনি পাই তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে। একদিকে 'বঙ্গবিজেতা' 'মাধবীকঙ্কন' 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত' ও 'রাজপুত জীবন সন্ধ্যা' উপন্যাস যা জাতীয় ইতিহাস ও ভারতীয় সংস্কৃতির নানা উপাদানে সমৃদ্ধতর হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে 'সংসার' ও 'সমাজ', বাংলা দেশের পল্লীজীবনের লোকায়ত সংস্কৃতির নানা উপাদানে যা রসসিক্ত। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর ভাষায়: 'সংসার ও সমাজে রমেশচন্দ্র ইতিহাসের কোলাহল হইতে শান্ত পল্লীর সৌন্দর্যের মধ্যে, আমাদের পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষুদ্র সুখ দুঃখের কথায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। এই দুইখানি উপন্যাসে তিনি নূতন শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কল্পনা এতদিন ইতিহাসের সুবিশাল ক্ষেত্রে স্মরণীয় ঘটনা সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; সমাজ ও পরিবারের ক্ষুদ্র ব্যাপার লক্ষ্য করিতে তিনি অবসর পান নাই কিন্তু তাঁহার শেষ উপন্যাসদ্বয়ে তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করিয়াছেন যে ইতিহাসের বিশাল ও সমাজের সঙ্কীর্ণ এই উভয় ক্ষেত্রেই

তাঁহার তুল্য অধিকার ও সমান শক্তি আছে" (পৃঃ ৪৭—বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)। এ প্রসঙ্গে 'সংসার' উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের তালপুকুর গ্রামের একটি কুটির বর্ণনার মধ্য দিয়ে রমেশচন্দ্রের লোকায়ত জীবন ও জনপদ সম্পর্কে তাঁর সহজাত জ্ঞান ও বর্ণনাভঙ্গির সার্থক পরিচয় মেলে। যথা: "সেই তালপুকুর গ্রামে একটি সুন্দর পরিষ্কার ক্ষুদ্র কুটীর দেখা যাইতেছে। চারিদিকে বাঁশঝাড় ও আম কাঁঠাল প্রভৃতি দুই একটি ফলবৃক্ষ ছায়া করিয়া রাখিয়াছে। বাহিরে বসিবার একখানি ঘর, সেটী ছায়ায় শীতল এবং তাহার নিকটে ৫/৬টি নারিকেল বৃক্ষে ডাব হইয়াছে। সেই ঘরের পশ্চাতে ভিতর বাড়ীর উঠান, তথায়ও বৃক্ষের ছায়া পড়িয়াছে। উঠানের একপার্শ্বে একটি মাচানের উপর লাউ গাছে লাউ হইয়াছে, অপরদিকে কাঁটাগাছ ও জঙ্গল।" লোকায়ত গ্রাম্য প্রকৃতি ছাড়াও গ্রাম্য মানুষ ও লৌকিক গ্রাম্য মানসিকতা সম্পর্কেও তাঁর অভিজ্ঞতা ছিল প্রচুর। তাঁর উপন্যাসে এ সম্পর্কে প্রচুর উপাদান বিদ্যমান। যথা: "বিন্দুর মা দেখিলেন তালপুকুরের লোক অনেক সদ্‌গুণ বিশিষ্ট বটে। নিঃস্বার্থ হইয়া পরের বাড়ী কি রান্না হইতেছে, প্রত্যহ তাহার খবর রাখেন; পরের বৌ-ঝি কি করিতেছে, তাহার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান রাখেন: ঘরে ঘরে গ্রামে সে বৈজ্ঞানিক সংবাদ প্রচার করিবার জন্য নিঃসার্থ যত্ন করেন;"—এ সমস্ত উদ্ধৃতি থেকে একথা স্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে রমেশচন্দ্র ইংরাজী শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত হয়ে সরকারী উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থেকেও লোকায়ত গ্রাম্যজীবন ও জনপথ এবং সংস্কৃতিকে তুচ্ছজ্ঞান করেননি। গ্রাম্য প্রবাদ, প্রবচন, ছড়া, মেলা, উৎসব, পালপার্বণ সমস্ত কিছুরই সঙ্গেই তাঁর প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিল। তাঁর উপন্যাস গুলির মধ্যে এধরনের গ্রাম্যজীবন ও লৌকিক সংস্কৃতির বিবিধ উপাদান সংমিশ্রিত হয়ে আছে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় গ্রাম্য লৌকিক মেলা সম্পর্কেও যে তার কত আগ্রহ ছিল 'সংসার' উপন্যাসের একটি সংলাপে তা অতি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। যথা:

বিন্দু—"মা, উমাতারা কোন মেলায় গিয়েছিল? সুন্দর সুন্দর পুতুল এনেছিল, একটা কাঠের ঘোড়া এনেছিল, আর একটা মাটীর সিংহ এনেছিল, আর একটা কেমন কল এনেছিল, সেটা ঘোরে। সে সব কোথা থেকে এনেছিল মা?"

মাতা—"তা জানিসনি? ঐ ওরা যে অগ্রদ্বীপের মেলায় গিয়েছিল। সেখানে বছর বছর ভারি মেলা হয়, কত হাজার হাজার লোক যায়, বৈষ্ণব খাওয়ান হয়, কত গান বাজনা হয়, কত দেশের লোক সেখানে যায়।"

বিন্দু—"মা তুমি কখনও সেখানে গিয়েছিলে?"

মাতা—"গিয়েছিলাম বাছা, যখন আমি ছোট ছিলাম, একবার আমার বাপ মা গিয়েছিলেন, আমরা বাড়ীশুদ্ধ গিয়েছিলাম, সেখানে তিন চারদিন ছিলাম, একটা গাছতলায় বাসা করে ছিলাম।',

বিন্দু—"কেন ঘর ছিল না? গাছতলায় বাসা করেছিলে কেন মা?"

মাতা—"সেখানে কত হাজার হাজার লোক যায়, ঘর কোথায়? সকলেই গাছতলায় বাসা করে। একটা ভারি আঁব বাগান আছে, তাহার নীচে মেলা হয়, কত রাজ্যের দোকান পসারি আসে, কত দেশের জিনিস বিক্রি হয়।"

উপরোক্ত মাতা-কন্যার সংলাপের মধ্য দিয়ে বাংলা দেশের লৌকিক মেলার যে রূপ ও চরিত্রটি ফুটে উঠেছে তার থেকে রমেশচন্দ্রের বাংলা দেশ, লোকায়ত জীবন, লৌকিক সংস্কৃতিক সম্পর্কে যে নিখুঁত পরিচয় ছিল তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রাম্য মেলায় যে লোকশিল্পের পসরায় ভর্তি থাকে, গ্রাম্য মেলা যে উন্মুক্ত প্রাকৃতিক পরিবেশে হাজার হাজার লোকায়ত গ্রাম্য মানুষেরই মিলন উপরোক্ত সংলাপ বর্ণায় তা সার্থক ভাবে ফুটে উঠেছে।

রমেশচন্দ্রের 'সমাজ' উপন্যাসএর শুরু হয়েছে একটি লৌকিক ছেলে ভুলানো ছড়া দিয়ে। ছড়া প্রত্যেক দেশের লোক সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। শিশু, শিশুর ধাত্রী, মাতা, কন্যা, ঠাকুমা, দিদিমা, অর্থাৎ শিশু থেকে বর্ষীয়ান নরনারী এ ছড়ার রচয়িতা। মুখে মুখে যৌথ ভাবে এর রচনা ও প্রচার হয়ে থাকে। ছড়ার সঙ্গে লোকগীতির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও প্রধান পার্থক্য এই যে ছড়ামূলতঃ আবৃত্তি করা যায়, লোকগীতি সুর সহযোগে গীত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বলেছেন যে বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান ছড়াটি তাঁর কাছে বাল্যকালে মোহমন্ত্রের মত ছিল। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন:

"বুঝিতে পারি না, কেন এত মহাকাব্য এবং খণ্ড কাব্য এত, তত্ত্বকথা এবং নীতি প্রচার, মানবের এত প্রাণপণ প্রযত্ন, এত গলদঘর্ম ব্যায়াম প্রতিদিন ব্যর্থ এবং বিস্মিত হইতেছে অথচ এই সকল অসঙ্গত অর্থহীন যদৃচ্ছাকৃত শ্লোকগুলি লোকস্মৃতিতে চিরকাল প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে।" রবীন্দ্রনাথের মতে ছেলে ভুলানো ছড়াগুলি মেঘের সঙ্গে তুলনীয়। কারণ উভয়েই পরিবর্তনশীল বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছা ভাসমান। বন্ধনহীন মেঘ যেমন আপন লঘুত্ব ও বন্ধন হীনতার গুণে বারিধারায় শিশুশস্যকে প্রাণ দান করছে, সেরকম ছড়াগুলিও

স্নেহরসে বিগলিত হয়ে কল্পনা দৃষ্টিতে শিশু হৃদয়কে উর্বর করে তুলছে। 'সমাজ" উপন্যাসের সূচনাতেই মাতা ও শিশুর সংলাপের মধ্য দিয়ে যে ছড়াটি উপস্থিত করেছেন তার মধ্যে মাতা ও শিশুর ক্রীড়া কৌতুকের ব্যাপারটি সুপরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। লৌকিক ও প্রচলিত ছড়াটি রমেশচন্দ্রের হাতে পড়ে আরো রমণীয় হয়ে উঠেছে এবং উপন্যাসের সূচনায় সেটিকে স্থাপিত করে গ্রাম্য সমাজ জীবনের সুখ ও শান্তির নীড় ছোট ছোট গ্রামগুলির একটি স্নেহ বাৎসল্যের মাধুর্য মূর্তি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

ছড়াটি এই :

মাতা। তাই-তাই-তাই
শিশু। তাই-তাই-তাই
মাতা। মামার বাড়ী যাই।
শিশু। মামা বালি দাই।
মাতা। তাই-তাই-তাই।
শিশু। তাই তাই তাই।
মাতা। মাসীর বাড়ী যাই।
শিশু। মাতি বালি দাই।
মাতা। মাসী নেবে কোলে।
শিশু। মাতি নেবে তোলে।
মাতা। সন্দেশ দেবে গালে।
শিশু। তন্দে দেবে দালে।

মাতা। ক্ষীর দেবে পাতে।
শিশু। খি দেবে পাতে।
মাতা। চিনি দেবে হাতে।
শিশু। তিনি দেবে হাতে।
মাতা। বাবা আসবেন ঘরে।
শিশু। বাবা আবে দলে।
মাতা। খোকা নেবে কোলে
শিশু। গা গা নেবে কোলে
মাতা। হার দেবে গলে।
শিশু। হা দেবে দলে।
মাতা। চুমো দেবে গালে।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে 'সংসার ও সমাজে' তিনি পল্লীগ্রামের পারিবারিক জীবনের এমন একটি সুন্দর রসপূর্ণ সহানুভূতি মূলক চিত্র দিয়েছেন, যাহা বঙ্গ সাহিত্যে নিতান্ত সুলভ নহে। প্রথম দৃষ্টিতে ইহার মধ্যে কিছু বিশেষত্ব দেখা যায় না, কোনরূপ উচ্চাঙ্গের সৃজনীশক্তি, উচ্চস্তরের সমালোচনা লক্ষ্য হয় না। মনে হয় যেন সমস্ত কেবল বাস্তব বর্ণনা পল্লী সমাজের নিখুঁত ফটোগ্রাফ মাত্র।

(পৃঃ ৪৭ বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা)

সুতরাং বলা চলে পল্লী সমাজের এই নিখুঁত ফটোগ্রাফের সূত্রেই লোকায়ত জীবন ও জনপদের রূপ তার উপন্যাসকে যেমন বিচিত্র ভাবে প্রকাশিত তেমনি ভাবেই এসেছে নানা বিচিত্র লৌকিক উপাদান।

ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে সর্বপ্রথম কল্পনা সংবলিত, ভৌতিক ও মানবীয় ঘটনার যদৃচ্ছ সংমিশ্রণে কৌতুককর কাহিনী-প্রবর্তনের কৃতিত্ব ত্রৈলোক্য নাথ মুখোপাধ্যায়-এর। তার রচনার মধ্যে কঙ্কাবতী, মুক্তামালা ও ডমরুচরিত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ঘটনার সংমিশ্রণে নৈসর্গিক ও অনৈসর্গিক বিষয়বস্তুকে একত্রিত করে অলৌকিক বিষয়ের পরিবেশনের ক্ষেত্রে তিনি অনন্য কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। লৌকিক কুসংস্কার ও লৌকিক বিশ্বাসসমূহের বিবরণ তিনি জানতেন, এবং সেগুলির মধ্যেও যে বাস্তব মনস্তত্ত্বের কার্যকারণ সংমিশ্রিত করে কৌতুকরস উৎপাদন করে পরিবেশন করা যায় তাঁর রচনাগুলি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভূত, প্রেত, যক্ষ, পিশাচ, জীনপরী প্রভৃতি অলৌকিক-জীবের কল্পনায় তাঁর মন কানায় কানায় পূর্ণ ছিল, এগুলিকে তিনি যে কোন একটি উপলক্ষ্যে বাস্তবজীবন ও ঘটনার সঙ্গে একত্রিত করে দিয়েছেন, তাই তাঁর ভূত-প্রেত প্রভৃতি চরিত্রগুলি ঠিক ভূতের, ঠিক প্রেতের মতই আচার আচরণ করে মানবচরিত্রের আবির্ভাবেও কোন পরিবর্তন হয় না। সাধারণ বাঙালীর সংস্কারের সঙ্গে ভৌতিক আচরণকে সংমিশ্রিত করে ব্যঙ্গ ও কৌতুকের এক অপূর্ব বস্তু নির্মাণ করেছেন। গবেষকের ভাষায়: "যে মানস প্রতিবেশ রূপকথার জন্ম ও সাধারণ জীবনের সহিত নূতন সংশ্লেষে মিলাইয়াছে।'

বাঙলার লোকসাহিত্যের রূপকথা ও উপকথাগুলি ত্রৈলক্যনাথকে যে কিরূপ প্রভাবিত করেছিলো তাঁর রচিত উপন্যাস ও গল্পগুলি তার প্রমাণ। এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও 'কঙ্কাবতী' প্রসঙ্গে বলেছেন, "গল্পটি দুই ভাগে বিভক্ত, প্রথম ভাগে প্রকৃত ঘটনা এবং দ্বিতীয় ভাগে অসম্ভব অমূলক অদ্ভুত রসের কথা, এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভালো করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। অসম্ভবের রাজ্যে যেখানে কোন বাঁধানিয়ম, কোন চিহ্নিত রাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছা-বিহারিণী কল্পনাকে একটি নিগুঢ় নিয়মপথে পরিচালনা করিতে গুণাপনা চাই", 'কঙ্কাবতী' উপন্যাসের প্রথমভাগেই কঙ্কাবতীর রূপকথাটি উপস্থিত করেছেন। "কঙ্কাবতীকে সকলেই জানেন। ছেলেবেলায় কঙ্কাবতীর কথা সকলেই শুনিয়াছেন।

কঙ্কাবতীর ভাই একটি আঁব আনিয়াছিলেন। আঁবটি ঘরে রাখিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন,—'আমার আঁবটি কেহ খায় না, যে খাইবে, আমি

তাহাকে বিবাহ করিব।' কঙ্কাবতী সেকথা জানিতেন না। ছেলেমানুষ! অত বুঝিতে পারেন নাই, আঁবটি তিনি খাইয়াছিলেন। সেজন্য ভাই বলিলেন,—'আমি কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিব।' পিতা মাতা সকলেই বুঝাইলেন,—'ভাই হইয়া কি ভগ্নিকে বিবাহ করিতে আছে?' কিন্তু কাহারও কথা তিনি শুনিলেন না। তিনি বলিলেন,—'কঙ্কাবতী আমার আঁব খাইল কেন? আমি নিশ্চয় কঙ্কাবতীকে বিবাহ করিব।' কঙ্কাবতীর বড় লজ্জা হইল, মনে বড় দুঃখ হইল। নিরুপায় হইয়া তিনি একখানি নৌকা গড়িলেন। নৌকাখানিতে বসিয়া খিড়কি পুকুরের মাঝখানে ভাসিয়া যাইলেন। ভাই আর তাঁহাকে বিবাহ করিতে পারিলেন না।

তারপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কুসুমঘাটী গ্রামের বর্ণনা দিতে গিয়ে পরিবেশন রচনার জন্যে বলছেন: 'একে বন্যদেশ তাতে আবার এইরূপ শত শত অপঘাত মৃত্যু! সেস্থানে ভূতের অভাব হইতে পারে না। অশ্বত্থ, বট, বেল প্রভৃতি নানা গাছে নানাপ্রকার ভূত বসিয়া আছে, সেখানকার লোকের এইরূপ বিশ্বাস।' নানারকম অলৌকিক বিশ্বাস ও কুসংস্কার আছে গ্রামীণলৌকিক জীবনে। কুসুমঘাটী গ্রামে ভৌতিক বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ডাইনী, জটেবুড়ী, অলৌকিক বাঘ ইত্যাদি নানাশ্রেণীর লৌকিক কুসংস্কার প্রচলিত আছে। লেখক তারও—পরিচয় দিয়েছেন।

(ক) 'হাঙ্গর কুম্ভীর নাই সত্য, কিন্তু নদীটি অন্য ভয়ে পরিপূর্ণ। শিকল হাতে জটে বুড়ি' ত আছেই, তাছাড়া নদীর ভিতর জীবন্ত পাথরও অনেক। সুবিধা পাইলে এই পাথর মনুষ্যের বুকে চাপিয়া বসে। নদীর ভিতরও এইরূপ নানা বিপদের ভয়।'

(খ) 'গ্রামে ডাইনীরও অপ্রতুল নাই। পিতামহী-মাতামহীগণ বালক-বালিকাদিগকে সাবধান করিয়া দেন, "ডাইনীরা পথে 'কুটা' হইয়া পড়িয়া থাকে, সে তৃণ যেন মাড়াইও না, তাহা হইলে ডাইনীতে খাইবে।'

(গ) 'এক একটি বাঘ—কিন্তু এমনি চতুর যে, কেহ তাহাকে মারিতে পারে না। লোকে বলে যে, সে প্রকৃত বাঘ নয়,—সে মনুষ্য। বনে একপ্রকার শিকড় আছে, তাহা মাথায় পরিলে মনুষ্য তৎক্ষণাৎ ব্যাঘ্রের রূপ ধরিতে পারে। কাহারও সহিত কাহারও বিবাদ থাকিলে, লোকে সেই শিকড়টি মাথায় পরিয়া বাঘ হয়, বাঘ হইয়া আপনার শত্রুকে নাশ করে। তাহার পর আবার শিকড় খুলিয়া মানুষ হয়। কেহ কেহ শিকড় খুলিয়া ফেলিতে পারে না।

কঙ্কবতী উপন্যাসের দ্বিতীয়ভাগে বাস্তব কাহিনীর সঙ্গে একটি পরিপূর্ণ রূপকথাকে উপস্থিত করা হয়েছে ছড়ায় এবং কাহিনীতে। এ অংশের কিছু উদ্ধৃতি উপস্থিত করা যেতে পারে। যথা:

'প্রথমে বড় ভগ্নী ঘাটের দিকে দৌড়িলেন। ঘাটে আসিয়া দেখেন না, কঙ্কাবতী একখানি নৌকার উপর চড়িয়া নদীর মাঝখানে যাইতেছেন। কঙ্কাবতীর ভগ্নী বলিলেন,—

"কঙ্কাবতী বোন আমার, ঘরে ফিরে এস না?
বড়দিদি হই আমি, ভাল কি আর বাসনা?
তিন ভগ্নী আছি দিদি, দুইটি বিধবা তার।
কঙ্কাবতী তুমি ছোট, বড় আদরের মা'র।"

নৌকায় বাসয়া বসিয়া কঙ্কাবতী উত্তর করিলেন,—

"শুনিয়াছি আছে না-কি জলের ভিতর।
শান্তিময় সুখময় সুশীতল ঘর।
সেইখানে যাই দিদি পুজি তোমার পা।
এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি সুথু যা।"

এই কথা বলিতেই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি আরও গভীর জলে ভাসিয়া গেল। তখন ভাই আসিয়া কঙ্কাবতীকে বলিলেন,—

"কঙ্কাবতী ঘরে এস, কুলেতে দিও না কালি।
রেগেছেন বাবা বড়, দিবেন কতই গালি।
বালিকা অবুঝ তুমি, কি জান সংসার কথা?
ঘরে ফিরে এস, দিও না বাপের মনে ব্যথা।"

এরপর মা, বাবা সকলেই কঙ্কাবতীকে অনুরোধ জানালেন, কত মিনতি করলো। কিন্তু কঙ্কাবতীর উত্তর—

টাকাকড়ি কাজ নাই বসন ভূষণ।
আগুনে পুড়িছে পিতা শরীর এখন।
এ দারুণ যাতনা পিতা আর সহে না।
এই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি ডুবে যা।"

এই বলিতেই কঙ্কাবতীর নৌকাখানি নদীর জলে টুপ করিয়া ডুবিয়া গেল।"

তারপর কঙ্কাবতী মাছেদের রাজ্যে উপস্থিত হল। মাছেরা তাকে রানী

করবে বলে অনুরোধ করলো এবং রাজবেশের জন্যে—"কঙ্কাবতী করেন কি? সকলের অনুরোধে তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। কাঁকড়া মহাশয় আগে, কঙ্কাবতী মাঝখানে, কচ্ছপ পশ্চাতে, এইরূপে তিনজনে যাইতে লাগিলেন। প্রথম অনেক দুর জল পথে যাইলেন, তাহার পর অনেক দুর স্থল পথে যাইলেন। পাহাড় পর্ব্বত, বন, জঙ্গল অতিক্রম করিয়া অবশেষে বুড়ো দরজীর বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন।"

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'ইহা রূপকথা, স্বপ্ন নহে, স্বপ্নের ন্যায় সৃষ্টি ছাড়া বটে, কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন নহে, বরাবর একটি গল্পের সূত্র চলিয়া গিয়াছে।" ভূতের বিবাহের একটি বিচিত্র বর্ণনা। 'ঘঁ্যাঘোঁর সহিত বিবাহের কথা উপস্থিত হইলে, নাকেশ্বরীর মাসী পাত্র দেখিতে একটি ভূত পাঠাইয়া দিলেন।

ঘঁ্যাঘোঁর বাড়িতে সেই ভূত উপস্থিত হইলে, ঘঁ্যাঘোঁ তাহার বিশেষ সমাদার করিলেন। আহারাদি প্রস্তুত হইলে, তিনি নিকটস্থ একটি বিলের জলে স্নান করিতে যাইলেন।"

ত্রৈলোক্যনাথ যেখানে ভৌতিক জগতে প্রায়শই উদ্দেশ্যহীন পদচারণা করেছেন, রাজশেখর বসু সেখানে রসাল ও ব্যঙ্গ সমৃদ্ধ করে সেই ভৌতিক জীবনকে পরিচালনা করেছেন। রাজশেখর বসুর 'ভূশণ্ডীর মাঠে' গল্পটিতে ভৌতিক জগতের অলৌকিক রসের সঙ্গে বাস্তব হাস্যরসের ফুলঝুড়ি ছড়িয়েছেন। মানব জীবনের সনাতন প্রবৃত্তিগুলি যে মৃত্যুর পর ভৌতিক জগতেও আলোড়ন তুলতে পারে, এক স্বামী-স্ত্রীর পক্ষে পারিবারিক শান্তি রক্ষা যেখানে বাস্তব জীবনে অসম্ভব, সে অবস্থায় ভৌতিক জীবনে যে কি বিপর্যয়ের সৃষ্টি হতে পারে এ গল্পটিতে তাকেই ব্যঙ্গাত্মকভাবে উপস্থিত করা হয়েছে 'এই প্রেত জীবনে মনুষ্য জীবনেরই প্রতিচ্ছবি —কেবল মনুষ্য জীবনের মধ্যাকর্ষণ প্রভাবমুক্ত। এই প্রেতলোক রোমাঞ্চকর বিভীষিকা বর্জিত, মনুষ্যালোকের প্রতিবাসী ও তাহার রঙ্গ-ভঙ্গ ও কৌতুক লীলার সহচর।"

তারাশঙ্কর

তারাশঙ্করের মানসিকতায় গ্রাম্যজীবন ও গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রভাব ও প্রতিপত্তি। গ্রাম্য মানুষ, তাদের রীতিনীতি, আচারব্যবহার, পূজাপার্বণ, সংস্কার কুসংস্কার, ছড়া, প্রবাদ, গানে পরিপূর্ণ তারাশঙ্করের সমগ্র সাহিত্য। বাংলা

উপন্যাসের ক্ষেত্রে লৌকিক প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদিদের ক্ষেত্রে যেমন অন্তঃসলিলা গুপ্তপ্রায় ফল্গুধারার মত তারাশঙ্করে ঠিক তার বিপরীত। লৌকিক মানসিকতা তারাশঙ্করের জীবনসম্পৃক্ত। লৌকিক ঐতিহ্যের মধ্যে গড়ে উঠেছে তারাশঙ্করের জীবনদর্শন। তাই গ্রাম্যজীবনও গ্রামীণ সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে তারাশঙ্করের ভাবমানসিকতাটিকে বোঝা সম্ভবপর নয়। গণদেবতা পঞ্চগ্রাম থেকে শুরু করে কবি, হাঁসুলিবাঁকের উপকথা, রাধা পর্যন্ত তাঁর সাহিত্য কর্মের মধ্যে অবাধে প্রবাহিত হয়ে চলেছে গ্রামীণ লৌকিক ঐতিহ্যের ধারা। তারাশঙ্করের উপন্যাসগুলি বিচার করলে এর যাথার্থ সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

গণদেবতা

গণদেবতার পূর্ব নাম ছিল চণ্ডীমণ্ডপ। লেখকের ভাষায় 'গণদেবতা বইখানি ভারতবর্ষে ধারাবাহিক বাহির হইতেছে, এটি তাহার অংশবিশেষ,—চণ্ডীমণ্ডপ নামাঙ্কিত অংশ।" [গণদেবতা, প্রথম সংস্করণের নিবেদন]

বাংলাদেশের গ্রামে চণ্ডীমণ্ডপ বঙ্গসংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র। তারাশঙ্কর গ্রাম্য চণ্ডীমণ্ডপের ছায়াতলে প্রতিপালিত। 'গণদেবতা উপাখ্যানে গ্রাম্য লৌকিক সংস্কৃতির পীঠস্থান চণ্ডীমণ্ডপের স্মৃতিচারণ। "বহুকাল পর চণ্ডীমণ্ডপের আটচালাটা আবার আলোকোজ্জ্বল হইয়া গ্রাম্য-মজলিসে জমিয়া উঠিল। ত্রিশ বৎসর পূর্বেও এই আটচালা ও চণ্ডীমণ্ডপ এমনিভাবে নিত্য সন্ধ্যায় জমজমাট হইয়া উঠিত। গ্রাম্য বিচার হইত, সংকীর্তন হইত, পাশা দাবাও চলিত, গ্রামখানির শলাপরামর্শের কেন্দ্রস্থল ছিল এই চণ্ডীমণ্ডপ ও আটচালা, গ্রামে কাহারও কোন কুটুম্ব স্বজন আসিলে এই চণ্ডীমণ্ডপেই বসানো হইত। ক্রিয়া কর্ম-অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ সবই এইখানে অনুষ্ঠিত হইত। কাল গতিকে ধুলার অবলেপনে অবলুপ্ত প্রায় বহু বসুধারার চিহ্ন এখনও শিবমন্দিরের দেওয়ালে এবং চণ্ডীমণ্ডপের থামের গায়ে অঙ্কিত দেখা যায়।" [গণদেবতা পৃঃ ৪৫]

অথবা, চণ্ডীমণ্ডপের নিকটস্থিত লৌকিক দেবতাস্থান বা দেবতার বর্ণনায় তারাশঙ্কর যখন মুখর :

"চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে দেবস্থলের আঙিনায় পুরানো বকুল গাছটি গ্রামের ষষ্ঠীতলা, একটি বাসুদেবমূর্তি সেখানে গাছের শিকড় বন্ধনে একেবারে আঁটিয়া বসিয়া আছে। সেইটিই ষষ্ঠীদেবতা বলিয়া পূজিত হয়। (গণদেবতা পৃঃ ৪৬)

তখন তারাশঙ্করের লৌকিক মানসিকতাটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। তারাশঙ্করের সর্বত্রই এই লোকশ্রুতির (Folk lore) চিহ্ন। লৌকিক ইতি কথায়, পুরাকথায়, প্রবাদে, প্রবচনে তারাশঙ্করের গণদেবতা একটি লৌকিক প্রভাবের অভিধান। ধর্মঠাকুর বাংলাদেশের একটি লৌকিক গ্রাম্যদেবতা। বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে আছে অজস্র এই লোকদেবতার অধিষ্ঠান, আর সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে আছে অজস্র লৌকিক কাহিনী, লোকশ্রুতির বহু পরিচয়। 'গণদেবতার' একস্থানে তারই পরিচয়ঃ হরিজনপল্লীর মজলিসের স্থান ধর্মরাজ ঠাকুরের বকুল-গাছতলা। বহুদিনেরপ্রাচীন বকুল গাছটি পত্রপল্লবে পরিধিতে বিশাল। কাণ্ডটার অনেকাংশ শূন্য গর্ভ এবং বহুকাল পূর্বে কোন প্রচণ্ড ঝড়ে অধোৎপাটিত ও প্রায় ভূমিশায়ী হইয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু বিস্ময়ের কথা সেই গাছ আজও বাঁচিয়া আছে। ইহা নাকি ধর্মরাজের অসীম মহিমা। এমন শায়িত অবস্থায় কোথাও কোন গাছকে কেউ জীবিত দেখিয়াছে। গাছের গোড়ায় স্তূপীকৃত মাটির ঘোড়া মানত করিয়া লোকে ধর্মরাজকে ঘোড়া দিয়া যায়, বাবা বাত ভাল করিয়া থাকেন। আশেপাশের ছায়াবৃত বারোমাস পরিচ্ছন্নতায় তক্ তক্ করে। পল্লীর প্রত্যেকে প্রতি প্রভাতে একটি করিয়া মাড়ুলী দিয়া যায়, সেই মাড়ুলী গুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত হইয়া—গোটা স্থানটাই নিকানো হয়, হামদু সেখ সেই খানে বসিয়া পল্লীর লোকজনের সঙ্গে গরু-ছাগল সওদার দরদস্তুর করিতেছিল। (ঐ পৃঃ৬৩)

বাংলাদেশের গ্রামদেবতার স্থানগুলি সমস্ত রকম সংস্কার বর্জিত লৌকিক ধর্মের এক আশ্চর্য কেন্দ্রভূমি। ধর্মঠাকুরের যে পীঠস্থানটি লেখক বর্ণনা করেছেন তার মধ্যে অস্পৃশ্য হিন্দু থেকে আরম্ভ করে মুসলমান পর্যন্ত সকলেরই প্রবেশাধিকার আছে, এই দেবস্থানটি যেমন হরিজন পল্লীর মজলিসের স্থান, ঠিক তেমনি হামদুসেখের মত মুসলমান বণিকের ব্যবসার কেন্দ্রস্থল। লৌকিক ধর্মের এই সমন্বয় এবং মিলনের রূপটি তারাশঙ্কর খুব ভালো ভাবেই জানতেন। তাই তাঁর উপন্যাসের বহু জায়গায় এই লৌকিক রীতিনীতির ধর্মীয় সমন্বয়টি সত্যরূপে স্পষ্ট।

'নবান্ন গ্রাম সমাজে একটি লোকউৎসব, এটিকে শস্য পরবর্তী উৎসব (Post harvasting festival) বলা যেতে পারে। নবান্ন বাংলাদেশের একটি সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ লোক উৎসব (Folk festival)। বাংলাদেশ কৃষিপ্রধানদেশ, নবান্ন একটি শ্রেষ্ঠ কৃষি উৎসব। তারাশঙ্কর গ্রাম বাংলার মানুষ। গণদেবতায় সেই গ্রাম্য উৎসবের স্মৃতিমুখর সেই নবান্ন উৎসবের আয়োজন "নবান্নের দিনে দুইজনে পরামর্শ করিয়া একটা উৎসবেরও ব্যবস্থা করিল, সন্ধ্যায় চণ্ডীমণ্ডপে মনসার

ভাসান গান হইবে। ভাসান গানের দলকে এখানে বেহুলার দল বলিয়া থাকে। বাউড়ীদের একটি বেহুলার দল আছে; সেই দলের গান হইবে।" (ঐ পৃঃ ৭৮)

উৎসবের বর্ণনা : চাষীর গ্রামে নবান্নের সমারোহ কিছু বেশী ; এইটিই সত্যকারের সার্বজনীন উৎসব। চাষের প্রধান শস্য হৈমন্তী ধান মাঠে পাকিয়া উঠিয়াছে, এইবার সে ধান কাটিয়া ঘরে তোলা হইবে। কার্তিক সংক্রান্তির দিনে কল্যাণ করিয়া আড়াই মুঠা ধান কাটিয়া আনিয়া লক্ষ্মীপূজা হইয়া গিয়াছে, এইবার নূতন ধানের চাল হইতে নানা উপকরণ তৈয়ারী করিয়া পিতৃলোক এবং দেবলোকের ভোগ দেওয়া হইবে। তাহার সঙ্গে ঘরে ঘরে হইবে ধান্যলক্ষ্মীর পূজা।… বুড়োশিব এবং ভাঙাকালীর মন্দিরে ভোগ না হইলে নবান্ন আরম্ভ হইবে না। কুমারী কিশোরী মেয়েরা ভিজাচুল পিঠে এলাইয়া দিয়া নতুন বাটীতে নতুন ধানের আতপ চাল, চিনি মণ্ডা, কলা দুধ আমেরটিকলি আদা কুচি, মূলাকুচি সাজাইয়া দক্ষিণাসহ মন্দিরের বারান্দায় নামাইয়া দিতেছে, অধিকাংশই চারপয়সা কেহ দু পয়সা কেহ এক পয়সা দু-চারজনে দিয়াছে দু আনা। যাহাদের বাড়িতে— কুমারী মেয়ে নাই, তাহাদের ভোগসামগ্রী প্রবীণরা লইয়া আসিতেছে।

(ঐ পৃঃ ৭৯)

তারাশঙ্কর গ্রামীণ সংস্কৃতির প্রকৃত রূপটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন বলেই বলতে পেরেছেন, 'এইটিই সত্যকারের সর্বজনীন উৎসব ; আজ দুর্গোৎসবকে বাংলার জাতীয় উৎসব বা সার্বজনীন বলা হলেও, বৃহত্তর গ্রামবাংলার সাংস্কৃতিক জীবনে এর প্রভাব খুবই অল্প। আসলে এটি জমিদার বা ভূম্যধীকারীগণের ধর্মউৎসব। নবান্ন প্রকৃতপক্ষে পল্লীবাংলার একটি সত্যকারের সর্বজনীন লৌকিক উৎসব।

ইতুপূজা বাংলাদেশের একটি লৌকিক ব্রতানুষ্ঠান, বাংলা দেশের মেয়েরা কার্তিক সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ সংক্রান্তি পর্যন্ত এই ব্রত পালন করে। বাংলাদেশের লৌকিক জনজীবনে এর প্রভাব অসাধারণ। তারাশঙ্কর তাঁর 'গণদেবতা' উপন্যাসে এই ইতুপূজার উৎস, বৈশিষ্ট, ক্রিয়া পদ্ধতি, ব্রতকথা ইত্যাদিকে বিশিষ্ট স্থান দিয়েছেন এবং বাংলাদেশের মেয়েলি সমাজে এর অসাধারণ প্রভাব সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়েছেন।

অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে 'ইতুলক্ষ্মী' পর্ব আসিয়া গেল। অন্যান্য প্রদেশে বাংলাদেশে বিশেষ অঞ্চলে কার্তিক-সংক্রান্তি হইতেই ইতু বা মিত্র ব্রত আরম্ভ হয়। শেষ হয় অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে। রবিশস্যের কল্যাণ কামনা করিয়া সূর্যদেবতার

উপাসনা হইতেই নাকি ইহার উৎপত্তি। দেবুদের দেশে কিন্তু সমগ্র মাস ধরিয়া সূর্যদেবতার আরাধনার প্রচলন নাই। এ দেশে রবিশস্যের চাষেরও বিশেষ প্রসার হয় নাই। ধান চাষ এখানকার প্রধান কৃষিকার্য্য ইতুপর্বকে এখানে ইতুলক্ষ্মী বা ইতু-সংক্রান্তি পর্ব বলা হয়। হৈমন্তীধান মাড়াই ও ঝাড়াই করিবার শুভ প্রারম্ভের পর্ব এটি।

আপন আপন খামারে ইহা অনুষ্ঠান হয়। খামারের ঠিক মধ্যস্থলে শক্ত একটি খুঁটা পুঁতিয়া সেই খুঁটার তলায় আলপনা দিয়া সেইখানে লক্ষ্মী পূজার ভোগ হয়।

তারাশঙ্কর কেবল গ্রাম্য লৌকিক আচার-আচরণের মধ্যে মানুষ হননি, তাঁর একটি বিশিষ্ট বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কৌতুহলী মন ছিল, এই সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধি দিয়ে গ্রাম্য পূজা-পার্বণ বার ব্রত ইত্যাদি বিশ্লেষণ করেছেন। সমাজতাত্ত্বিকের গবেষণাও সেখানে দেখা যাচ্ছে। ইতুলক্ষ্মী ব্রত বা বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে সূর্যউপাসনা এবং রবিশস্যের কল্যাণ কামনা মূলক ব্রত হিসাবে প্রচলিত। তারাশঙ্করের বীরভূমের রাঢ় অঞ্চলে সেটিই 'ইতুসংক্রান্তি পর্ব বা হৈমন্তী ধান মাড়াই ও ঝাড়াই এর শুভ পর্ব হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়।

তারাশঙ্করের এই যে বিশ্লেষণের মধ্যেই তাঁর লৌকিক মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠছে। তারপর এই ইতুব্রত যে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করেছে তারও পরিচয় দিয়েছেন।

'ধানমাড়াইয়ের সময় ওই খুঁটিটির চার দিকেই ধান শুদ্ধ পোয়াল বিছাইয়া দেওয়া হইবে এবং গরু মহিষগুলি ওই খুঁটাতে আবদ্ধ থাকিয়া বৃত্তাকারে খুরের মাড়াইয়ে মাড়ায়ে খড় হইতে ধান ঝাড়াই হইয়া যাইবে।

অর্থাৎ অন্যান্য লোকসাহিত্যেও লৌকিক অনুষ্ঠানগুলি যে সদা পরিবর্তনশীল সেটিও কথাশিল্পী তারাশঙ্করের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তাই বাংলার এক অঞ্চলে যেটি ইতুলক্ষ্মী ব্রত রূপে পরিচিত, তারাশঙ্করের বারভূমের লাল মাটির দেশে তাই ধান্যকর্তন উৎসবের সূচনা রূপে পরিচিত। যুগের পরিবর্তনে এর প্রভাব কমতে কমতে সমাজের বৃহত্তর পটভূমিকা থেকে পরিবার ও কিছু ব্যক্তি বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে সেটিও তারাশঙ্কর ধরতে পেরেছিলেন।

"দেবুর মনে আছে, পনেরো বৎসর পূর্বেও লক্ষ্মীপূজার শেষে সমস্ত গ্রামের মেয়েরা এইখানে (চণ্ডীমণ্ডপ) সমবেত হইয়া সুপারী হাতে ব্রতকথা শুনিতে বসিত। গ্রামের প্রবীণা কেহ ব্রতকথা বলিতেন। আর সকলে শুনিত। আজকাল সে রেওয়াজ উঠিয়া গিয়াছে, এখন দুই তিন বাড়ির মেয়েরা কোন এক

বাড়িতে একত্রিত হইয়া ব্রতকথা শুনিয়া লয়। দেবুর বাড়িতেও এই ব্রতকথার আসর বসে। পাঠশালার ছুটি দিয়া সে আজ সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া বাড়ি ঢুকিল। বাড়ির উঠানে তখন তাহার স্ত্রীর সম্মুখে বসিয়া আছে পদ্ম, অদূরে বসিয়া আছে দুর্গা, তাহার স্ত্রী ইতুলক্ষ্মীর ব্রতকথা বলিতেছে। দেবুর স্ত্রী বড় ভাল ব্রতকথা উপকথা বলিতে পারে, এ পাড়ায় ব্রতকথার আসর তাহার ঘরেই বসে।"

[পৃঃ ৯৭]

চণ্ডীমণ্ডপ হইতে ব্রতকথা উপকথা সরে এসে ব্যক্তি মানুষের দরজায় ঠেকেছে। কালের বিবর্তনে লৌকিক ব্রতানুষ্ঠানের এই যে পরিবর্তন তা তারাশঙ্করের লৌকিক ঐতিহ্য প্রবণতা খুব সার্থক ভাবে ধরতে পেরেছিলো। তাই গ্রাম্য নারীর ব্যক্তি জীবনে এই সব ব্রতকথার যে প্রভাব কতদুর তারও সার্থক পরিচয় প্রকাশিত করেছেন। দেবুর স্ত্রী ও পদ্মর সঙ্গে সঙ্গে ব্রতকথা শুনতে দুশ্চরিত্রা দুর্গা, সংস্কার ও ঐতিহ্যকে যে কেউ বাদ দিতে পারেনা এটি তার অন্যতম উদাহরণ।

তাই ব্রতানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে ব্রতকথার আসর বসেছে :

"দরিদ্র ব্রাহ্মণের পিঠে খাবার সাধ হয়েছে।"

দেবুর স্ত্রী ব্রতকথা বলিতেছিল। "ব্রাহ্মণ মনে মনেই ভাবেন—চালের পিঠে, সরু চাকলি, মুগের পিঠে, নারকেল পুরের পিঠে, রাঙা আলুর পিঠে, ভাবেন আর জিভে জল আসে।"

ঘরের ভিতর বলিয়া দেবু আপন মনেই হাসিল। জল তাহারও জিভে আসিতেছে ; বোধকরি ব্রতকথার কথক ঠাকরুণ মায় শ্রোতাদের জিহ্বা পর্যন্ত সজল হইয়া উঠিয়াছে।

"কিন্তু সাধ হলেই তো হয়না, সাধ্যি থাকা চাই, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, জমি নাই, জেরাত নাই, চাকরি-বাকরি নাই, ব্যবসা নাই-বাণিজ্য নাই, যজ্ঞি নাই, যজমান নাই—আজ খেতে কাল নাই আর কোথায় চাল, কোথায় কলাই, কোথায় নারকেল, কোথায় গুড়, রাঙা আলুই বা আসে কোথা থেকে? আর ব্রাহ্মণ হয়েও চুরি করতে তো পারেন না, কি করেন?"

"দেবু ব্রাহ্মণের সততার তারিফ না করিয়া পারিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণের বুদ্ধি তো! তিনি এক ফন্দি বার করলেন। অগ্রহায়ণ মাসের শেষ। মাঠ থেকে গেরস্তের গাড়ি গাড়ি ধান আসছে, কলাই আসছে, আলু আসছে, গাড়ির চাকায়

চাকায় পথের মাটি গুঁড়ো হয়ে এক হাঁটু করে ধুলো হয়েছে। ব্রাহ্মণ বুদ্ধি করে সন্ধ্যার পর বাড়ির সামনেই পথের ধূলোর ওপর আরও খানিকটা কেটে বেশ একটি গর্ত করলেন—তারপর ঢাললেন ঘড়া ঘড়া জল। পরের দিন যত গাড়ি আসে, সব পড়ে ওই গর্তের কাদায়, চাকা আটকে যায়। ব্রাহ্মণ সেই গাড়ি তুলতে সাহায্য করেন আর চাষীদের কাছে আদায় করেন—ধানের গাড়ি থেকে ধান, কলাইয়ের গাড়ি থেকে কলাই, গুড়ের লরি থেকে গুড়। এমনি করে ধান, কলাই, গুড়, আলু যোগাড় করে ঘরে তুললেন। তারপর ব্রাহ্মণীকে বললেন যে বামনি এবার পিঠে কর।"……

"যিনি করেন 'ইতুলক্ষ্মী' তাঁর ভাগ্যি হয় ব্রতকথার 'ঈশনে' মানে ঈশানীর মত। ধান, কলাই, ছোলা, মুগ, গম, যব, সরষে, তিসি নানা ফসলে থৈ থৈ করে ক্ষেত, গাড়িতে তুলে ফুরোয় না। খামার জুড়ে, মরাই বেঁধে কুলোয় না, এক মুঠো তুলতে দুমুঠো হয়। তার ক্ষেত খামার ভঁাড়ার ভরে মালক্ষ্মী অচলা হয়ে বাস করেন। ঘরে ভরে যায় সন্তান-সন্ততিতে, গোয়াল ভরে ওঠে গরু বাছুরে, গাছে ভরা ফল, পুকুর ভরা মাছ, লক্ষ্মীর হাঁড়িতে কড়ি, আট অঙ্গ সোনা-রূপোয় ঝলমল করে। বউ বেটা আসে, নাতি-নাতনী পাশে শুয়ে স্বামীর কোলে মরণ হয় তার একগলা গঙ্গাজলে।" ব্রতকথা শেষ করিয়া উলু উলু উলুধ্বনি দিয়া দেবুর স্ত্রী ব্রতকথা শেষ করিয়া প্রণাম করিল।

বাংলাদেশের সমাজের উপর ব্রতকথার প্রভাব যে কতদুর ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় দেবুর একটি সংলাপে।

"এস এস, রাঙা দিদি, এস, আজ ইতুলক্ষ্মী, হাফ স্কুল! দেবু সাগ্রহে তাহাকে একটু অস্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিল।"

এই সব ব্রতকথা ইত্যাদির এত প্রভাব ছিল যে তার জন্যেই স্কুল ইত্যাদি ছুটি হয়ে যেত। কিন্তু বর্তমানে তার বিপর্যস্ত রূপ সে যুগের একজন বৃদ্ধার চোখে কি ভাবে ধরা পড়েছে।

"ইতুলক্ষ্মীতে হাপস্কুল বুঝি? তা বেশ করেছিস। বুড়ী অবিলম্বে ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিয়া দিল। কতগান শুনেছি এখানে ভাই নাতি-নীলকণ্ঠ, নটবর, মতিরায় ও একবার এসেছিলো, বড় যাত্রার দল। কেত্তন পাঁচালী, কত হত ভাই। তোরা আর কি দেখলি বল? সে রামও নাই,—সে অযোধ্যাও নাই।"

লোক বিশ্বাস (Folk belief) সমাজের স্তরে স্তরে কি ভাবে গাঁথা পড়ে

গেছে তার পরিচয় আছে তারাশঙ্করের 'গণদেবতার' মধ্যে। যুগ যুগ কুসংস্কারের মধ্যে বাস করে বাংলার মানুষ কিভাবে নিজেদের অলৌকিক চিন্তা জগতে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার পরিচয় আছে এ গ্রন্থে। স্বয়ং শিল্পী তারাশঙ্কর এই সংস্কার থেকে বাইরে যেতে পারেননি। তাই তাঁর সৃষ্ট নরনারীর মধ্য দিয়ে সেটা প্রকাশ করেছেন। গণদেবতা উপন্যাসে অনিরুদ্ধ কর্মকারের স্ত্রী পদ্ম মৃগী রোগ-গ্রস্ত হওয়ায় গ্রামের লোক কি ভাবে সেটাকে গ্রহণ করেছিল তার পরিচয় উপস্থিত করলেই গ্রাম্যজীবনে ও তারাশঙ্করের মানসিকতায় লৌকিক কুসংস্কার ও লোক-বিশ্বাসের প্রভাবটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। বিজ্ঞান কিভাবে কুসংস্কারের কাছে হার মেনেছে তার পরিচয় পাওয়া যাবে।

"হাসপাতালের ডাক্তার বলিল—এ এক রকম মূর্ছা-রোগ, বন্ধ্যা মেয়েদেরই মানে—যাদের ছেলে-পুলে হয় না তাদেরই এ রোগ বেশী হয়। হিসটিরিয়া। পাড়া-পড়শী কিন্তু প্রায় সকলেই বলিল—দেবরোগ, কারণও খুঁজিয়া পাইতে দেরী হইল না। বাবা বুড়োশিব ভাঙ্গা কালীকে উপেক্ষা করিয়া কেহ কোন কালে পার পায় নাই। নবান্নের ভোগ দেবস্থলে আনিয়া সে বস্তু তুলিয়া লওয়ার অপরাধ তো সামান্য নয়। অনিরুদ্ধের পাপে তাহার স্ত্রীর এই রোগ হইয়াছে। কিন্তু অনিরুদ্ধ ও কথা গ্রাহ্য করিলনা, তাহার মত কাহারও সহিত মেলে না।·তার ধারণা দুষ্ট লোকে তুক করিয়া এমন করিয়াছে। ডাইনী-ডাকিনী বিদ্যার অভাব দেশে এখনও হয় নাই। ছিরুর বন্ধু চন্দ গড়াঞী এ বিদ্যায় ওস্তাদ, সে বান মারিয়া মানুষকে পাথরের মত পঙ্গু করিয়া দিতে পারে।" [পৃঃ ১৩৩।

বিশ্বাসজনিত স্বপ্ন দর্শন বা কুসংস্কারের প্রভাবে অবচেতন মনে কি ক্রিয়া সঞ্চার হতে পারে তার একটি চিত্র :

"বহু কষ্টে পদ্মের চেতনা সঞ্চার হইলে নিতান্ত অসহায়ের মত পদ্ম তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিয়াছিল—আমার বড় ভয় লাগছে গো।

—ভয়? ভয় কি? কিসের ভয়?

—আমি স্বপ্ন দেখলাম—

—কি? কি স্বপ্ন দেখলি? অমন করে চেঁচিয়ে উঠলি ক্যানে?

—স্বপ্ন দেখলাম—মস্ত বড় একটা কালো কেউটে আমাকে জড়িয়ে ধরেছে।

—সাপ?

—হ্যাঁ সাপ!" [পৃঃ ১৩১]

পদ্মর এই স্বপ্ন দর্শন ইত্যাদি নাস্তিক অনিরুদ্ধর মনেও লৌকিক বিশ্বাস কুসংস্কার ইত্যাদি কি ভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল তার চিত্র :

জগন ডাক্তার হইলেও প্রাচীন সংস্কার একেবারে ভুলিতে পারে নাই, রোগীকে মকরধ্বজ এবং ইনজেক্‌শন দিয়াও সে দেবতার পাদোদকের উপর ভরসা রাখে। অনিরুদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল—তা যে না হতে পারে, তা নয়। ডাইনী—ডাকিনী দেশ থেকে একেবারে যায় নাই। রুদ্ধ আবেগে অনিরুদ্ধ পদ্মের সেই স্বপ্নের কথাটা আনুপূর্বক ডাক্তারকে বলিয়া সে বলিল ওই যে চন্দর গড়াই ছিরে শালার প্রাণের বন্ধু ওশালা ডাকিনী বিদ্যা জানে। যোগী গড়ায়ের বিধবা মেয়েটাকে কেমন বশীকরণ করে বের করে নিলে—দেখলেন তো।

[পৃঃ ১৩৬]

আদিম বিশ্বাস থেকে উদ্ভূত ডাইনী-তন্ত্র (witch craft) কিভাবে লোক-সমাজে (Folk society) দৃঢ় শিকড় গেড়েছে তারই সার্থক পরিচয় উপস্থিত হয়েছে উপরোক্ত পঙ্‌ক্তিতে। তাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চিকিৎসা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত জগন ডাক্তারও রোগীকে মকরধ্বজ এবং ইনজেক্‌শান দিয়াও যে দেবতার পাদোদকের উপর ভরসা রাখে সুতরাং অনিরুদ্ধর মত অশিক্ষিত গ্রাম্যমানুষ যে এসব লোকবিশ্বাস ও কুসংস্কারের শিকার হবে এতে আর আশ্চর্য কি আছে।

ভৌতিক বিশ্বাস (ghost belief) বাংলাদেশের প্রচলিত কুসংস্কার। তাই অনিরুদ্ধের-পদ্মের নিঃসন্তান জীবনে সন্তান আবির্ভাবের জন্যে ঠাকুরের দোর ধরা থেকে শুরু করে ভূতের কাছে দরবার পর্যন্ত হয়েছে, জগন ডাক্তার বলেছিলেন, সাপের স্বপ্ন দেখলে কি হয় জানিস তো? বংশ বৃদ্ধি হয়, ছেলে হয়। তোদের কপালে ছেলে নাই, কিন্তু ছিরে নিজে যখন সাপ ছেড়েছে, তখন ওই বেটার ছেলে ম'রে—তোর ঘরে এসে জন্মাবে। [পৃঃ ১৩৭)

জগন ডাক্তার আরও বলেছে, "চিকিৎসা এর তেমন কিছু নাই।...আর তুই বরং একবার সাওগ্রামের শিবনাথ তলাটাই না হয় ঘুরে আয়, শিবনাথ তলার-নাম ডাকতো খুব আছে।" এর পরেই লেখক সেই শিবনাথ তলার সম্পর্কে প্রচলিত লৌকিক বিশ্বাসের এক কাহিনী উপস্থিত করেছেন।

"শিবতলার ব্যাপারটা ভৌতিক ব্যাপার। কোন পুত্রহারা শোকার্ত মায়ের অবিরাম কান্নায় বিচলিত হইয়া নাকি তাহার হত পুত্রের প্রেতাত্মা নিত্য সন্ধ্যায় মায়ের কাছে আসিয়া থাকে। অন্ধকার ঘরের মধ্যে তাহার মা খাবার রাখিয়া দেয়, আসন পাতিয়া রাখে, প্রেতাত্মা আসিয়া সেই ঘরে বসিয়া মায়ের সঙ্গে

কথাবার্তা বলে, সেই অবসরে নানা অভাব অভিযোগ প্রেতাত্মার কাছে নিবেদন করে। প্রেতাত্মা সে সবের প্রতিকারের উপায় করিয়া দেয়। কাহাকেও মাদুলি, কাহাকেও তাবিজ, কাহাকেও জড়ি, কাহাকেও বুটি, কাহাকেও আর কিছু।"

[পৃঃ ১৩৭]

পৌষ-সংক্রান্তির পৌষলক্ষ্মী অর্থাৎ পৌষপার্বণ বাংলাদেশের একটি লৌকিক উৎসব। এটি বাঙালীর বাৎসরিক শস্যোৎসব (harvesting festival)। কৃষিজীবী সমাজে এর একদিন যে মূল্য ছিল আজ আর সে মূল্য নাই। কিন্তু তার চিহ্ন আছে গণদেবতার মধ্যে। তবে এ উপলক্ষ্যে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক ও অন্তঃপুরের নারীদের মধ্যে ছড়া ও সঙ্গীত প্রচলিত আছে:

এস পৌষ যেও না
জনম জনম যেয়ো না ॥
অঁাদাড়ে পাদাড়ে পৌষ।
বড় ঘরের মেঝেয় বোস ॥
এমনি করে এসো পৌষ জনম জনম।
আমরা যেন উপোস না যাই কোন বছর ॥
এস পৌষ বড় ঘরের মেঝেয় চেপে বোস
এমনি ক'রে এস পৌষ এমনি করে এস ॥

তারাশঙ্কর গ্রামের মানুষ। গ্রাম্য জীবনের পর্ব-পার্বণ গুলি তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত। তারই একটি বিস্তারিত বিবরণ:

পৌষ সংক্রান্তির পৌষ লক্ষ্মী অর্থাৎ পৌষ-পার্বণ নবান্নের দিন হইতে মাস দেড়েক পর পল্লীবাসীর আর একটি সার্বজনীন উৎসব আসিল। মধ্যে ইতুলক্ষ্মী গিয়াছে, কিন্তু ইতুলক্ষ্মীতে নিয়ম আছে, পালন আছে, পার্বণের সমারোহ নাই পৌষ-পার্বণের ঘরে ঘরে সমারোহ, পিঠা-পরব। অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে খামারে লক্ষ্মী-পাতিয়া চিড়া-মুড়কি, মুড়ী, মুড়ীর নাড়ু, কলাই ভাজা পূজা হইয়াছিল। পৌষ সংক্রান্তির ঘরের মধ্যে লক্ষ্মীর আসন পাতিয়া ধান কড়ি সাজাইয়া সিংহাসনের দুই পাশে দুইটি কাঠের পেঁচা রাখিয়া পূজা হইবে। এক অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জনে লক্ষ্মীর সঙ্গে নানা দেবতার ভোগ দেওয়া হইবে। রাশিকৃত চাল ঢেঁকিতে কুটিয়া গুঁড়া প্রস্তুত হইয়াছে,—পিঠা তৈয়ারী হইবে।

পিঠা তৈয়ারী হইবে হরেক রকমের, রস প্রস্তুত হইয়াছে, রসে সিদ্ধ পিঠা হইবে। তাহা ছাড়া গুড়ে নারিকেল, গুড়ে তিলে মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়াছে, পাতলা

ক্ষীর হইয়াছে, চাচি বা খোয়া ক্ষীর হইয়াছে, লোকে আকণ্ঠ পুরিয়া প্রসাদ পাইবে। [পৃঃ ১৪১]

তারপর আছে 'বাউনী বাঁধা, পিঠে-পার্বণের পর এটিও একটি লৌকিক অনুষ্ঠান, নিঃসম্বল পদ্মর চিন্তা :

বাড়িতে আতপ চাল নাই, চাল গুঁড়াইয়া একবার বাটিয়া লইয়া আল্পনার গোলা তৈয়ারী করিতে হইবে, আলপনা আঁকিতে হইবে দরজা হইতে ঘরের ভিতর পর্যন্ত, খামারে মরাইয়ের নিচে গোয়াল ঘরে পর্যন্ত। চণ্ডীমণ্ডপে আবার পৌষ আগলানোর আলপনা আছে। মনে পড়িল, বাউরী চাই। কার্তিক-সংক্রান্তির 'মুঠলক্ষ্মী' ধানের খড় পাকাইয়া সেই ছড়িতে বাঁধিতে হইবে বাড়ির প্রতিটি জিনিস। ঘরের বাক্স পেঁটরা তৈজস-পত্র সবেতেই পড়িবে মালক্ষ্মীর বন্ধন। ঘরের চালে পর্যন্ত আউরী-বাউরীর বন্ধন পড়িবে। তাহা হইলে বৈশাখের ঝড়ে চাল আর উড়িবে না।" (পৃঃ ১৫০)

তার পরেই শুরু হয়েছে পৌষ-পার্বণের 'আউরী-বাউরীর ব্রতকথা :

সেই পুরাকালে ছিল এক রাখাল ছেলে। বনের ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সে আপনার গোরুগুলিকে লইয়া ফিরিত। গ্রীষ্মের রৌদ্র, বর্ষার বৃষ্টি, শীতের বাতাস তাহার মাথার উপর দিয়া বহিয়া যাইত। মধ্যে মধ্যে দুঃখ কষ্ট হইলে সে চোখের জল ফেলিত আর ঊর্ধ্বমুখে দেবতাকে ডাকিত ভগবান আর পারি না, এ কষ্ট তুমি দূর কর, আমাকে বাঁচাও।

একদিন লক্ষ্মীনারায়ণ চলিয়াছেন আকাশ পথে। রাখালের কাতর কান্না আসিয়া পৌঁছিল তাহাদের কানে। মা লক্ষ্মীর কোমল হৃদয় ব্যথিত হইয়া উঠিল। দূর কর ঠাকুর, রাখালের দুঃখ দূর কর।

লক্ষ্মী বলিলেন—তুমি অনুমতি দাও।

নারায়ণের অনুমতি পাইয়া লক্ষ্মী আসিলেন মর্ত্যে। চারিদিক হাসিয়া উঠিল —সোনার বর্ণচ্ছটায় বাতাস ভরিয়া উঠিল দেবীর দিব্যাঙ্গের অপরূপ সৌরভে। রাখাল অবাক হইয়া গেল। দেবী রাখালের কাছে আসিয়া বলিলেন দুঃখ তোমার দূর হইবে তুমি আমার কথামত কাজ কর। এই লও ধানের বীজ, বর্ষার সময় মাঠে এইগুলি ছড়াইয়া দাও, বীজ হইতে গাছ হইবে ; সেই গাছের বর্ণ যখন হইবে আমার দেহ বর্ণের মতো, আমার গাত্র গন্ধের মতো, গন্ধে যখন ভরিয়া উঠিবে তাহার সর্বাঙ্গ, তখন সেইগুলি কাটিয়া ঘরে তুলিবে।

রাখাল লক্ষ্মীকে প্রণাম করিল। বর্ষার প্রান্তরের বুকে ছড়াইয়া দিল, ধানের

বীজ দেখিতে দেখিতে সমস্ত মাঠ ভরিয়া গেল সবুজ ধানের গাছে। ক্রমে ক্রমে বর্ষা গেল সবুজ ধানের ডগায় দেখা দিল শিষ।

রাখাল নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল, কিন্তু এখনও সেই ঠাকুরুণের মতো বর্ণ হয় নাই, সে গন্ধও উঠিতেছে না। রাখাল অপেক্ষা করিয়া রহিল। হেমন্তের শেষ অগ্রহায়ণে। একদিন রাত্রে ঘরে শুইয়াই রাখাল পাইল সেই গন্ধ। সকালে উঠিয়াই সে ছুটিয়া গেল মাঠে। অবাক হইয়া গেল। সোনার বর্ণে গোটা মাঠটাই আলো হইয়া উঠিয়াছে। দিব্য গন্ধে আকাশ বাতাস আমোদিত। সোনার বর্ণে দিব্য গন্ধে আকৃষ্ট হইয়া আকাশে নানাবিধ কীটপতঙ্গ পাখী উড়িতেছে, পশুরা আসিয়া জুটিয়াছে, চারিপাশে সেই ঠাকরুণ যেন তাহার দুঃখে বিগলিত হইয়া মাঠ জুড়িয়া অঙ্গ এলাইয়া বসিয়া আছেন। রাখাল ধান কাটিয়া ভারে ভারে ঘরে তুলিল।

দেশের রাজা সংবাদ পাইয়া আসিয়া সোনা দিয়া কিনিতে চাহিলেন সমস্ত ধান। রাজার ভাণ্ডারের সোনা ফুরাইয়া গেল—কিন্তু রাখালের ধান অফুরন্ত। রাজার বিস্ময়ের আর অবধি রহিলনা; তখন রাজা আপনার কন্যাকে আনিয়া দান করিলেন রাখালের হাতে। সম্মুখেই পৌষ সংক্রান্তিতে রাখাল লক্ষ্মীদেবীর পূজা করিল। ওই ধানকেই স্থাপিত করিল সিংহাসনে, সিন্দুর কজ্জলে বসনে ভূষণে তাহাকে বিচিত্র শোভায় সাজাইল। সম্মুখে স্থাপন করিল জলপূর্ণ ঘট, ঘটের মাথায় দিল ডাব—আমের পল্লব। রাজকন্যা ঐ ধান ভানিয়া চাল করিলেন, চাল হইতে প্রস্তুত হইল সে নানাবিধ সুখাদ্য; ঘৃতে অন্নে ঘৃতান্ন; দুধে—অন্নে মিষ্টান্ন—পায়সান্ন পরমান্ন, হরেক রকমের পিঠা সরু চাকলি, তাহার সঙ্গে পঞ্চপুষ্পে ধূপে-দীপে—চন্দনে গন্ধে দেবীর পূজা করিয়া রাখাল ও রাজকন্যা দেবীর ভোগ দিয়া সর্বাগ্রে দিলেন কৃষাণকে, রাখালকে—নিজের স্বামীকে ঘরের জনকে—তাহার পর বিলাইলেন পাড়া প্রতিবেশীকে, হেলে বলদ, গাই গরু ছাগল ভেড়া—এমনকি বাড়ির উচ্ছিষ্ট ভোগী কুকুরটা পর্যন্ত প্রসাদ পাইল।

লক্ষ্মীদেবী মূর্তিমতী হইয়া দেখা দিলেন, আপন পরিচয় দিলেন, বর দিলেন, তোমার মতো এই পৌষ সংক্রান্তিতে যে আমার পূজার্চনা করিবে তাহার ঘরে আমি আলো হইয়া বাস করিব। পৃথিবীতে তাহার কোন অভাব বা দুঃখ থাকিবেনা, পরলোকে সে করিবে বৈকুণ্ঠে বাস।" (পৃ ১৫০)

এই ব্রতকথার এমনই প্রভাব যে গ্রাম্য নারী তার মধ্য দিয়েই সমস্ত জীবনের আশা আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন দেখে। প্রাত্যহিক জীবনের যে সুখ দুঃখের জীবন যন্ত্রণা

আছে তার থেকে মুক্তির আস্বাদ পায় গ্রাম্য নারী তাদের নিজস্ব পালা-পার্বন—বার-ব্রতর মধ্যে। একথা বলা বাহুল্য যে বাংলার ব্রতের অধিকাংশেরই লক্ষ্যস্থল ঐহিক জীবনের সুখ সম্পদ। তাই নৈরাশ্য পীড়িত গ্রাম্য নারী এর মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ ঐশ্বর্য ভরা জীবনের আকাঙ্ক্ষা করে। 'গণদেবতা' উপন্যাসের বহুক্ষেত্রে এ জিনিসটি লক্ষ্য করা গেছে, যে অনিরুদ্ধ কর্মকার ও তার স্ত্রী পদ্ম অভাব অনটন ও বঞ্চনার মধ্যে আশাহীন হয়ে পড়েছিলো সেই পদ্মই পৌষলক্ষ্মীর ব্রতকথাটি শ্রবণ করে আশায় আশান্বিত হয়ে শুরু করল পৌষলক্ষ্মীর উদ্যোগ আয়োজন। লেখকের বর্ণনায় :

"ব্রতকথাটি মনে মনে স্মরণ করিতে করিতে আশা আকাঙ্ক্ষায় বুক বাঁধিয়া পরিতুষ্ট মনেই পদ্ম লক্ষ্মীর আয়োজন আরম্ভ করিল। ঘর দুয়ায়, খামার হইতে গোয়াল পর্যন্ত আলপনা আঁকিয়া এবার সে যেন একটু বেশী বিচিত্রিত করিয়া তুলিল। দুয়ার হইতে আঙিনার মধ্যস্থল পর্যন্ত আলপনায় আঁকিল চরণ চিহ্ন। ওই চরণ চিহ্নে পা ফেলিয়া লক্ষ্মী ঘরে আসিবেন। ঘরের মধ্যস্থলে সিংহাসনের সম্মুখে আঁকিল প্রকাণ্ড এক পদ্ম, অপরূপ তাহার কারুকার্য। মা আসিয়া বিশ্রাম করিবেন শাঁখ ধুইল, ধূপ বাহির করিল, প্রদীপ বাহির করিল, সিন্দুর রাখিল, কাজল পরিল। এদিনের আয়োজন শেষ করিয়া, গুড়ে নারকেলে, গুড়ে তিলে মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিবে। দুধ জ্বাল দিয়া ক্ষীর হইবে। কত কাজ কত কাজ। সে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া আলপনা আঁকিতে বসিল। পৌষ-পৌষ-পৌষ বড় ঘরের মেঝেয় এসে বস—একটি ঘর আঁকিতে হইবে মরাই আঁকিতে হইবে,—এস পৌষ বস তুমি, না যেয়ো ছাড়িয়া।" (পৃ ১৫২)

লৌকিক উৎসবের ব্রতানুষ্ঠান (Folk ritual) এর এমন নিখুঁত পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তারাশঙ্করের পক্ষেই সম্ভব। কারণ একটি সম্পুর্ণ লৌকিক পরিবেশে মানুষ না হলে এরকম লৌকিক ঐতিহ্য গড়ে ওঠা সম্ভবপর নয়।

বাংলাদেশে যেমন পৌষপার্বণে মুখর তারাশঙ্করও তার উপন্যাসে পৌষপার্বণের বর্ণনায় উচ্চকিত।

"আবার আউরী-বাউরী দিয়া সব বাঁধিতে হইবে, মুঠ লক্ষ্মীর ধানের খড়ের দড়িতে সমস্ত সামগ্রীতে বন্ধন দিতে হইবে,—আজিকার ধন থাক, কালিকার ধন আসুক, পুরানে নুতনে সঞ্চয় বাড়ুক। লক্ষ্মীর প্রসাদে পুরাতন অন্নে নুতন বস্ত্রে জীবন কাটিয়া যাক নিশ্চিন্তে নির্ভাবনায়। অচলা হইয়া থাক্ মা, অচলা হইয়া থাক।

ওদিকে তখন চণ্ডীমণ্ডপে মেয়েদের সমস্বরে ধ্বনি উঠিতেছিল—পৌষ—বন্দনা, পৌষ বন্দনের।

পৌষ—পৌষ—সোনার পৌষ
এস পৌষ যেয়ো না—জন্ম জন্ম ছেড়োনা।
না যেয়ো ছাড়িয়ে পৌষ—না যেয়ো ছাড়িয়ে,
পৌষ—পৌষ—সোনার পৌষ
বড় ঘরের মেঝেয় বোস,
বড় ঘরের মেঝে ভরে—বাহান্ন পৌটি বসে
সোনার পৌষ। (পৃ ১৬১-১৬৮)

পৌষপার্বণ কেবল বাংলার গ্রাম্য মানুষের বাহ্যিক অনুষ্ঠান বা গীতি নয়। এ যেন বাংলার লৌকিক জীবন সংগীত। দেবুর পনেরো মাস জেল হয়েছে। তাই পৌষ পার্বণের শেষ দিনে যখন ছড়া সংগীত উলু ধ্বনির রোল উঠেছে তখন তার স্ত্রী ভাবছে :

"তাহার সোনার পৌষ চলিয়া যাইতেছে, তাহাকে পূজা করিয়া বাঁধিতে হইবে। না যেয়ো ছাড়িয়ে পৌষ না যেয়ো ছাড়িয়ে। পনেরো মাস পরে তো সে ফিরিয়া আসিবে। তখন তাহাকে যে পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিয়া কটোরা ভরিয়া অন্ন সাজাইয়া দিতে হইবে।" [পৃঃ ১৬৮]

লোক উৎসব, লৌকিক পর্ব-পার্বণ, বারব্রত গ্রামীণ মানুষের জীবনে কিভাবে দৃঢ় শিকড় গেড়ে রয়েছে তার একটি সার্থক পরিচয় এখানে উপস্থিত করা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে প্রধানত: বীরভূম, বর্ধমান জেলা এবং হাওড়া, হুগলীও ২৪ পরগণা জেলার কোন কোন অঞ্চলে ঘেঁটু নামে এক লৌকিক দেবতা আছেন। তাকে পূজা করলে খোস পাঁচড়া রোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়। এ পূজা সাধারণতঃ হিন্দু সমাজের রাখাল বালকদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তিতে ঘেঁটুর পূজা হয়। পূজার পুর্বে বালকেরা বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া ঘেঁটুর নামে মাগন সংগ্রহ করে। সে উপলক্ষে তারা নানা ছড়া বলে এবং গানও গায় :

আজ আনন্দে ঘেঁটু ল'য়ে সঙ্গে
নাচিয়া নাচিয়া চল সবে যাই
মনের আনন্দে দাও গো পূজা
এমন দিন ত আর হ'বে নাই ॥

খোস চুলকানো ঘেঁটু দেছিস গায়,
সতী নারীর বীর পতির গায়
বামে দাঁড়ালে সতী নারী
পতি বিনা সতীর গতি নাই ।।[১]

এই ঘেঁটু পূজার বিভিন্ন রূপ বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোক সমাজে প্রচলিত। তারাশঙ্কর বীরভূম জেলার লোক। লাল মাটির দেশে এই পূজা কি পদ্ধতি বা রূপে প্রচলিত তার একটি বিস্তৃত বিবরণও এই পূজার ছড়া ও গীতে সমাজ জীবনে কিরূপ প্রভাব তার বিস্তারিত পরিচয় উপস্থিত করেছেন, কি ভাবে একটি লৌকিক উৎসব লোক জীবনের রসসৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হয়েছে, গান ও কবিতা ছড়ার আসর বসিয়েছে, তার সার্থক পরিচয় উপস্থিত হয়েছে 'গণদেবতায়'।

চৈত্র মাসে ঘণ্টাকর্ণের পূজা, ঘেঁটু পূজা পঞ্জিকার ঘণ্টাকর্ণ নয়। পঞ্জিকার ঘণ্টাকর্ণ বসন্ত রোগ নিবারক মহাবল ঘণ্টাকর্ণের পূজা। এই ঘণ্টা কর্ণ ঘেঁটু গাজনের অঙ্গ। বিষ্ণু বিরোধী শিবভক্ত ঘণ্টাকর্ণ ছিল। সে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া রুদ্র দেবতার এবং বিষ্ণু দেবতার উভয়েরই প্রসাদ লাভ করিয়াছিল। এই একাধারে ভক্ত ও দেবতা ঘণ্টাকর্ণের পূজা করে বাংলার নিম্ন জাতীয়েরা। সমস্ত মাস ধরিয়া ঘেঁটুর গান গাহিয়া বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া বেড়ায় চাল ডাল মাগিয়া মাসান্তে গাজনের সময় উৎসব করে।* [পৃঃ ১৮২]

এ হল ঘেঁটু গাজনের বিস্তৃত বিবরণ। এই ক্ষুদ্র লোকউৎসবটির প্রভাব যে কত বিস্তৃত তার পরিচয় পাওয়া যাবে কয়েকটি সংলাপে ও—গানের আসরে। যথা :

'চৈত্র মাসের সন্ধ্যা, ধর্মরাজের স্থানে বকুল গাছতলায় আসন পড়িয়াছে। দেবুর মনে পড়িয়া গেল—বাল্যকালে তাহারা ঘেঁটু গান শুনতে এখানে আসিত। এমনই জ্যোৎস্নার আলোতে আসর বসিত। তখন সতীসেরা সত্ত জোয়ান উহারাই গাহিত গান। আর তাহাদের বয়সীরা ধুয়া গাহিত, নাচিত, তখন কিন্তু ঘেঁটুর আসর ছিল জমজমাট, সে কত লোক। সে তুলনায় এ আসর অনেক ছোট। [ঐ]

বাংলার উৎসব ও গান একই সূত্রে জড়িত। কানু বিনা যেমন গীত নাই,

---

* বালার লোকসাহিত্য/১ম খণ্ড/পৃঃ ৩২৭/ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য।

তেমনি গীত বিনা কোন উৎসব নাই। ডোম বাউরী পাড়ায় ঘেঁটু গানের আসর বসেছে তারই সুন্দর আলেখ্য রচনা করেছেন তারাশঙ্কর।

গায়ক ও বাদকের দল অপেক্ষা করিয়াই ছিল, তাহারা আরম্ভ করিয়া দিল। ঢোলকের বাজনার সঙ্গে মন্দিরার ধ্বনি, গায়কের দল আরম্ভ করিল—

শিব-শিব-রাম-রাম

ছোট ছেলের দল নাচিতে নাচিতে হাতে তালি দিয়া ধুয়া ধরিল

শিব-শিব-রাম-রাম

গায়কেরা গান গাহিল—

এক ঘেঁটু তার সাত বেটা।
সাত বেটা তার সাতান্ত
এক বেটা তার মহান্ত
মহান্ত ভাই রে,
ফুল তুলতে যাইরে,
যত ফুল পাইরে
আমার ঘেঁটুকে সাজাই রে!

সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক লাইনের পর ছেলেরা তালি দিয়া গান গাহিয়া গেল—

শিব-শিব-রাম-রাম

এই গান শেষ হইবার পর আরম্ভ হইল অন্য গান, স্থানীয় বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া ইহাদের গান আছে:

হায় এ জল কোথায় ছিল
জলে জলে বাংলা মুল্লুক ভে·সে গেল

বহুদিন আগে যখন রেলওয়ে লাইন পাতিয়া ছিল, সে গান আজও ইহারা গায়।

সাহেব রাস্তা বাঁধাল
ছ'মাসের পথ কলের গাড়ি দণ্ডে চালালে।

আজন্মা বৎসরের গান

ঈশান কোণে ম্যাঘ লেগেছে দেবতা করলে শুকো।
একছিলিম তামুক দাওগো সঙ্গে আছে হুঁকো।

আজ তাহারা আরম্ভ করিল,

দেশে আসিল জরীপ
রাজা-পেজা ছেলে বুড়োর বুক টিপ টিপ

ছেলেরা ধুয়া ধরিল—হায় বাবা, কি করি উপায় ?
প্রাণ যায় তাকে পারি—মান রাখা দায়

গায়কেরা গাহিয়া চলিল— পিওন এল, আমিন এল, এল কানুন গো
বুড়ো শিবের দরবারে মানত মানুনগো
বুঝি আর মান থাকে না ॥

ছেলেরা গাহিল—হায় বাবা কি করি উপায়
হাকিম এল ঘোড়ায় চড়ে সঙ্গেতে
আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া হল দেশটায়
বুঝি আর মান থাকে না ॥
তাঁবু এল, চেয়ার এল, কাগজ গাড়ি গাড়ি
নোয়ারই ছেকল এল চল্লিশ মণ ভারী
ক্ষেতে বুঝি ধান থাকে না ॥
তে-ঠেঙ্গে টেবিল গেতে লাগিয়ে দুরবীণ
এখানে ওখানে পোঁতে চিনে মাটির পিন ।
কুলীদের প্রাণ থাকে না ॥
কুঁচবরণ রাঙা চোখ তারার মতন ঘোরে ।
দন্ত কড়মড়ি হাঁকে—এই উল্লুখ ওরে ।
হায় কলিতে মাটি ফাটে না ॥
পণ্ডিত মশাই দেবু ঘোষ তেজিয়ান বিদ্বান
জ্ঞানের চেয়ে তার কাছে বেশী হল মান
ও সে আর সইতে পারে না ॥
কানুন গো কহিল—‘তুই’, সে করে ‘তুকারি’
আমার কাছে খাটবেনা তোর কোন জুরি জারি
দেবু কারোর ধার ধারে না ॥
দেবু ঘোষের পাকা ধানে ছেকল চল্লিশ মণ,
টেনে নিয়ে চলে আমিন ঝন্—ঝন্—ঝন্
ও সে কারোর মানা মানে না ।

দেবু হাসিল । বলিল—এসব করেছ কি সতীশ ? সতীশ মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল। গায়কেরা তাহার পরের ঘটনাও নিখুঁতভাবে বর্ণনা করিল । শেষে গাহিল—

দেবু ঘোষে বাঁধল এসে পুলিশ দারোগা
বলে কানুন্‌গোর কাছে হাত জোড় করগা।
দেবু ঘোষ হেসে বলে 'না' ॥
থাকিল পিছনে পড়ে সোনার বরণ নারী
ননীর পুতলী শিশু ধুলায় গড়াগড়ি
তবু ঘোষের মন টলেনা ॥

গায়কেরা গাহিল—

ফুলের মালা গলায় দিয়ে ঘোষ চলেন জেলে
অধম সতীশ লুটায় এসে তাঁরই চরণ-তলে
দেবতা নইলে হায় একাজ কেউ পারেনা।"

লোকগীতির এ অনুষ্ঠানের আসর জমজমাট, পল্লী বাংলার গ্রামে গ্রামে সতীশ বাউরীর মত গ্রাম্য কবি এরকম দিনের পর দিন লোকগীতি রচনা করে চলেছে, ঢোলক বাজিয়ে গেয়েছে উৎসাহের সঙ্গে জমিয়ে তুলেছে গ্রামীণ লৌকিক সংস্কৃতির আসরটিকে। তারাশঙ্করের 'গণদেবতার' ছত্রে ছত্রে এই লৌকিক প্রভাব অবিশ্রান্ত গতিতে প্রবাহিত। আধুনিক বিংশ শতকের মানুষ হয়েও লৌকিক সংস্কৃতি, লৌকিক ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে পারেননি তারাশঙ্কর। কারণ তা সম্ভবপর ছিল না, লৌকিক সংস্কৃতির জগৎ থেকেই তাঁর ভাবনার উদ্ভব ও মানসিকতার বিকাশ।

তারাশঙ্কর পল্লীর লৌকিক জীবন ধারায় অভ্যস্ত। তাই তার উপন্যাসেও সেই গ্রাম্য জীবনের একটি লৌকিক জীবনচর্যার সম্পূর্ণ পরিচয় ফুটে ওঠে। আধুনিক নগর সভ্যতাও যন্ত্রকেন্দ্রিক জীবনধারার পাশ দিয়ে সে একটি সরল অনাড়ম্বর কৃষি ভিত্তিক লৌকিক গ্রাম্য জীবন প্রবাহিত হয়ে চলেছে। তার একটি নিখুঁত বর্ণনা পাই "গণদেবতায়"।

"চাষ আর বাস' পল্লীর জীবনে দুইটা ভাগ, মাঠ আর ঘর—এই দুইটি ক্ষেত্রেই এখানে সকল আয়োজন সকল সাধনা। আষাঢ় হইতে ভাদ্র-এই তিন মাস পল্লী-বাসীর দিন কাটে মাঠে—কৃষির লালন পালনে। আশ্বিন হইতে পৌষ সেই ফসল কাটিয়া ঘরে তোলে। সঙ্গে সঙ্গে করে রবি ফসলের চাষ। এই সময়টাও পল্লী জীবনের বারো আনা অতিবাহিত হয় মাঠে। মাঘ হইতে চৈত্র পর্যন্ত তাহার ঘরের জীবন। ফসল ঝাড়িয়া দেনা-পাওনা মিটাইয়া সঞ্চয় করে, আগামী চাষের আয়োজন করে, ঘরের ভিতর-বাহির গুছাইয়া লয়। প্রয়োজন থাকিলে নূতন

ঘর তৈয়ারী করে, পুরানো ঘর ছাওয়ায়, মেরামত করে, কাটিয়া জল দেয়, শন পাকাইয়া দড়ি করে, গল্প-গান-মজলিস করে, চোখ বুজিয়া হরদম তামাক পোড়ায় ; বর্ষার জন্য তামাক কাটিয়া গুড় মাখিয়া হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া জলের ভিতর পুঁতিয়া পচাইতে দেয়। চাষীর পরিবারে যত বিবাহ সব এই সময়ে মাঘ ও ফাল্গুনে।"

(গণদেবতা পৃঃ ২১৯)

সন্তানের কল্যাণ কামনায় লৌকিক ব্রতানুষ্ঠান বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত। অশোক ষষ্ঠী এ রকমই একটি ব্রত। গ্রাম্যনারীর বারব্রতের এই লৌকিক ঐতিহ্যটিকে কিভাবে প্রবহমান রেখেছে তার চিহ্ন আছে তারাশঙ্করের 'গণদেবতায়'।

"অশোক ষষ্ঠীর দিন, এই ষষ্ঠী যাহারা করে তাহাদের সংসারে নাকি কখনও শোক প্রবেশ করে না, 'হারালে পায়, মলে জীয়োয়। অর্থাৎ কোন কিছু হারাইয়াও হারায়না, হারাইলে ফিরিয়া পায়—মরিলেও মরে না, পুনর্জীবিত হয়। অশোক ষষ্ঠীর কল্যাণে মেয়েরা সকাল হইতে উপবাস করিয়া আছে। ষষ্ঠী দেবীর পূজা করিয়া ব্রতকথা শুনিবে। অশোক ফুলের আটটি কুঁড়ি খাইবে। প্রসাদী দই·হলুদ মিশাইয়া তাহারই ফোঁটা দিবে ছেলেদের কপালে। তারপর খাওয়া দাওয়া সে সামান্যই। অন্নগ্রহণ নিষেধ। (পৃঃ ২৩৩)

আধুনিক সভ্যতা ও ইংরাজী শিক্ষার সর্বগ্রাসী প্রভাবও সে গ্রাম্য নারীর মন থেকে লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি তার পরিচয় আছে বর্তমানের গ্রাম গুলিতে। আজও সেখানে অশোক ষষ্ঠী থেকে শুরু বিভিন্ন ষষ্ঠীপূজা বারব্রত প্রচলন আছে, অনেক নাগরিক জীবনেও। শাস্ত্রীয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মাঝখানে লৌকিক আচারানুষ্ঠান যে নষ্ট হয়ে যায় নি তার পরিচয় আজও পাওয়া যায় তারাশঙ্করের মধ্যে। এই লৌকিক ঐতিহ্যের প্রভাব কতখানি তার সার্থক দৃষ্টান্ত মেলে বাংলা দেশের ষষ্ঠীপূজাগুলির একটি বর্ণনা উপস্থাপনের মধ্যে। মা ষষ্ঠীর বর্ণনা।

"বারো মাসের তেরো ষষ্ঠী। মাসে মাসে স্বর্গ হইতে আসে ষষ্ঠী দেবীর নৌকা, বারো মাসে তেরো রূপে তিনি মর্ত্যলোকে আসেন—পৃথিবীর সন্তানদের কল্যাণের জন্য। সিঁথিতে ডগ্ মগ্ করে সিঁদুর, হাতে ঝল মল করে শাঁখা, সর্বাঙ্গে হলুদের প্রসাধন, ডাগর চোখে কাজল। পরের সাতপুতকে কোলে রাখেন। নিজের সাতপুত থাকে পিঠে।

"বৈশাখ মাসে চন্দন ষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠে অরণ্য-ষষ্ঠী আষাঢ়ে বাঁশ-ষষ্ঠী, শ্রাবণে লুণ্ঠন

বা লোটন ষষ্ঠী, ভাদ্রে পেটা ষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গা-ষষ্ঠী, কার্তিকে কালী-ষষ্ঠী, অগ্রহায়ণে—অখণ্ড ষষ্ঠী সংসারকে অখণ্ড পরিপূর্ণ করিয়া দিয়া যান। পৌষে-মূলষষ্ঠী, মাঘে শীতলা ষষ্ঠী, ফাল্গুনে গোবিন্দ-ষষ্ঠী, চৈত্রে অশোক তরু যখন ফুলভারে ভরিয়া উঠে, তখন শোক দুঃখ মুছিতে আসেন মা অমোঘ ষষ্ঠী। তারই কল্যাণ স্পর্শে আনন্দে সুখে ওই ফুল ভরা অশোক গাছের মতই সংসার হাসিয়া উঠে। অশোকের পর আছে নীল-ষষ্ঠী, গাজন সংক্রান্তির পূর্ব দিন। তিথিতে ষষ্ঠী না হইলেও—ওইদিন হয় নীলষষ্ঠী।"

গ্রাম্য জীবনে এর প্রভাব :

"পদ্ম সকালবেলা হইতে গৃহকর্ম সারিয়া ফেলিবার জন্য ব্যস্ত। কাজ সারিয়া স্নান করিবে, ষষ্ঠীর পূজা আছে. ব্রতকথা শুনিতে যাইবে বিন্দুর বাড়ি। তারপর অশোকের কলি খাইতে হইবে। তাহার আবার মন্ত্র আছে।"

[পৃঃ ২৩৪)

সর্পঘাত ও ওঝার বিশ্বাস বাংলাদেশের লৌকিক জনজীবনে ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। দুর্গা যখন সাপে কাটার ভান করে ছিল, উপন্যাসের মধ্যে তখনকার কয়েকটি সংলাপ উদ্ধৃত করলে—ওঝা সম্পর্কিত লৌকিক বিশ্বাসটি (Folk belief) সুপরিস্ফুট হবে।

(১) "শ্রীহরি বলিল—সেই ভাল ভূপাল ওকে বাড়িতে দিয়ে আসুক। দীনু ওঝা, আর মিতে গড়াঞীকে ডাক। (পৃঃ ২৫০)

(২) সতীশ একরূপ ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল ঔষধের সন্ধানে। কিছুকাল পর ফিরিয়া আসিয়া একটা শিকড় দিয়া বলিল চিবিয়ে দেখ দেখি—তেতো লাগছে না মিষ্টি লাগছে? দুর্গা সেটিকে মুখে দিয়াই পরক্ষণেই ফেলিয়া দিল—থু-থু-থু। সতীশ আশ্বস্ত হইয়া বলিল—তেতো যখন লেগেছে তখন ভয় নাই।

(পৃঃ ২৫৬)

সর্প দংশন ও তার প্রতিকার সম্পর্কিত এরূপ লৌকিক বিশ্বাস (Folk belief) আজও প্রচলিত আছে। ওঝা, শিকড় ইত্যাদির প্রয়োগ ব্যবস্থা তারই প্রমাণ পাওয়া যায়।

ওদিকে কথকতার আসর বসেছে, দেবুর বাড়িতে। ন্যায়রত্ন মশাই দেবুর আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে গল্প শুরু করেছেন।

এক ব্রাহ্মণ ছিলেন মহাকর্মী মহাপুণ্যবান। জ্যোতির্ময় ললাট সৌভাগ্য-লক্ষ্মী স্বয়ং ললাটের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে ছিলেন। তার প্রতিটি কর্ম ছিল মহৎ

এবং প্রতিটি কর্মেই ছিল সাফল্য। কারণ যশলক্ষ্মী আশ্রয় নিয়ে ছিলেন তার কর্ম শক্তিতে। তার কুল ছিল অকলঙ্ক, পত্নী-পুত্র-কন্যা বধূর গৌরবে অকলঙ্ক কুল উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল। কারণ কুললক্ষ্মী তার কুলকে আশ্রয় করেছিলেন, পাপ অহরহ ঈর্ষাতুর অন্তরে ব্রাহ্মণের বাসভূমির চারিদিকে অস্থির হয়ে ঘুরে বেড়ায়। তার সহ্য হয় না। বহু চিন্তা করে সে একদিন সঙ্গে করে আনল অলক্ষ্মীকে বাড়ির বাইরে থেকে ব্রাহ্মণকে ডাকলে। ব্রাহ্মণ বললেন কি চাও বল।

পাপ বলিল—আমি বড় দুর্ভাগা। দুঃখ-কষ্টের সীমা নাই, আমার সঙ্গিনীটিকে আপনি কিছু দিনের জন্য আশ্রয় দিন এই আমার প্রার্থনা।

ব্রাহ্মণ বলিলেন—আমি গৃহস্থ, আশ্রয় প্রার্থী দুঃস্থকে আশ্রয় দেওয়া আমার ধর্ম, বেশ থাকুন উনি, বধূ-কন্যার মতই যত্ন করব। ইচ্ছা হলে যতদিন দুর্ভাগ্যের শেষ না হয়, ততদিন তুমিও থাকতে পার। এস, তুমিও এস, আহ্বান সত্ত্বেও পাপ কিন্তু প্রবেশ করতে সাহস করল না। কারণ ব্রাহ্মণকে আশ্রয় করে রয়েছেন ধর্ম।

যাক অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিপর্যয় ঘটল। ফলবান বৃক্ষগুলির ফল যেন নীরস হয়ে গেল, ফুল ম্লান হল।

রাত্রে ব্রাহ্মণ জপ করছেন এমন সময় শুনতে পেলেন এক করুণ কান্না। কেউ যেন করুণ সুরে কাঁদছে। বিস্মিত হয়ে জপ শেষ করে উঠতেই তিনি দেখলেন—তাঁরই ললাট থেকে বেরিয়ে এল এক জ্যোতি। সেই জ্যোতি ক্রমে এক নারী মূর্তি ধারণ করল। তিনিই এতক্ষণ কাঁদছিলেন। ব্রাহ্মণ প্রশ্ন করলেন—কে মা তুমি?

রমণী মূর্তি বললেন—আমি তোমার সৌভাগ্য লক্ষ্মী। এতদিন তোমার ললাটে আশ্রয় করেছিলাম, আজ তোমায় ছেড়ে যেতে হচ্ছে তাই কাঁদছি।

ব্রাহ্মণ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন—একটা প্রশ্ন করব মা, আমার অপরাধ কি হল?

—তুমি আজ অলক্ষ্মীকে আশ্রয় দিয়েছো। (পৃঃ ১১)

গল্পটি দীর্ঘ কিন্তু সুলিখিত এবং সুকথিত। বাংলাদেশের গ্রাম্য চণ্ডীমণ্ডপে যে কথকতার আসর বসতো, গৃহাঙ্গণে যে রূপকথা-ব্রতকথা-উপকথার আসর হয়ে উঠতো তারই বিশিষ্ট ভঙ্গী প্রকাশিত হয়েছে, প্রাচীন পণ্ডিত ন্যায়রত্ন মশাই এর গল্প কথনে।

গাজন বাংলাদেশের একটি লৌকিক পার্বণ ও পূজানুষ্ঠান। তারাশঙ্করের গণদেবতায় সেই গাজন উৎসবের রেশ কিভাবে বাংলার গ্রাম্য জীবনকে অধিকার করে আছে তার একটি পরিপূর্ণ পরিচয় উপস্থিত হয়েছে। আধুনিক সভ্যতার পাশ দিয়েই এই লৌকিক ঐতিহ্যের ধারা কিভাবে প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার সার্থক দৃষ্টান্ত গণদেবতা। একদিন গাজন ছিল সমস্ত গ্রামের উৎসব।

দেবুর সংলাপে :"এত দিনের গাজন, আমাদের গ্রামের গাজনে কত ধুম ছিল। সমস্ত গ্রামের লোক প্রাণ দিয়ে খাটত। অন্য গাঁয়ের সঙ্গে আমাদের গাজনের ধুমের পাল্লা চলত। সে সব উঠে যাবে নয় তো শ্রীহরির একলার হাতে গিয়ে পড়বে। দেবতাতে সুদ্ধ আমাদের অধিকার থাকবে না।" (পৃঃ ২৮১)

ঢাকের বাজনায় বাংলাদেশের গ্রাম চৈত্র মাসের শুরু থেকে মুখরিত থাকতো। তাই গণদেবতার নায়ক দেবুর ঘুম ভেঙ্গেছে গাজনের ঢাকের আওয়াজে।

"ঢাকের বাজনার শব্দে ভোরবেলাতেই—ভোরবেলা কেন—তখনও খানিকটা রাত্রি ছিল। যতীনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। গাজনের ঢাক, পূর্বে চৈত্রের প্রথম দিন হইতেই গাজনের ঢাক বাজিত।" (পৃঃ ২৮১

"সে আশ্চর্য হইয়া গেল,—গ্রামখানায় এই শেষ রাত্রেই জাগরণের সাড়া উঠিয়াছে। ঢেঁকিতে পাড় পড়িতেছে, মেয়েরা ইহারই মধ্যে পথে বাহির হইয়াছে। হাতে জলের ঘটি। চণ্ডীমণ্ডপে জল দিতে চলিয়াছে, রাঙাদিদি বড় বড় করিয়া তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম করিতেছে। এখান হইতে শোনা যাইতেছে।

জনকয়েক গাজনের ভক্ত স্নান শেষ করিয়া ফিরিতেছে। তাহারা ধ্বনি দিতেছে—বলো শি—বো—শিবো! হর—হর বোম্—হর—হর বোম্।"

গাজনের আবিভাবে গ্রাম্যজীবনে কিরূপ পরিবর্তন আসে তারই জীবন্ত কথাচিত্র অঙ্কন করেছেন তারাশঙ্কর। লৌকিক মানসিকতায় তাঁকে উদ্বুদ্ধ করেছে, লৌকিক পর্ব পার্বন ধর্ম, বার ব্রত গুলির প্রতি এত আকৃষ্ঠ করেছে। তাই গণদেবতার জীবনবন্দনায় লৌকিক ঐতিহ্যের প্রতি এত অনুরাগ। গাজনের আবির্ভাবে গ্রাম্যজীবনের আনন্দ উৎসাহের সঙ্গে দলাদলি ও স্বার্থ সিদ্ধির এক অপূর্ব ও নিখুঁত দ্বন্দ্বময় জীবনসঙ্গীত রচনা করেছেন তারাশঙ্কর :

"বিশ তারিখ হইতে গাজনের ঢাক বাজিয়াছে, মাঠের চেঁচুড়ে দীঘি হইতে বুড়াশিব চণ্ডীমণ্ডপ হাঁকাইয়া বসিয়াছেন, তাহারা দুই জনে নন্দী-ভৃঙ্গীর মত অহরহ চণ্ডীমণ্ডপে হাজির আছে। গাজনের ভক্তের দল বান—গোঁসাই লইয়া গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা সাধিতে যায়---ছোঁড়া দুইটাও সঙ্গে সঙ্গে ফেরে।

গ্রামে গাজনে এবার প্রচুর সমারোহ। শ্রীহরি চণ্ডীমণ্ডপে দেউল ও নাট মন্দির তৈয়ারীর সঙ্কল্প মুলতুবি রাখিলেও হঠাৎ এই কাণ্ডের পর গাজনে আয়োজনে সে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছে। ছোট ধরনের একটি মেলারও আয়োজন করিয়া ফেলিল। দুই দল ভাল বোলাম গান—একদল ঝুমুর একদল কবিগানের পালার ব্যবস্থা করিয়া সে গ্যাঁট হইয়া বসিল।" (পৃঃ ২৯৩)

গাজনের সমস্ত বর্ণনাই তারাশঙ্কর তাঁর গণদেবতায় প্রসঙ্গত উপস্থিত করেছেন। যেমন নীলপূজা, চড়ক, আগুন খেলা ইত্যাদি।

চৈত্র সংক্রান্তির পূর্বদিন নীল-ষষ্ঠী। তিথিতে ষষ্ঠী না হইলেও মেয়েদের যাহাদের নীলের মানত আছে, তাহারা ষষ্ঠীর উপবাস করিবে। পূজা করিবে সন্তানের কপালে ফোঁটা দিবে। নীল অর্থাৎ নীলকণ্ঠ এই দিনে নাকি লীলাবতীকে বিবাহ করেছিলেন। লীলাবতীর কোল আলো করিয়া নীলমণির শোভা। নীল ষষ্ঠী করিলে, নীলমণির মত সন্তান হয়।',

"সন্ধ্যায় গাজনের পূজা শেষ। চড়ক শেষ হইয়াছে, ভক্তদের আগুন লইয়া ফুল খেলাও শেষ হইয়া গিয়াছে। বলি হোমও হইয়া গিয়াছে। ঢাকির দল প্রচণ্ড উৎসাহে ঢাকের বাজনার কেরামতি দেখাইতেছে। বড় বড় ঢাক, ঢাকের মাথায় দেড়হাতি লম্বা পালকের ফুল। এ ঢাকের আওয়াজ প্রচণ্ড,"

"চড়কের পাটা বাহির হইয়াছে। ঢাক বাজাইয়া ভক্তরা গ্রামে গ্রামে ফিরিতেছে। একটা লোহার কাঁটায় কণ্টকিত তক্তার উপর একজন ভক্ত শুইয়া থাকিবে। সে কি সোজা কথা? সেই বিস্ময়কর ব্যাপারের পিছনে পিছনে তাহারা ফিরিতেছে। আগে বান ফোঁড়া হইত, এখন আর হয় না," (পৃ ২৯৪)

ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতার বিস্তার বাংলাদেশের মৌলিক সত্তাকে গ্রাস করতে পারে নি। শহরে হয়ত কিছু পরিমাণে তা সম্ভব হয়েছিল কিন্তু গ্রামে তার প্রভাব খুব অল্পই এসেছে। তাই সেখানে উচ্চতর শাস্ত্রীয় ধর্মের চেয়ে লোকাচার ও লৌকিক ধর্মের প্রভাব আজও কিরূপ অব্যাহত—গণদেবতার লেখক তা দেখাবার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন প্রসঙ্গে। কয়েকটি উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। গাজন পার্বনের প্রভাব "সবাই গাজনের উপবাস করে, এ কথাটা গোবরা অস্বীকার করিতে পারিলনা। গাজনের উপবাস প্রায় সার্বজনীন। বাউড়ী-বায়েন হইতে উচ্চতম-বর্ণ ব্রাহ্মণ পর্যন্ত আজ প্রায় সকলেরই উপবাস।" (পৃ ২৯৬)

গ্রামে—'নাম্নে' অর্থাৎ কলেরা আরম্ভ হয়েছে সঙ্গে গ্রাম্যজীবনের পরিবর্তন। একদিকে"চণ্ডিমণ্ডপে খোল-করতাল লইয়া হরিনাম সংকীর্তনের দল বাহির করিবার

উদ্যোগ হইতেছে। মৃদঙ্গের ধ্বনিতে নাকি অমঙ্গল দুরীভূত হয়। আর অন্য দিকে "ও পাড়ায় ধর্মদেবের পূজার আয়োজন চলিতেছে", বৈষ্ণবিকতার সঙ্গে লৌকিক ধর্মপূজার এক অপূর্ব সংমিশ্রণের পরিচয় ফুটে উঠেছে বাংলার গ্রাম্য জীবনে।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—হাসি কান্না উৎসবের মধ্যদিয়েই বয়ে চলেছে বাংলার গ্রাম্য জীবন। তাই মহামারীর করাল ছায়া গ্রাম্য জীবনের উৎসব ও আনন্দ বা পর্ব পার্বণকে ম্লান করতে পারেনি। তাই চৈত্রের গাজনের পরেই আবার ঢাকের কাঠিতে আওয়াজ পড়েছে অম্বুবাচীর আমুতির লড়াই। গ্রাম্য জীবনে দুঃখ আছে, অভাব আছে শত শত কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে আছে বারো মাসে তেরো পার্বন। কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বাংলার গ্রামীণ জীবনের এই জীবনী শক্তিটুকুকে বেশ ভালো করেই ধরতে পেরেছিলেন। উপলব্ধি করেছিলেন মহামারী দারিদ্র্য ও অভাব অনটনের মধ্যেও গ্রামবাংলার লৌকিক জীবন যে শেষ হয়ে যায়নি তার কারণ হচ্ছে পর্ব পার্বণ ও লৌকিক উৎসবাদি। এগুলি শত দুঃখের মধ্যে গ্রাম্য মানুষের জীবনকে সরস করে রাখে। গাজনের পর যে মহামারী এসেছিল তাতেও গ্রামের মানুষ ভীত হয় নি। তাই আষাঢ়ের অম্বুবাচীতে আবার ঢাকের কাঠিতে আওয়াজ পড়েছে।

"আষাঢ় মাসের প্রথম সপ্তাহে, সাত তারিখে অম্বুবাচী পড়িল। ধরিত্রী নাকি এই দিনটিতে ঋতুমতী হইয়া থাকেন। অম্বুবাচীর তিনদিন হলকর্ষণ নিষিদ্ধ। গ্রামে ঢোল বাজিতেছে, লড়াইয়ের ঢোল।" (পৃঃ ৩২১)

এই অম্বুবাচীর সঙ্গে সঙ্গে লৌকিক উৎসবের সমারোহ ঃ" অম্বুবাচীতে চাষীদের মধ্যে কুস্তি প্রতিযোগিতা হইয়া থাকে। চলতি ভাষায় ইহাকে বলে 'আমুতির লড়াই', এখানকার মধ্যে কুসুমপুর ও আলেপুরেই সমারোহ সর্বাপেক্ষা বেশী। এই দুইখানি মুসলমানের গ্রাম। অম্বুবাচির লড়াই হিন্দু মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের সমারোহের বস্তু, চাষের পুর্বে চাষীরা বোধহয় শক্তি পরীক্ষা করে। এ অঞ্চলের মধ্যে ভরতপুরে হয় সর্বাপেক্ষা বড় লড়াইয়ের আখড়া। বিভিন্ন স্থান হইতে নামকরা শক্তিমান চাষীরা যাহারা এখানে কুস্তিগীর বলিয়া খ্যাত, তাহারা যোগ দেয়, ভরতপুরে যে বিজয়ী হয়, সেই এ অঞ্চলে শ্রেষ্ঠ বীর বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে। তবে শক্তিচর্চায় শক্তি প্রতিযোগিতায় মুসলমানদের আগ্রহ অপেক্ষাকৃত বেশী।

তারাশঙ্করের শিল্প মানসের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য গ্রামীণ উৎসব ও লৌকিক পর্ব-

পার্বণগুলির একটি সঠিক রূপ ও গ্রাম্য জীবনে তার প্রভাব সার্থক ভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, 'গণদেবতার' প্রতিটি পর্বে তার পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

রাধা

রাধা তারাশঙ্করের একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, ১৭২৬।২৭ খ্রীষ্টাব্দ বাংলার মসনদে তখন সদ্য বসেছেন জাফর খাঁর একমাত্র জামাতা সুজাউদ্দীন। এই পটভূমিকায় বৈষ্ণব সমাজ ও দার্শনিকতার প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি রচিত। এই উপন্যাসের মধ্যেও স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে লৌকিক প্রভাব।

ডাইনী বিদ্যা (witch craft) বাংলাদেশ তথা সারা পৃথিবীরই একটি লোক বিশ্বাস (Folk belief)। ইউরোপীয় নাট্যকারগণের নাটকে ও অন্যান্য সাহিত্য ধারার মধ্যে এই ডাইনী বিদ্যার নানা পরিচয় ও প্রভাব আছে। এই বিশ্বাস যে লোকস্তর থেকে উদ্ভূত হয়ে জনজীবনের স্তরে স্তরে আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার পরিচয় ওই সাহিত্য পাঠ করলে বেশ স্পষ্টরূপে অনুভব করা যায়। রাধা উপন্যাসের প্রেমদাস বাবাজীর সিদ্ধপাট এ আখড়া হল লোহার বাসর ঘরের চেয়েও নিরাপদ। এর উপরেও লোক বিশ্বাস যে:

'কৃষ্ণদাসী নিজে অনেক সিদ্ধ বিদ্যা জানে। প্রেমদাসের বৈষ্ণবী আসামের মেয়ে ছিল। ডাকিনী বিদ্যা জানতো। কৃষ্ণদাসীকে সে বিদ্যা সে দিয়ে গেছে। সাধনা করে ভগবান পেয়ে যে সিদ্ধি তা কেউ কাউকে দিতে পারে না, কিন্তু এসব বিদ্যা দেওয়া যায়। কৃষ্ণদাসী ঘর বন্ধন জানে অঙ্গ-বন্ধন জানে। যাবার আগে এক মুঠো সরষে হাতে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ে আখড়ার চারিপাশে ছড়িয়ে দিয়ে যাবে, ওই সরষের গণ্ডী লঙ্ঘনের সাধ্য কারুর নেই। প্রতিটি সরষে হয়ে উঠবে এক এক সাপ। গণ্ডীর ভিতর পা বাড়ালেই ফণা তুলে দংশন করবে। মন্ত্র পড়ে মোহিনীর অঙ্গ-বন্ধন করে দিয়ে যাবে। সে অঙ্গ কেউ স্পর্শ করলে সে তৎক্ষণাৎ পড়ে মরে যাবে। (পৃ: ৩০)

এই ডাকিনী বিদ্যা, ঘর বন্ধন, অঙ্গ-বন্ধন, সরষে নিয়ে মন্ত্র পড়া ও গণ্ডী দেওয়া, প্রত্যেক সরষের সাপে রূপান্তর, এ সমস্ত আদিম ও লৌকিক বিশ্বাস থেকে অদ্ভুত হয়ে আধুনিক জনমানস ও সাহিত্যের মধ্যেও যে প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার জীবন্ত উদাহরণ।

দাস সরকারের ছেলে অক্রুর লম্পট, অত্যাচারী, তার দিকে তাকিয়ে সিদ্ধাই কৃষ্ণদাসী বলেছে, আমি তোমাকে ডাকিনী বিদ্যেতে বান মেরে গেড়ে ফেলব ছোট

দরকার। বর্গীয়া পা ভেঙ্গে দিয়েছে-সে সারবে, খুড়িয়ে হলেও চলতে পারবে। আমার বানে তোমাকে চিরজীবন পঙ্গু হয়ে পড়ে থাকতে হবে। বোবা শুদ্ধ করে দিই আমি! আমার শ্বশুরের সিদ্ধাই হারায় নি, সে আমার কাছে আছে।

(পৃঃ ১৩১)

এরই প্রতিক্রিয়া যে কতদুর তার পরিচয় আছে ওই উপন্যাসে অক্রুর প্রচণ্ড ভীত হয়েছে। এই হচ্ছে এ ধরণের লোক বিশ্বাসের প্রভাব।

"বাট বওয়া" ডাকিনী বিদ্যার অঙ্গ, তারাশঙ্কর তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন যে প্রেমদাস বাবাজীর বষ্টুমী, মোহিনীর পিতামহী ছিলেন কামরূপের মেয়ে। বাবাজী গিয়েছিলো মনিপুর, সেখান থেকে ফেরবার সময় নিয়ে এসেছিলো বোষ্টুমীকে লোকে বলে, কেষ্টদাসী ও বলে শাশুড়ীর ডাকিনী বিদ্যা কৌটোয় পুরে রেখেলিয়েছিল—সেই কোটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে সে বিদ্যা কেষ্ট দাসীর আয়ত্ত হয়েগিয়েছে। উপন্যাসে তারই পরিচয়:

"উন্মাদিনীর মত ঘুরছে কেষ্টদাসী। চুল এলিয়ে পড়েছে, গায়ের কাপড় মাটিতে লুটাচ্ছে, আকাশের দিকে মুখ করে সে ঘুরছে। ফিস ফিস করে কয়ো বললে—'বাট' বাইছে বোধ হয়। (পৃঃ ১৩৪)

তারাশঙ্করের ভাষায় এই 'বাটবওয়া'র বর্ণনা:

ডাকিনী বিদ্যাকে জাগাতে হলে বাট বইতে হয়। তার শুরুটা ঠিক এই রকম, গভীর রাত্রে চারিদিক নিশুতি হলে মা—জী মাথা নিচু দিকে করে পা উপরের দিকে তুলে হাতের উপর হেঁটে বেড়াবে। সারা অঙ্গে একগাছি সুতো বলতে থাকবেনা। সে সময় কেউ যদি সামনে আসে তবে সঙ্গে সঙ্গে সে চীৎকার করে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যাবে—এবং তাতেই হবে তার সুনিশ্চিত মৃত্যু। (পৃঃ ১৩৫)

এ বর্ণনা অত্যন্ত জীবন্ত তার কারণ এ বিশ্বাস তারাশঙ্করের জীবনজাত।

গ্রাম্য মানুষের মধ্যে এই লোক বিশ্বাসের প্রভাব কতদুর তারও প্রভাব আছে তারাশঙ্করের রাধা উপন্যাসে। তাই মহাপাষণ্ড অক্রুর যখন সঙ্গী কেলে ডোমকে মোহিনীকে তুলে আনবার আদেশ দিয়েছে তখন সে ভীত হয়ে বলেছে: 'ছামনে আমি যাবনা। ও—বাবা কাপড় খানা টেনে খুলে ফেলে দেবে আর আমার খাল খানা (চামড়া) চড় চড় করে ছড়া পাঁঠার মত টেনে ছাড়িয়ে নেবে। বাপরে।"

(পৃঃ ১৪৯)

এরপরেই কেলে ডোমের অলৌকিক ও অতি বিশ্বাসের এক অলৌকিক উপকথা।

"কথাটা মিথ্যে নয় তার সাক্ষী জয়দেব কেন্দুলী যাবার পথের পাশে হেলে পড়া অশ্বত্থ গাছটা, কেলে ডোমের ঠাকুরদাদা জানত ডাকিনী বিদ্যা সে তার এক সাঙাতের সঙ্গে এক পূর্ণিমার রাত্রে ঠাণ্ডা হাতে বসেছিল। তখনও কুলীর্থা নবাব হয়ে বসেনি। ঠ্যাঙারের কাল—ডাকাতি ব্যবসার খুব ফলাও অবস্থা,পথে রাহাজানি দিনের বেলাতেও চলত। কেলের ঠাকুরদার ঘরে তখন দুটো পরিবার একটা রক্ষিতা। শাহি জোয়ান আর গুণীনের বিদ্যেতে তেমনি ডাকসাইটে গুণীন। পথে লোক ছিল না। তাকিয়ে আকাশের দিকে! আশ্বিনের ধোয়া মোছা আকাশে ষোল কলায় ঝলমলে চাঁদের আলোয় সে যেন দুধ সাগরে বান ডেকেছে। হঠাৎ একটা সোঁ সোঁ শব্দ উঠলো আর মনে হল যেন একটা প্রকাণ্ড পাখী পাখা মেলে উড়ে যাচ্ছে। কেলের ঠাকুর দাদা হেসে বলেছিল কি বলতো ?

সাঙাত বলেছিল—তাই তোরে! কি পাখী বল দিইনি ?—পাখী নয়। ডাকিনী। গাছে চড়ে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে। সাঙাত বলেছিল—মিছে কথা। সব তোর ধাপ্পা। ওই ডাকিনী বিদ্যে শুদ্ধ তোর ধাপ্পাবাজী। কই কখনও তো পেমান দিস নাই।

পাখীকে বলে ডাকিনী, মদের মুখে গালাগাল হয়ে গিয়েছিল। কেলের ঠাকুর-দাদা বলেছিল তবে দেখ—শালা। চোখে দেখ, বলেই হেঁকেছিল মন্তর। বিচিত্র কাণ্ড বিরাট পাখীটা চলেছিল সোজা তীরের মত পূব থেকে পশ্চিমে। সেটা আকাশে পাক খেতে শুরু করেছিল। যেন ঘুরতে শুরু করল। এবং নামতে লাগল ধীরে ধীরে। সাঙাত অবাক। পাখীটা যতই নামছে তত যেন সত্যিই গাছ হয়ে উঠছে। ডালপালা কাণ্ড স্পষ্ট দেখা যেতে লাগল। তারপর গাছটা ওই ভাবে হেলে মাটির উপর নামল। একটা দু'ডালের অশথ গাছ। তার ডালের উপর বসে এক উলঙ্গিনী এলোচুল রূপসী মেয়ে। দুই হাতে মুখ ডেকে বললে—নামালে যদিতো লজ্জা রাখ গুণীন। দাও কাপড় না হয় গামছা দাও একখানা। দাও দাও।

কেলের ঠাকুরদা তখন মেতেছে। সে হা-হা করে হেসে উঠেছিল। আকাশে চন্দ সূয্যি সাত তারা। তাদের ছামনে লজ্জা নাই যত লজ্জা মাটির ওপর। মানুষের ছামনে ? নাম নাম গাছ থেকে নাম্। মুখ থেকে হাত খোল—চাঁদ বদনটা দেখি।

নামল মেয়েটা, হাতও খুললে, চোখে যেন জল। মুখে বললে—ওগো আমি মেয়ে মানুষ।

সঙ্গে সাঙাত আর থাকতে পারেনি। নিজের গামছা খানা মাথা থেকে খুলে ছুঁড়ে দিয়ে বলেছিল এই নাও।

কোলের ঠাকুরদাদা চীৎকার করে উঠেছিল—করলি কি? করলি কি? হাত বাড়িয়ে ছুঁড়ে দেওয়া গামছা খানা ধরতেও চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তখন মেয়েটার হাতে গামছা পৌঁছে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে জোৎস্নায় ঝলমলে মাঠ খানা আকাশ খানায় যেন বিনা মেঘে বিদ্যুৎ চমকে চমকে উঠল, বিদ্যুৎ নয় ওই উলঙ্গিনী মেয়েটার খিল খিল হাসিতে। ওপারের গড় জঙ্গলের শালবনের পাতায় পাতায় সে হাসি বাতসে তুললে। মেয়েটা সেই গামছা খানায় দেহটা ঢেকে আবার টেনে খুলে মাথা পার করে পিছনে ফেলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে কাটা পাঁঠার ছাল ছাড়ানোর মত কেলের ঠাকুরদাদার চামড়াকে যেন টেনে ছাড়িয়ে ফেলে দিলে। একটা ছাল ছাড়িয়ে নেওয়া কাঁচা মাংসের পিণ্ডের মত পড়ে গেল সে।

সাঙাতও অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। ডাকিনী যে গাছটা চালিয়ে এসেছিল সেটা ছেড়ে দিয়ে আর একটায় উঠে সেটাকে উড়িয়ে আবার আকাশ পথে উড়ল। গাছটা পড়ে রইল ডাকিনী বিদ্যার জয় ধজা হয়ে। [পৃঃ ১৪৯]

একটি সার্থক কথকের মত লোককথাটি রচনা করেছেন তারাশঙ্কর। এর মধ্যেই ফুটে উঠেছে সে যুগের লোকবিশ্বাস এবং লৌকিক মানসিকতা এবং তার প্রভাব বর্তমান আধুনিক মানসিকতায় ও সাহিত্যে।

"রাধা" উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে আছে বাংলাদেশের বর্গীর হাঙ্গামা। বহু বছর ধরে বাংলাদেশের উপর বর্গিরা যে বীভৎস ও নারকীয় অত্যাচার চালিয়ে ছিল তারই চিহ্ন আছে—লৌকিক ছড়াতে :

ছেলে ঘুমলো পাড়া জুড়ালো বর্গী এল দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দেব কিসে।

"রাধা" উপন্যাসে আছে বর্গীর হাঙ্গামাকে কেন্দ্র করে রচিত তৎকালীন পালা বন্দী গীতি। মাধবানন্দ কেন্দুলী থেকে ফেরবার পথে একদিন রাত্রে একটি ঘাটে নৌকা বেঁধেছিলেন। সেখানে গান শুনেছিলেন, দল বেঁধে পালাবন্দ গান—

"উপায় কি করি বল, কিষ্টোকালী শিবো ভগবান কিমতে কও বাঁচে জানমান ?
বর্গীরা আইল ভ্যাশে, হাজারে হাজারে হাজারে যমদুতের সমান।
কিষ্টোকালী শিবো ভগবান।
মানুষ হইলে যম সাক্ষাৎ যমের বাড়া

দেবতারে মানে যম, মানুষ যমে ডরে দেবতারা—
মানুষে ঘর ছাড়াতে নারে, দেবতারা আগে ভাগে পালান—,
কিষ্টো কালী শিবো ভগবান।
কবি গঙ্গারামে বলে, দেবতায় কেনে দুষ
অন্তর খুঁজিয়া দেখ, কত পাপ পুষ।
ওরে মানুষে থেকা পাপ বেশী জড়ো কৈলেবিন্ধপর্বত সমান
কি করিবে, কিষ্টো কালী শিবো ভগবান।। [পৃঃ ২৭৯]

কিংবা :

এই মতে সবলোক পলাইয়া যাইতে—
আচম্বিতে বরগী ঘেরিল আইসা সাথে
কারো হাত কাটে কারু নাক কান—
একই চোটে কারু বা বধ এ পরাণ
মোহিণী রমণী বাছি, ধইরা লইয়া যাত্র-
অঙ্গুষ্টে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ।
একজনে ছাড়ে আর অন্যজনা ধরে।
রমনের ভরে তারা ত্রাহি শব্দ ছাড়ে
আকাশ কান্দে বাতাস কান্দে কান্দিছে পাষাণ—
রাখো, কিষ্টো কালী শিবো ভগবান।। [পৃঃ ২৮০]

কবি

"কবি" উপন্যাসটি বীরভূম জেলার একটি অখ্যাত পল্লীর গ্রামীণ পটভূমিকায় একটি গ্রাম্য কবিয়াল-এর জীবনসংগ্রামের কাহিনী। বাংলার গ্রামাঞ্চলের অর্ধ শিক্ষিত অশিক্ষিত মূর্খ গ্রাম্য মানুষের জীবনে কবিগানের প্রভাব যে কতদূর এই উপন্যাসটি তারই সার্থক দৃষ্টান্ত। বাংলার নিম্নশ্রেণী ডোম, হাড়ি, বাগদী ইত্যাদি শ্রেণীর মধ্যে যে কবিয়াল আজও প্রচলিত এবং প্রবহমান 'কবি' নিতাই মহাদেব, নোটন ইত্যাদি অর্ধকল্পিত চরিত্রগুলি তারই প্রমাণ। তাই সমগ্র উপন্যাসটিতে লোকসঙ্গীতের আসর বসেছে। একদিকে কবিগান, অন্য দিকে ঝুমুর এ দুইয়ে মিলে কবি উপন্যাস একেবারে জমজমাট। আসর বন্দনা ঝুমুরের রাধাকৃষ্ণ প্রেমের লৌকিক আবেদনে কবি উপন্যাসে লোকসঙ্গীতের গ্রামীণ পরিবেশটি মূর্ত হয়ে উঠেছে।

অট্টহাস গ্রামের পীঠস্থান দেবী মহাদেবী চামুণ্ডার থানে মাঘী পূর্ণিমায় মেলা বসে। সেই মেলায় কবিগানের পাল্লা বসে। নোটনদাস ও মহাদেব পাল এ অঞ্চলের দুজন খ্যাতনামা কবিয়াল। সন্ধ্যা থেকেই লোকজন জমতে জমতে ক্রমশঃ জনতায় পরিণত হয়েছিল। আসর পাতা হয়েছে, পেট্রোমাক্স জালা হয়েছে। কবিয়ালের একজন নোটনদাস অনুপস্থিত। জনগণ ক্ষিপ্ত হয়েছে কবিগান আজ হওয়া চাই-ই। শেষ পর্যন্ত নিতাই চরণ যার বাবা ছিল সিঁদেল চোর, পিতামহ ঠ্যাঙাড়ে—অথচ বহুদিনের বাসনা ছিল কবিগান করা আসরের মাঝখানে জনতার ইচ্ছায় আসরে উপস্থিত হল। আস্তে আস্তে জমে উঠল কবিগানের আসর :

আসর বন্দনা : হুজুর---ভদ্দ পঞ্চজনে রয়েছেন যখন
সুবিচার হবে নিশ্চয় তখন—
জানি—জানি—জানি—

তারপর নিতাই চরণ ঢুলিকে বাজনার বোল দিয়েছে ধিকড়া তা-তা-ধেনৃতা, ধিকড় তা-তা-ধেনতা---গুড়-গুড় তা-তা-থিয়া-ধিকড় ;

তারপর ধরল ধুয়া—

ক-য়ে কালী কপালিনী—খ-য়ে খপ্পর ধারিণী
গ-য়ে গোমাতা সুরভি— গনেশ জননী
কণ্ঠে দাও মা বাণী।

একদল সঙ্গে সঙ্গে ব্যঙ্গ করে উঠেছে গ-য়ে গরু, ছ-য়ে ছাগল, ভ-য়ে ভেড়া। নিতাই সঙ্গে সঙ্গে গান বেঁধে উত্তর দিয়েছে।

গো-মাতা শুনিয়া সবে হাস্য করে।
দীন নিতাইচরণ বলছে জোড় করে—
শুনুন মহাশয় দীনের নিবেদন।
গো কিম্বা গরু তুচ্ছ নয়
গাভী ভগবতী, ষাঁড় শিবের বাহন।
সুরভির শাপে মজে কত রাজন ॥

ঢুলিটা ঢোলে কাঠি দিল—ডুডুম ! নিতাই আবার গাইল,

শাস্ত্রের সারকথা আরও বলে যাই।
গো-ধন তুল্য ধন ভু-ভারতে নাই ॥
তেঁই গোলকপতি—বিষ্ণু বনমালী।
ব্রজধামে করলেন গরুর রাখালী ॥

তাছাড়া মশাই—আছে আরও মানে—
গো মানে পৃথিবী শুধান পণ্ডিতজনে

এরপরই শুরু হল বড় কবিয়াল মহাদেবের পালা।

মহাদেব ছড়া গান শুরু করল :

স্বুবুদ্ধি ডোমের পোয়ের কুবুদ্ধি ধরিল।
ডোমকাটারি ফেলে দিয়ে কবি করতে আইল ॥
ও-বেটার বাবা ছিল সিঁদেল চোর, কর্তা-বাপ ঠ্যাঙাড়ে,
মাতামহ ডাকাত বেটার—দ্বীপান্তরে মরে
সেই বংশের ছেলে বেটা কবি করবি তুই।
ডোমের ছাওয়াল রত্নাকর চিংড়ির পোনা রুই ॥

একজন ফোড়ন দিল—

অল্পজল ভাল চিংড়ির—বেশী জলে যাসনা।

দোয়ারেরা পরমোৎসাহে মহাদেবের নুতন ধুয়াটা গাইল :

আস্তাকুড়ের এঁটো পাতা—স্বগ্‌গে যাবার আশা-গো।
ফড়াৎ করে উড়ল পাতা—স্বগ্‌গে যাবার আশা-গো।
হায়রে কলি—কিই বা বলি—
গরুড় হবেন মশা গো—স্বগ্‌গে যাবার আশা গো ॥

মহাদেব গাইল :

পায়েতে কামড়ায় মশা—মারিলাম চাপড় !
গোলকেতে বিষ্ণু কাঁদেন—চড়িবেন কার উপর !

দোয়ার দোয়ারকি দিল :

হটাৎ চড়ের সয় না ভর,—স্বগ্‌গে যাবার আশা গো,

এরপর রাত্রি যত গভীর হয়েছে মহাদেবের তাণ্ডব ততই বেড়েছে, শ্লীল—অশ্লীল গালি গালাজে নিতাইকে বিপর্যস্ত করে দিয়েছে। কিন্তু নিতাই সব হাসিমুখে সহ্য করে কেবল ছড়া কেটে উত্তর দিয়েছে :

ওস্তাদ তুমি বাপের সমান তোমাকে করি মান্য
তুমি আমাকে দিচ্ছ গাল, ধন্য হে তুমি ধন্য ॥
তোমার হয়ে ভীমরথী—আমার কিন্তু আছে ভক্তি তোমারচরণে
ডঙ্কা মেরেই জবাব দিব—কোনই ভয় করিনা মনে ॥ [পৃঃ ১৪]

তারাশঙ্করের মানসিকতায় গ্রাম্য কবিগান ও কবিয়ালের কবি যুদ্ধ কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছিলো তার একটি পরিপূর্ণ চিত্র এখানে প্রকাশ পেয়েছে। বাংলার গ্রাম্য জীবনে কবিগান যে একালে অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছিলো এবং তার প্রভাব যে কিরূপ স্পষ্টভাবে তারাশঙ্করকে প্রভাবিত করেছিলো তারও স্পষ্ট পরিচয় আছে কবি উপন্যাসের সর্বত্রই। অসম ছন্দে, গ্রাম্যবাক্য ও শব্দ বিন্যাসে, সহজ ও স্বাভাবিক সুরে তারাশঙ্কর ও কবিগান ঝুমুর গান রচনা করেছেন। লোকসঙ্গীত ও লোকসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর অন্তর একসূত্রে গ্রথিত ছিল তা বেশ বোঝা যায়, তার কারণ বীরভূমের লাল মাটীতেই আছে অজস্র লোকগীতির উৎস।

নিতাই কবিয়াল। কাব্য রচনা তার প্রাত্যহিক কর্ম। বন্ধু রাজার ছেলেকে কেন্দ্র করে সে কবিগান রচনা করে :

রাজার বেটা যোবরাজ তেজার বেটা মহাতেজা
খায় সে খাস্তা খাজা গজা
বিদিত ভো—মণ্ডলে !
রাজার ঘরের ঘরণী যিনি তিনি মহামান্য রানী
তিনি খান বড় বড় ফেণী—
সর্বলোকে বলে ॥ [পৃঃ ২১]

কবিয়াল নিতাই নিজেই দল বাঁধবার স্বপ্ন দেখে আর আপন মনে গান রচনা করে :

ও—আমার মনের মানুষ গো
তোমার লাগি পথের ধারে বাঁধলাম ঘর ;
পথের পারে ঝিকিমিকি তোমার নিশানা চোখে
আমার ভাসে নিরন্তর। [পৃঃ ৫৯]

(২) জলন্ত অনল কভু বসনে কি বাঁধা যায় !
পিরীতি—অনল সখি অন্তর—বসন—
দুঃখ-ধূমে চক্ষু সদা জলেতে ভাসায়।
আমি কি করি উপায়। [পৃঃ ৬৩]

(৩) চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে বলে কে দেখেনা চাঁদ ?
তার চেয়ে চোখ যাওয়াই ভালরে! ঘুচুক আমার দেখার সাধ,

ওগো চাঁদ তোমার লাগি—না হয় আমি হব বৈরাগী,
পথ চলিব রাত্রি জাগি সাধবে না কেউ আরতো বাদ,
চাঁদ তুমি আকাশে থাক—আমি তোমায় দেখব খালি
ছুঁতে তোমায় চাইনাকো হে—সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।

[পৃঃ ৬৫-৬৬]

(৪) বলতে তুমি ব'লো নাকো, আমার মনের কথা থাকুক মনে
দূরে থাক সুখে থাক আমিই পুড়ি মন—আগুনে!
সাক্ষী থাক তরুলতা, শোন আমার মনের কথা,
এ বুকে যে কত বেথা—বোঝ বোঝ অনুমানে।
বিদায় দেমা ফিরে আসি
বলতে কথা বুক ফাটে মা চোখের জলে ভাসি। [পৃঃ ৭০]

তারপর উপন্যাসে এসেছে ঝুমুরের দল এবং সেই সঙ্গে ঝুমুরের কয়েকটি স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্র। ঝুমুর পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গ অর্থাৎ বীরভূম, মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় একধরনের রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক লৌকিক গীতি। বিহারের সিংভুম-মানভুম অঞ্চলে এই ঝুমুর গান প্রচলিত। তারাশঙ্করের ভাষায়, 'ঝুমুর দলের মেয়ে, সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে ইহাদের উদ্ভব, আক্ষরিক কোন শিক্ষাই নাই, কিন্তু সঙ্গীত ব্যবসায়িনী হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি ইহাদের আছে। পালাগানের মধ্য দিয়া ইহারা পুরাণ জানে, পৌরাণিক কাহিনীর উপমা দিয়া ব্যঙ্গ শ্লেষ করিলে বুঝিতে পারে, প্রশংসা সহানুভূতি উপলব্ধি করে।" (পৃঃ ৭৪)

প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের এই অঞ্চলগুলিতে অজস্র ঝুমুর গানের মধ্যে লৌকিক কবি মানসের পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ ইত্যাদিব গান আমাদের বিস্মিত করে, তাই নিতাই ঝুমুরের দলকে চা পরিবেশন করতে যখন কবি গান গায়:

প্রেম ডুরি দিয়ে বাঁধতে নারলেন হায়
চন্দ্রাবলীর সিঁদুর শ্যামের মুখচাঁদে
আর কি উপায় বৃন্দে—এই বার এনে দে এনে দে
বশীকরণ লতা বাঁধব ছাঁদে ছাঁদে পৃঃ ৭৮

কিংবা তার উত্তরে ঝুমুর দলের মেয়ে যখন বলে:

উনোন ঝাড়া কালো কয়লা
আগুন তাতে দিপি দিপি

তখন এর লৌকিক ভাবের সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক অভিজ্ঞানটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তারাশঙ্কর বাল্য থেকেই এসব—ঝুমুর কবিগান শুনেছেন, সুতরাং লোকগীতির এসব রীতিনীতি তার কোনটাই অজানা নয়। পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে লৌকিকভাব, শব্দ ও বাক্য বিন্যাসে কবি উপন্যাসের বহু গান তিনি নিজেই রচনা করেছেন তার মধ্যদিয়েই তারাশঙ্করের ঐতিহ্যধারায় লৌকিক উৎসের একটি যে প্রধানতম স্থান আছে সেটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কবিয়াল নিতাই রচিত কতকগুলি গানের উদ্ধৃতি দিলে সেটি আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

(১) আহা রাঙাবরণ শিমুল ফুলের বাহার সার
ওগো সখি বাহার দেখে যা।
শুধুই রাঙাছটা, মধু নাই এক ফোঁটা, গাছের অঙ্গে কাঁটা খবরদার।
মন ভোমরা যাসনে পাশে তার
ফল ধরে না ধরে তুলো, চালের বদলে চুলে—
ফুলের দরে সেই শিমুল ও বিকালো মালা হল গলার। পৃঃ ৮২

(২) করিল কে ভুল, হায় রে!
মনমাতানো বাসে ভরে দিয়ে বুক
করাত-কাটার ধারে ঘেরা কেয়াফুল। পৃঃ ৮৬

(৩) বঙ্কিম বিহারী বাঁকা তোমার মন।
কুটিল কৌতুকে তুমি হয় কে কর নয়—অঘটন কর সংঘটন,
দ্রোণের চোখের জলে অর্জ্জুণ দেখে ভুজঙ্গ,
রঙ্গ তোমার দেখে ধন্দ লাগে চোখে— পৃঃ ৯০

(৪) চাঁদ তুমি আকাশে থেকো আমি তোমায় দেখব খালি।
ছোঁয়ার সাধে কাজ নাইকো –সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।
না না, তাও করো মাজ্জনা—আজ থেকে আর তাও দেখব না—
জানতাম নাকো এ কু-চোখের দিষ্টিতে বিষ দেয় হে ঢালি।
তাই চলেছি দেশান্তরে আঁধার খুঁজেই-ফিরব ঘুরে
কাকের মুখে বাত্তা দিও—ষোল কলায় বাড়ছ খালি। পৃঃ ১০৫

(৫) গোকুলের কুলে কালো কালিন্দীরই জলে—
হেলে দোলে সোনার কমলা
কালো হাতে ছুঁয়ো নাকো, লাগিবে কালি—
ওহে হে কুটিল কালা। পৃঃ ১০৭

এছাড়াও 'কবি উপন্যাসে আছে অজস্র লোক বিশ্বাসের চিহ্ন। ভূতে কিংবা ডাইনীতে ভর করা বাংলাদেশের একটি প্রচলিত গ্রাম্য বিশ্বাস ও কুসংস্কার। নিতাই কবিয়ালকে ভাল বাসিয়া ঠাকুরঝির ভাবান্তরকে গ্রাম্য ভর হিসাবে গণ্য করেছে তারই পরিচয় উপস্থিত করেছেন তারাশঙ্কর।

"আজ ঠাকুরঝিকে নাকি কালীমায়ের ভরনে দাঁড় করানো হইয়াছিল। সকাল হইতে উপবাসী রাখিয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে তাহাকে একখানা মন্ত্রপূত পিঁড়ির উপর দাঁড় করাইয়া সম্মুখে প্রচুর ধূপধুনা দিয়া কালীমায়ের দেবাংশী একগাছা ঝাঁটা হাতে তাহার সামনে দাড়াইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—কালী, করালী নরমুণ্ডমালী! ভূত, পেরেত, যোগিনী, হাকিনী, শাকিনী, রাক্ষস, পিচাশ যে মন্দ করেছে মা, তাকে তুমি নিয়ে এস ধরে, তার রক্ত তুমি খাও মা।" পৃঃ ১০০

এই ভুত প্রেত তাড়ানোর দৃশ্য তারাশঙ্কর দক্ষভাবেই লৌকিক জীবনধারা থেকে উপন্যাসের মধ্যে তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গতই ব্রতকথা এসেছে কাহিনীতে। ঝুমুর দলের নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকদের মধ্যেও পূজা-পার্বণ-বার-ব্রত আছে। তাদের মধ্যেও ধর্মের প্রগাঢ় প্রভাব। সেটির সন্ধানও তারাশঙ্কর রাখেন। লক্ষ্মীপূজা এই শ্রেণীর স্ত্রী লোকদের একটি প্রধান ধর্মকাজ তারও যে ব্রতকথা প্রচলিত আছে তারাশঙ্কর একটি নিজস্ব বর্ণনা ভঙ্গিতে সেটি উপস্থিত করেছেন: প্রৌঢ়া ব্রতকথা বলিতেছেন—

"পুরাকালে এক বেশ্যা ছিল অতি গরীব তার না ছিল রূপ, না ছিল সুকণ্ঠ। কিন্তু তার ছিল ভক্তি। সেই ভক্তির বশেই সে নিত্য স্নান করিত, লক্ষ্মীর ব্রত করিত। সন্ধ্যায় ঘরে ধুপ দিত, তাহার ঘরের প্রদীপটি নিত্য মার্জনায় ঝক্‌মক্‌ করিত। লক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া সে প্রসাধন করিয়া নাগর আহ্বান করিতে আপনার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইত। নাগর আসিলে তাহাকে সে স্বামীর মত ভক্তি করিত। যত্ন করিত। তাহার মুখের কথায় ঝরিত মধু। ব্যবহারে থাকিত পত্নীর নিষ্ঠা। যাঞায় থাকিত বিনয়, লোকে খুশী হইয়া যাহা দিত তাহাতেই সে তৃপ্ত হইত। প্রভাতে উঠিয়া সে গৃহ মার্জনা করিত, নিত্য বিছানাগুলি পরিস্কার করিত, অতিথি অভ্যাগতকে ভাবিত দেবতা।

আর একজন ছিল সুন্দরী ধনী মাতার কন্যা। রূপের অহঙ্কারে অহঙ্কৃত দর্পিতা। নাগরকে সে বলিত কটুকথা। ব্রত বার উপবাসে ছিল তার বিষম বিরাগ। লক্ষ্মীর চৌকির উপরে রাখিত চুলের দড়ি, তেলের বাটি, মদের বোতল।

তারপর ক্রমে লক্ষ্মীর কৃপায় ওই কালো ভক্তিমতী মেয়েটি একদা রূপ সায়রে

স্নান করিয়া হইল সুন্দরী, কণ্ঠস্বর হইল মধুক্ষরা। সে এক নাগরকে ভজন করিয়া পরিশেষে সাগর-সঙ্গমে তাহাকেই পতি-কামনা করিয়া, করিল দেহত্যাগ। আর দর্পিতা উচ্ছৃঙ্খল রূপবতী মেয়েটা লক্ষ্মীর ছলনায় রূপসায়রে স্নান করিতে গিয়া দেখিল—রূপ অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে লুব্ধা—আরও রূপের প্রত্যাশায় আবার স্নান করিল—ফলে সকল রূপ ঝরিয়া গিয়া সে জরতী বৃদ্ধার মত হইয়া গেল, কাকের মত কর্কশ হইল তার কণ্ঠস্বর। অবশিষ্ট জীবন ভিক্ষায় অতিবাহিত করিতে হইল। কথা শেষ করিয়া হুলুধ্বনি দিয়া প্রণাম করিল।" পৃঃ ১১৭

নিম্নজাতীয় ঝুমুরদলের স্ত্রীলোকদের মধ্যে লৌকিক ব্রত কথার কিরূপ প্রভাব উপরোক্ত ব্রতকথাটির মধ্য দিয়ে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে তারাশঙ্করের 'কবি' উপন্যাসে লৌকিক ঐতিহ্যের ধারাটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

গ্রামীণ বাংলায় তথা শহর শহরতলীতে কবিগান ও ঝুমুর কিভাবে তার নিজস্ব স্বাভাবিক রূপ হারিয়ে ফেলেছিলো এবং ক্রমশঃ খিস্তি ও খেউরে রূপান্তরিত হয়ে গেছলো সেটিও স্পষ্ট করে ধরেছিলেন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্কর। ঝুমুর ও কবিগানে মাধুর্যময় ও অশ্লীল দুই রূপই তারাশঙ্কর নিজের কানেই শুনেছেন ও দেখেছেন। ফলে তার ছবি আঁকতে তারাশঙ্করের অসুবিধা হয়নি। এরকম একটি আসরের ছবি আঁকতে যেয়ে নিজেই মতামত দিয়েছেন: "রাত্রি নয়টার পর দুই দলে পাল্লা দিয়া গান আরম্ভ হইল। আলোকোজ্জল মেলায় নৈশ—আনন্দ—সন্ধানী মানুষের জনতা। বক্ষোভাণ্ডারের মধ্যে প্রবৃত্তির উত্তাপে আনন্দরস গাঁজিয়া যেন মদ্যরসে পরিণত হইয়াছে।" । পৃঃ ১১৯।

প্রথম আসরেই শুরু করেছে বিপক্ষদল। সে দলের কবিয়ালটি রঙ তামাসায় দক্ষ লোক। আসরে নেমেই সে নিজে হল বৃন্দেদুতী—নিতাই করল কৃষ্ণ, পালা ধরল—মানের 'খণ্ডিতা' নায়িকার দূতীরূপে সে গান আরম্ভ করিল—

'কাদা জা-মের বো-দা—কষের রসে মজেছে কালা
আমের গায়ে মিছে—ধরিল রঙ—মিছে সুবাস ঢালা
চন্দ্রাবলী কাদা জাম—
রাধে আমার পাকা আম—"

তারাশঙ্করের বর্ণনায়: "তাহার পরই সে আরম্ভ করিল খেউড়। চন্দ্রাবলীর রূপ-গুণের বিকৃত অশ্লীল ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দিলে। তবে লোকটার ছন্দে দখল আছে, আসরটাকে অশ্লীল রসে মাতাল করিয়া তুলিল।" পৃঃ ১১৯

তারপরেই কবিগানের আসরে দাঁড়িয়েছে নিতাই কবিয়াল। ভাবগম্ভীর গানে সে জমাতে চেয়েছে অশ্লীল আর খিস্তি খেউড়ের আসরটাকে : ,

"মদ সে সহজ বস্তু নয়,
চোখেতে লাগায় ধাঁধা—কালোকে দেখায় সাদা—
রাজা সে খানায় পড়ে রয়।
বৃন্দে তুমি নিন্দে আমার কর অকারণ
নয় অকারণ---কারণ খেয়ে মত্ত তোমার মন।"

তারপর সে শুরু করেছে রাধাতত্ত্ব ও চন্দ্রাবলীর রূপ বর্ণনা। অথচ তারাশঙ্করের মতে খেউড় কবির দলের অপরিহার্য্য অঙ্গ, বিশেষ করে ঝুমুর যুক্ত কবির পক্ষে। পৃঃ ১২২।

তাই নিতাইয়ের তাত্ত্বিক গান সেদিন কবিগানও ঝুমুরের আসরকে নিষ্প্রাণ করে দিয়েছিলো। তাই বিপক্ষদলের কবিয়াল বলে উঠেছে :

হায়—হায়—হায়—হায় কালাচাঁদ বলে গেল কি ?
কালাচাঁদের কালো মুখে আগুন জেলে দেগো—
টিকের আগুন দিয়ে রাধে তামাক খেয়ে লেগো !
ধর ধর কাঁলাচাদে পালায়ে যায় গো।"

আসরে একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল।"

অষ্টাদশ ও উনিশ শতকে যে কবিগান ও ঝুমুরের মাধুর্য পল্লী ও নগর বাংলার ইতর জনকে আনন্দ দান করে একটা সৌন্দর্য সুষমা সৃষ্টি করতো তাই পরবর্তী যুগে এসে কিভাবে শ্রীভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলো ও অশ্লীল খিস্তি খেউড়ে রূপান্তরিত হয়ে গেছলো তারই একটি নিখুঁত ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন তারাশঙ্কর তার 'কবি উপন্যাসে। লৌকিক জীবন ও লোক সংস্কৃতির সঙ্গে গভীর যোগ না থাকলে এ উপলব্ধি সম্ভবপর হোত না।

বাংলাদেশের 'কবিগানের' একটি নিজস্ব ঐতিহ্য আছে। যে ঐতিহ্য সম্পর্কে তারাশঙ্করও সচেতন। তাই কবিয়াল নিতাই এর স্বপ্নে হরুঠাকুর, ভোলাময়রা গোপাল উড়ের কবিগানের আদর্শটি ফুটিয়ে তুলেছেন। উপন্যাসের ভাষায় : 'কোকিল নামটি তাহার চারিদিকে রটিয়া গিয়াছে। ওই নামেই সে এখন চারিদিকে পরিচিত। ইহারই মধ্যে সে অনেক শিখিয়াছে, অনেক সংগ্রহ করিয়াছে। প্রাচীন প্রসিদ্ধ কবিয়ালগণের অনেক প্রসিদ্ধ পালা গানের লাইন তাহার মুখস্ত। হরুঠাকুর, গোপালউড়ে, ফিরিঙ্গী কবিয়াল অ্যান্টনী সাহেব,

কবিয়াল ভোলাময়রা হইতে নিতায়ের মনে মনে করা শুরু কবিয়াল তারণ মণ্ডল পর্য্যন্ত কবিয়ালদের গল্পগান সে সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছে। পৃঃ ১৪৪

সবচেয়ে আশ্চর্য কথা নিতাইকে দি.য় তারাশঙ্কর 'লক্ষ্মীর পাঁচালী' পর্যন্ত লিখিয়েছেন তার কিছু পঙ্‌ক্তি এখানে উপস্থিত করলে পাঁচালী রচনার ক্ষেত্রেও তারাশঙ্করের জীবনে লৌকিক পাঁচালীর প্রভাব কতদূর তা বেশ উপলব্ধি করা যাবে, যথা:

'নমো নমো লক্ষ্মীদেবী—নমো নারায়ণী—
বৈকুণ্ঠের রাণী মাগো—সোনার বরণী।
শতদল পদ্মে বৈস—তেঁই সে কমলা।
সামান্য সহেনা পাপ—তাই তো চঞ্চলা।
অধম নিতাই কবি বসন্তের কোকিল—
লক্ষ্মীর বন্দনা গায় শুনিবে নিখিল।"

ক্রমশঃ নিতাই যত কবিগানে দক্ষ হয়েছে তারাশঙ্করের 'কবিগান' রচনার লেখনীটিও আরও অধিক পরিপক্ক হয়ে উঠেছে কয়েকটি উদাহরণ দিলে তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে। যথা:

১ এ বুড়ো বয়সে বৃন্দে—কুঁচকো মুখে—রসকালি আর কাটিসনে।
রসের ভিয়েন না জানিস যদি—গেঁজলা তাড়ি ঘাটিসনে।
শোনের নুড়ি পাকা চুলে—কাজ নেই আর আলবোট তুলে—
ও তোর ফোকলা দাঁতে পড়ছে লাল—জিভ দিয়ে আর চাটিসনে।
ও—হায়—বুড়ি মরেনা—মরণ নাই—
ও—ভয়ে যম—আসে নাকো—ও—তাই মরণ নাই।
ও—পাছে, পিরীত করিতে চায়—যম ওরে নেয় না তাই—
ও—তোর পায়ে ধরি—ওরে বুড়ি—ফোকলা দাঁতে হাসিসনে॥ পৃঃ ১৪৮

২ তোমায় ভালবাসি বলেই তোমার সইতে নারি অসৈরণ
নইলে তোমায় কটু বলার চেয়ে ভালো আমার মরণ॥
রসের ভাণ্ডারী তুমি—কথা তোমার মিছরী পানা
সেই তুমি আজ হাটে বেচ—সস্তা খেউড় ঘুগনী দানা॥

তুলনীয়:— "ভালবাসিব বলে ভালবাসিনে
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে"।

(৩) তোমার চোখে জল দেখিলে সারা ভোবন আঁধার দেখি
তুমি আমার 'জেবনাধিক' জেনেও তুমি জান নাকি ?
সে আগুণ তোমার গো—কোথা শুধাই তোমারে ?
ও তোমার নয়ন কোণে আগুণ ছিল জ্বলত ধিকি ধিকি হে।
আয়নাতে মুখ দেখতে গিয়ে—দেখোনি কি সাথী হে ?
ও-হায় সে আগুন হল কি ও নয়নে পুড়াইয়ে আ-মারে ?
শুধাই তোমারে। পৃঃ ১৫৩

(৪) এই খেদ আমার মনে মনে।
ভালবেসে মিটল না আশা—কুলাল না এ জীবনে।
হায়, জীবন এত ছোট কেনে ? পৃঃ ১৫৬

পরিসমাপ্তিতে একটি বারমাস্যা গীতের উদাহরণ উপস্থিত করে তারাশঙ্করের বারমাস্যা গীত রচনার দক্ষতা ও লোকসঙ্গীতের প্রভাব তারাশঙ্করের জীবন থেকে উপন্যাসের মধ্যে কিভাবে আবর্তিত হয়েছে তার প্রকৃষ্ট পরিচয় দেওয়া হবে। যথা :

বৈশাখে সূর্যের ছটা—
যত সূর্য-ছটা, কাঠ ফাটা তত ঘটা কালবৈশাখী মেঘে—
লক্ষ্মী মাপেন বীজ-ধান্য চাষ-ক্ষেতের লেগে।
পূণ্য-ধরম মাসে—ধরম আসে—পূর্ণিমাতে (সবে) পূজে ধর্মরাজায়
আমার পরাণ কাঁদে, হায়রে বিধি—কাঠের মতন বক্ষ ফেটে যায়।
তারপর জ্যৈষ্ঠ আসে—
জ্যৈষ্ঠ এলে, বৃক্ষ জলে, মেয়ের দলে অরণ্য ষষ্ঠী পূজে
জামাই আসে, কন্যা হাসে—সাজেন নানা সাজে।
দশহরায় চতুর্ভুজা—
দশহরায় চতুর্ভুজা গঙ্গাপূজা, এবার সোজা ভাসিবে মাঠ বন্যায়
আমার পরাণ কাঁদে হায়রে বিধি চোখের জলে বক্ষ ভেসে যায়॥
বছর শেষে—চৈত্র মাসে—
বছর শেষে চৈত্র মাসে, দিব্য হেসে বসেন এসে অন্নপূর্ণা পূজোর টাটে।
ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, মাঠ শূন্য, তিল পুষ্প ফুটেছে শুধু মাঠে—
তেল নাহি হায় শিবের মাথায়

তেল নাহি হায় শিবের মাথায়, ভয়াল জটায় অঙ্গেতে ছাই গাজনে ভূত নাচায়।
আমার পরাণ কাঁদে—হায়রে বিধি—পক্ষ মেলে উড়ে যেতে চায়।

[পৃঃ ১৯৭]

নাগিণী কন্যার কাহিনী

সর্প-অভিপ্রায় (Snake motif) সমস্ত পৃথিবীর একটি অতি প্রচলিত লৌকিক সংস্কৃতির প্রধানতম বিষয়। পৃথিবীর বহু আদিবাসীর মধ্যেই সর্প-অভিপ্রায় প্রচলিত আছে। পৃথিবীর অনেক আদিম উপজাতির মধ্যে সর্প-সম্পর্কিত উপকথা, ইতিকথা নানারকম ধর্মীয় উপাসনা, আদিম বিশ্বাস সর্প-সম্পর্কিত ঔষধাদি ও সাহিত্য প্রচলিত আছে।

ভারতবর্ষে সর্পপূজার উদ্ভব সম্পর্কে গবেষক মহলের গবেষণার অন্ত নেই। জে. ফার্গুসন তাঁর Tree and serpent worship নামক গ্রন্থে বলেছেন যে সর্পপূজা সর্বপ্রথম ভারতের বাইরে তুরানীয় জাতির মধ্যে প্রবর্তিত হয়, তারপর তুরানীয় জাতি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে এদেশে প্রবেশ করে সর্পপূজা প্রবর্তন করে। সর্পপূজার সঙ্গে আর্যজাতির কোন মৌলিক সম্পর্ক ছিল না, পরবর্তী যুগে আর্যদের মধ্যে এরই প্রভাবে সর্পপূজার প্রচলন হয়। অনেকে মনে করেন ভারতীয় নাগগণ একটি বিশেষ জাতি যারা সর্পকে জাতীয় অভিজ্ঞান (totem) রূপে ব্যবহার করতো। সর্প ও নাগকে একার্থবাচক শব্দ বলেও অনেকে মনে করেন না। তাঁদের মতে নাগ বলতে সম্ভবতঃ গন্ধর্ব, কিন্নর, যক্ষ জাতীয় কোন উপজাতিকে বুঝাতো এবং সর্প বলতে প্রকৃত প্রাণীটিকে বুঝাতো। নিত্য স্নানের তর্পণ মন্ত্রটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য: দেবা যক্ষাস্তথা নাগা গন্ধর্বাপ্সর মোহ সুরাঃ / ক্রুরাঃ সর্পাঃ সুপর্ণাশ্চতরবো জিহ্মগাঃ খগাঃ ।। দেখা যাচ্ছে এখানে নাগকে যক্ষ গন্ধর্ব অপ্সরা ইত্যাদির সঙ্গে উল্লেখ করে সর্পকে 'ক্রুর' বিশেষণ দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মহাভারতের মধ্যে নাগ একটি আর্য বিরোধী জাতি আর্যদের সঙ্গে সর্বদা বিবাদে মত্ত। তখনও আর্য সমাজে সর্প পূজা ছিল না বললেই চলে। এর পরবর্তীকালে আর্যেতর সমাজ থেকে জীবিত সর্প পূজার স্বতন্ত্র ধারাটি খুব সম্ভবত নাগ ও সর্প এই দুইটি শব্দের অর্থ সাদৃশ্যের জন্যে নাগ জাতীর ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিত হয়, সমাজে নাগপূজার প্রবর্তন হয়, মহাভারতোক্ত নাগজাতীর অধিপতি বাসুকি সর্পরাজরূপে পূজা পেতে আরম্ভ করেন এবং নাগরাজ বাসুকির ভগিনী জরৎকারু মুনির পত্নী বাংলাদেশে সর্পদেবী মনসায় রূপান্তরিত

হন। একজন গবেষকের মতে, নাগ বলতে সরীসৃপ ত দূরের কথা, ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের বিশেষতঃ তক্ষশীলা অঞ্চলের এক জাতীয় লোককে বুঝায়। এই সব জাতি সর্পফনাকে জীবক (totem) রূপে ব্যবহার করত বলে এদের নাগ রূপে পরিচয় দেওয়া হত। এ সব কারণেই মনে হয় ভারতীয় সর্পপূজার মূলে কোন বহির্ভারতীয় প্রভাব নাই।

সর্প গ্রীষ্মপ্রধান দেশের জীব, ভারতবর্ষ ও আফ্রিকা দুইই গ্রীষ্মপ্রধান দেশ এবং এদেশে সর্পের আধিক্য চিরকালই মানুষের ভীতি ও পূজার পাত্র রূপে ব্যবহৃত, জীবিত সর্পের পূজা দিয়েই এদেশে সর্পপূজার সূত্রপাত হয়।

আর্যদের সমাজে স্ত্রী দেবতার বিশেষ স্থান নাই ভারতীয় প্রাগ্-অর্য্য সভ্যতা থেকে মাতৃকাপূজার কাল এবং বাংলার আর্যেতর ধর্মোদ্ভূত মাতৃপূজারই অন্যতম বিকাশ লক্ষ্য করা যায় মনসাদেবীর কল্পনায়। পূর্বভারতে বিশেষ করে বাঙলা দেশে এবং দক্ষিণ ভারতের বহু জায়গায় আর্য সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষ কার্যকর নয়। তাই বাঙলাদেশে ও দক্ষিণ ভারতে মাতৃকা পূজার ব্যাপক প্রচলন। আর্য প্রভাবিত উত্তর ভারতের সর্বত্র সর্পকে পুরুষদেবতা নাগরাজ, বাসুকি রূপে পূজা করলেও বাঙলাদেশ ও দক্ষিণাত্যে স্ত্রী সর্প দেবতা রূপেই পূজিত। আর জীবিত সর্পের পূজার পরবর্তী অবস্থায় বিশেষ কোনো বৃক্ষকে সর্প বেষ্টিত বিবেচনা করে সেই বৃক্ষের পূজা। বৃক্ষের সঙ্গে সর্পের সম্পর্ক অত্যন্ত প্রাচীন ও ব্যাপক, কারণ উভয়েই উর্বরতা শক্তির প্রতীক। দক্ষিণ্যাত্যে অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে মৃৎ অথবা প্রস্তর নির্মিত নাগমূর্তি স্থাপন করে অপুত্রক নারীরা ১০৮ বার প্রদক্ষিণ করে। এতে বৃক্ষের ও সর্পের সঙ্গে উর্বরতাবাদ বা Fertility cult এর সম্পর্কটি স্পষ্ট হয়। বাঙলা দেশে মনসাবৃক্ষের মাধ্যমে মনসাপূজার প্রথা বৃক্ষোপাসনারই পরিচয় উপস্থিত করে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার সুত্রগ্রন্থ 'সাধন মালা'তে জাঙ্গুলী দেবীর পূজার উপকরণ ও তার মন্ত্রগুলি বিচার করে পণ্ডিতগণ অনুমান করেছে যে দেবী জাঙ্গুলীর সঙ্গে বাঙলার সর্পদেবী মনসা বা বিষহরির সাদৃশ্য আছে। বাঙলার আর্য-পূর্ব সভ্যতার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় সভ্যতার নিবিড় ঐক্য ছিল বলেই মনে হয়। সেজন্য বাংলার সর্পদেবী জাঙ্গুলীর মত দাক্ষিণ্যাত্যেও বিভিন্ন নামীয় সর্পদেবীর অস্তিত্ব ছিল এবং এখনও আছে। জাঙ্গুলী শব্দটি যেমন সম্ভবত আর্যেতর শব্দ 'জঙ্গল বাবন থেকে উদ্ভুত, এ সমস্ত সর্পদেবীর নামও আর্যেতর ভাষা উদ্ভুত।

বাংলাদেশে সর্প অভিপ্রায় আদিম বিশ্বাস জাত। সর্পদেবী মনসা বাংলা দেশে

অত্যন্ত ব্যাপকভাবে পূজিত লৌকিক দেবী। সর্প সম্পর্কিত বহু লৌকিক বিশ্বাস ব্রতকথা, উপকথা ইতিকথা বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। তারাশঙ্করের নাগিণী কন্যার কাহিনীর সর্বত্র এই সর্প সম্পর্কিত কাহিনী, উপকাহিনী, বিশ্বাস, সংস্কার, লৌকক ও অতি লৌকিক কথা পরিব্যাপ্ত। তারাশঙ্কর কল্লোল যুগের লেখক এ যুগের লেখকদের প্রধান অভিপ্রায় ছিল একেবারে সমাজের নীচু স্তরে যে অসংখ্য মানুষের জীবন প্রবহমান, যে সংস্কার কুসংস্কার, যে আদিম বিশ্বাসের মধ্যে তারা জীবন অতিবাহিত করে তার সবটুকু তুলে ধরতে হবে সাহিত্যের মধ্যে।

তারাশঙ্কর এই জীবন ও মানুষকে দেখেছেন অত্যন্ত স্পষ্ট ভাবে, ঘনিষ্ট ভাবে। ফলে তাদের জীবনকে তুলে ধরেছেন গণদেবতায়, কবিতে, হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়, নাগিনী কন্যার কাহিনীতে।

হিজল বিলে মা-মনসার আটন। পদ্মাবতী হিজল বনের পদ্ম-শালুকের বনে বাসা বেঁধে আছেন। চাঁদো বেনের সাতডিঙা মধুকর সমুদ্রের বুকে ঝড়ে ডুবিয়ে এখানে এনে লুকিয়ে রেখেছিলেন। কালীদহের কালীনাগ কালো ঠাকুরের দণ্ড মাথায় করে কালীদহ ছেড়ে এসে এখানেই বেঁধেছে বাসা।

এরই তীরে বাস করে বেদের দল, কিন্তু সাধারণ মাল বা মাঝি বেদে নয়। সাঁতালীর বিষ বেদে। ওই হিজল বিলের ধারে ভগীরথীর চরভূমির ঘাস বন ঝাউবন দেবদারু গাছের সারির আড়ালে ওই হাউর মুখী নালার ঘাট থেকে চলে গেছে এক ফালি সরু পথ, দুদিকে ঘাসবন, মাঝখানে পায়ে পায়ে রচা পথ একে বেঁকে চলে গেছে ওই বিষ বেদেদের সাঁতালী গ্রামের মাঝখানে বিষহরী মায়ের 'থান' অর্থাৎ স্থান পর্যন্ত। এই সাঁতালী গ্রামের বিষ-বেদেদের লৌকিক জীবনের নানা কথা উপকথা, ইতিকথা, বিশ্বাস সংস্কার কুসংস্কারের কাহিনী রচনা করেছেন তারাশঙ্কর এই উপাখ্যানে।

উপন্যাসটির শুরু হয়েছে চাঁদ বেনে ও সাঁওতালী পাহাড়ের ধন্বন্তরির বন্ধুত্ব ও মন্ত্রশক্তির কাহিনী দিয়ে। তারাশঙ্কর মন্ত্রশক্তি (Magic power)-কে এবং অপূর্ব ছন্দে গেঁথে উপস্থিত করেছেন: জয় বিষহরী গ! জয় বিষহরী। চাঁদো বেনে দণ্ড দিল। তোমার কৃপায় তরি গ! চম্পাই নগরের ধারে। সাঁতালী পাহাড় গ! ধন্বন্তরির মন্ত্রে বাঁধা সীমেনা তাহার গ! বিরিখো ময়ূর বৈসে / গর্তে গর্তে নেউল গ! বিষ-বৈদ্য বৈসে হেথায় বাতুলা বাউল গ!' ধন্বন্তরী সাঁতালী পাহাড়ের সীমানায় সীমানায় গণ্ডী কেটে দিয়ে ছিলেন। ভূত পেরেত পিশাচ রাক্ষস ডাইন ডাকিনী বিষধর সেখানে ঢুকতে পারত না। বিশেষ করে বিষধর,

নাগ-নাগিনী, বিচ্ছু-বিছা, পোকা মাকড়, ভীমরুল, বোলতা, এরা ঢুকলে কি সীমানার মধ্যে পা দিলে, নিশ্চিন্ত মরণ ছিল—ময়ূরে নেউলে টুকরা টুকরা করে কেটে ফেলত। ধন্বন্তরী পৃথিবীর গাছপালা লতাপাতা ফলমূল খুঁজে সাত সমুদ্দুর তলা থেকে, স্বর্গলোকের ধন্বন্তরির বাগান থেকে পেয়েছিলেন যত বিষঘনী অর্থাৎ বিষঘ্ন গাছ-গাছড়া··· [দ্রঃ নাঃ কঃ কাঃ ২য় সং পৃঃ ১৯]

মনসা-চাঁদ-সদাগরের প্রচলিত সাহিত্যিক কাহিনীটি যা মঙ্গল কাব্যের মধ্যে বিশেষ সুসংস্কৃত ভাবে প্রকাশিত তারই একটি লৌকিক ইতিকথা (legend) এখানে তারাশঙ্কর সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন হিজলের তীরে বসবাসকারী বিষ-বেদেদের কাহিনীতে।

সর্প সম্পর্কিত নানা মন্ত্র মূলক ছড়া ও গান আছে এই উপাখ্যানে। যেমন : (১) এবার নাগিনী গান ধরলে গুণগুণিয়ে—ঘুম পাড়ানী গানের মত বিষছড়ানী গান—বাসুকী দোলায় মাথা দোলে চরাচররে—/ তুই ঢল ঢল পড়রে! অনন্ত উগারেন সুধা তাই হলাহল রে—/ ও তুই ঢল ঢলে পড়রে। / সে সুধা ধরে কণ্ঠে ভোলা মহেশ্বররে—তুই ঢল ঢলে পড়রে / ভোলার চক্ষু ঢুলু ঢুলু অঙ্গ টল মলরে—/ তুই ঢল ঢলে পড়রে। / অনন্ত শয্যায় শুয়ে ঘুমান ঈশ্বররে—তুই ঢল ঢলে পড়রে! (পৃঃ ৩০]

(২) ভাদ্রের শেষে নাগপঞ্চমী, বিষবেদেরা মা মনসার গান গায় আর অতীত দিনের পুরাকথাকে (Myth) স্মরণ করে। তুমড়ি বাঁশির একঘেয়ে শব্দের সঙ্গে বিষম ঢাকি বাজে, তার সঙ্গে ওঠে ঝনাৎ ঝনাৎ এক বিচিত্র ধাতব ঝঙ্কার :

লাচো লাচো কাল নাগিনী কন্যে গ ! অ-গ
তুস্থু আমার সোনা হইল তু মাণিকের জন্যে গ ! অ-গ
কদমতলায় বাজে বাঁশি রাধার মন উদাসী গ ! অ-গ
কালীদহে কালনাগিনী উঠল জলে ভাসে গ ! অ-গ
মোহন বংশী ধারীর আমার লয়ন মন ভোলে গ !
ঝাঁপ দিল কালো কানাই রাধা-রাধা বলে গ ! অ-গ
কালোবরণ কালনাগিনী কালো চাঁদের পাশে গ ! অ-গ
কালীদহের জলে যুগল নীল কমল ভাসে গ ! অ-গ

(পৃঃ ৩৯)

(৩) সাঁতালীর বিষ-বেদেদের মধ্যে প্রচলিত লোক বিশ্বাস : কালনাগিনী শির বেদেকে কথা দিয়েছিল যে সে কন্যা হয়ে তাদের ঘরে জন্মাবে। আজও সে বাক্যের

অন্যথা হয়নি। পাঁচ বৎসর বয়েসের আগে সর্পাঘাতে বিধবা হয় যে কন্যা তার দিকে সকল বেদের চোখ গিয়ে পড়ে। তারপর থেকে তার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। ষোল বছরের মধ্যে কিছু লক্ষণ না ফুটলে তার বিয়ে হয়। আর ফুটলে পুরানো নাগিনী কন্যেকে সরতে হয় আর নতুন নাগিনী কন্যা তার স্থান নেয়। একজন শির-বেদের আমলে দু তিন জন নাগিনী কন্যার আমল পার হয়ে যায়। বিষহরির পুজোয় এই পুরানো স্মৃতি গীত রূপে উপস্থিত হয়:

ও আমার সাত জন্মের বাপ গ-তোরে দিছি বাক্ গ!
তোরে ছেড়্যা যাইলে আমার মুণ্ডে পড়বে বাজ-গ! অ-গ!
এ ঘোর সঙ্কটে তুমি রাখলে আমার মানো গ! অ-গ!
জন্ম জন্ম তোমার ঘরে হইব আমি কন্যে-গ!
তোমার বাঁশির তালে তালে নাচব হেল্যা-দুল্যা গ! অ-গ!
আমার গরল হইবে সুধা তুমি বাবা ছুল্যে গ! অ-গ!
তোমার বংশ তোমার ঝাঁপি হইল আমার ঘর গ! অ-গ!
তুমি না করিলে পর হইব না মুই পর গ!

(পৃঃ ৪০)

(৪) লৌকিক সংস্কার: বিষ-বেদেদের সংস্কার 'শিয়াল ডাকবার আগে মেয়েরা ঘরকে যেতে না পারলি ঘরে লিবে না, জাতে ঠেলবে।' এ সম্পর্কে প্রচলিত ছড়া:

শিয়াল ডাকিলি পরে বেদেরা না লিবে ঘরে
অভাগিনীর যাবে জাতিকুল (পৃঃ ৬৩)

(৫) 'নরে নাগে বাস হয় না' এই প্রবাদ সম্পর্কিত উপকথাটি উপন্যাসে তারাশঙ্কর সুন্দরভাবে উপস্থিত করেছেন: 'মন্তে থাকে বণিক বুড়ো, যত ধনী তত কৃপণ, বাড়িতে আছে গিন্নী, বেটা আর বেটার বউ। আর আছে সিন্দুকে ধন, খামারে ধান, ক্ষেতে ফসল, পুকুরে মাছ, গোয়ালে গাই। শ্যামলী ধবলী বুধি মঙ্গলার পাল। সেই পাল চরায় পাড়ার বাউরী ছেলে, বণিক বুড়োর রাখাল ছোঁড়া। কৃপণ বণিক বুড়োর ঘরে রাঁধুনী নাই, বেটার বউকে ভাত রান্না করতে হয়। বউটি যেমন সুন্দরী তেমনি লক্ষ্মী, কিন্তু শিশুকালে মা-বাপ হারিয়েছে, সাতকুলে কেউ নাই। নাই বলেই বণিক বুড়োর চাপ বউয়ের উপর বেশী। তাকে দিয়েই করায় রাঁধুনীর কাজ, ঝিয়ের কাজ। বউ রাঁধে শ্বশুরকে স্বামীকে খাওয়ায়, নিজে খায়, রাখাল ছোঁড়ার ভাত নিয়ে বসে থাকে।

রাখাল ছোঁড়া গরুর পাল নিয়ে যায় মাঠে, গরুগুলি চরে বেড়ায়, সে কখনও

গাছতলায় বসে বাঁশি বাজায়, কখনও বা গাছের ডালে দোল খায়, কখনও ঘুমায় আর কখনোও আম, জাম, কুল পেড়ে কোঁচড় ভর্তি করে নিয়ে আসে। একদিন গাছের তলায় দেখে দুটি ডিম। ভারি সুন্দর ডিম। রাখালের বড় সাধ হল ডিম দুটি পুড়িয়ে খাবে, ডিম খুঁটে বেঁধে নিয়ে এল, বণিক বউকে দিল—বউ গ, বউ ঠাকুরুণ, ডিম দুটি আমাকে পুড়িয়ে দিয়ো।

বউ ঠাকুরুণ ডিম দুটি হাতে নিয়ে পোড়াতে গিয়েও পোড়াতে পারলেনা। ভারি ভালো লাগলো, আহা কোন জীবের ডিম, এর মধ্যে আছে তাদের সন্তান, আহা! ডিম দুটি সে এক কোণে একটি টুকুই ঢাকা দিয়ে রেখে দিলে। তার বদলে দুটি কাঁঠাল বিচি পুড়িয়ে রাখালকে দিলে, নে, খা।'

তারপর সে ডিম দুটি থেকে কি ভাবে দুটি নাগশিশু বেরিয়ে এল, কি ভাবে বউটির কৃপায় ও স্নেহে বড় হয়ে উঠলো, ভাই বোনের সম্পর্ক পাতালো, পাতালপুরে ফিরে গেলো এবং পরে দিদিকে পাতালপুরীতে নিয়ে গেল, এবং সবশেষে প্রমাণ হলো কিভাবে নরে নাগে বসবাস হয় না, তার একটি বিচিত্র উপকথা তারাশঙ্কর রচনা করেছেন। এই উপকথাটিতে সে সব অভিপ্রায় (Motif) লক্ষ করা গেছে তার মধ্যে সর্প অভিপ্রায় ও নিষেধ অভিপ্রায়টিই বিশেষ ভাবে প্রধান হয়ে উঠেছে। মা বিষহরি বলেছিলেন—'মা, নাগ লোকে এলে থাক, দুধ নাড় দুধ চাড়, সহস্র নাগের সেবা কর, সব দিক পানে চেয়ো, শুধু দক্ষিণ পানে চেয়োনা।" (পৃঃ ৯৯)

বাংলা দেশের রূপকথার এই নিষেধ অভিপ্রায়টি সর্বত্র স্পষ্ট হয়েছে সর্প মূলক ব্রতকথাটির মধ্যে।

জুড়ি-বুটির উপর বিষবেদের অসম্ভব বিশ্বাস। এই জুড়ি বুটির মধ্যে যে দ্রব্য গুণ আছে তাদ্বারা সে বিষধর ভয়ঙ্কর সর্পকেও বশীভূত করে। সর্পাঘাতে মৃত জীবকে সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে আনে। জড়ি-বুটি সম্পর্কিত লৌকিক বিশ্বাসগুলি এই উপন্যাসে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নাগিনীকন্যা শবলা যখন একটা শেকড়ের টুকরো কৃতজ্ঞতা বশতঃ শিবনাথ-এর হাতে দিয়েছিল তখন শিবনাথ জিজ্ঞেস করেছিল যে সেটি কিসের মূল? তখন বেদের মেয়ে শবলা এই শিকড়ের দ্রব্য গুণ সম্পর্কিত যে অলৌকিক বিশ্বাসের উপকথাটি শুনিয়েছিল সেটি হচ্ছে এই : বেদেকুলের গুপ্তবিদ্যা এতো পেকাশ করতে নিষেধ আছে। মেয়েটা একটু চুপ করে থেকে বললে-যদি বিশ্বাস কর ধরম ভাই, তবে বুলি শোন এ যে কি গাছ তার নাম আমরাও জানি না। বেদেরা বলে সেই যখন সাঁতালী

পাহাড় থেকে বেদেরা ভাসল নৌকাতে, তকুন ও কালনাগিনী কন্থে সে আভরণ অঙ্গে পর‍্যা নেচেছিল, তাতেই একটুকরো মূল ছিল লেগে। সাঁতালী ছাড়ল বেদেরা, সঙ্গে সঙ্গে ধন্বন্তরির বিদ্যা চাঁদা বেনের অভিশাপে হলো বিস্মরণ। নতুন বিদ্যা দিলেন মা বিষহরি। এখুন ধন্বন্তরির বিদ্যার ওই মূলটুকুই কন্যার আভরণে লেগে সঙ্গে এল, তাই পুতলে শির বেদে নতুন সাঁতালী গাঁয়ে হিজল বিলের কুলে। গাছ আছে, শিকড় নিয়া ওষধ করি, কিন্তু নাম তো জানিনা ধরম ভাই। আর ই গাছ সাঁতালী ছাড়া তো আর কুথাও নাই পিথিবীতে। তাহলে তুমাকে নাম বলব, কি গাছ চিনায়ে দিব কি কর‍্যা কও? এইটি তুমি রাখ, নাগ যদি ডংশন করে আর সি ডংশনের পিছাতে যদি দেব রোষ কি ব্রহ্ম রোষ না থাকে তবে ইয়ার এক রতি জলে বেঁট্যা গোল মরিচের সাথে খাওয়াইয়া দিবা, পরাণডা যদি তিল পরিমাণ থাকে তবে সে পরাণকে ফিরতে হবে, হাসতে হবে, এক পহরের মধ্যে মরার মত মনিষি চোখ মেলে চাইবে।' (পৃঃ ১০১-১০২)

এছাড়াও আছে নাগিনীকন্যা, সম্পর্কিত নানা উপকাহিনী, উপকথা নানা লৌকিক বিশ্বাস। মধ্যরাত্রে যখন শেয়াল ডাকে, কালো বাদুড় উড়ে যায়, পেঁচা ডানা ঝাপটায়—এই ক্ষণটিতে নাগিনী কন্যার অন্তরের মধ্যে কালনাগিনী স্বরূপ নিয়ে জেগে ওঠে, নিত্যই ওঠে। কিন্তু বিছানার খুঁট ধরে দাঁতে দাঁত টিপে নিশ্বাস বন্ধ করে পড়ে থাকতে হয় নাগিনীকন্যাকে। এই নিয়ম।' (পৃঃ ১১৯)

তারপর যখন হাপরের মত হাঁপায় বুকের ভিতরটা তখন উঠে বসতে হয়। চুল এলিয়ে থাকলে চুল বেঁধে নিতে হয়, এঁটে সেঁটে নতুন করে কষে কাপড় পরতে হয়। বিষহরির নাম জপ করতে হয়। তারপর আবার শোয়। নাগিনী কন্যের অন্তরের নাগিনী তখন চোয়াল টিপে ধরা নাগিনীর মত হার মানে, তখন সে খোঁজে ঝাঁপি, অন্তরের ঢুকে নিস্তেজ হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে থাকে। তা না করে যদি নাগিনী কন্যে বিছানা ছেড়ে ওঠে, বাইরে বেরিয়ে আসে—তবে তার সর্বনাশ হয়।...জন দুই তিন পাগল হয়ে গিয়েছিল, জন চারেকের হয়েছে চরম সর্বনাশ। সর্বনাশীরা ফিরলো ধর্ম বিসর্জন দিয়ে।" কিংবা (পৃঃ ১১৯-১২১)

"নাগিনী কন্যাদের প্রবৃত্তি যখন উগ্র হয়ে উঠে, তখন তারা উন্মাদিনীর মত নিশীথ রাত্রে ঘুরে বেড়ায় হিজলে ঘাসবনে। কখনও বাঘের হাতে জীবন যায়, কখনও হাঙর মুখীর খালে শিকার—প্রতীক্ষ্যমান কুমীর অতর্কিতে পায়ে ধরে টেনে নেয়, নিশীথ রাতে হিজলের কুলে শুধু একটা আর্তচিৎকার জেগে ওঠে।

আবার কোনো নাগিনী কন্যা শোনে বাশির সুর। দুরে হিজলের মাঠে চাষীরা কুঁড়ে বেঁধে থাকে। মহিষ গরুর বাথান দিয়ে থাকে সেখের ঘোষেরা, তারাই বাঁশী বাজায়। সে বাঁশী শুনে নাগিনী কন্যা এগিয়ে যায়, সুরের পথ ধরে। শবলা বলেছিলো তার থেক্যা বড় সর্বনাশ আর হয় না, ধরম ভাই। সেই হইল মাবিষহরির অভিশাপ। তাতে হয় পরাণটা যায় না হয় ধরম যায়, জাতি যায় কুল যায়। (পৃঃ ২২৮)

নাগিনী কন্যাদের দেহের ভেতর থেকে চাঁপা ফুলের বাস বেরোয় এবং তার সঙ্গে সর্প মিলনের চাঁপা ফুলের বাস ওঠে। 'ঘরটা যেন ভর‍্যা যায় ভাই। মুই থর থর কর‍্যা কাঁপতে থাকি। প্রেথম যেদিন বাসটা নাকে ঢুকল ভাই। সেদিন মুই যেন পাগল হয়্যা গেছিলাম। ঠিক তখুন রাত দুপুর।......'

ঠিক সেই মধ্য রাত্রির লগ্নটিতে নাগিনীকন্যা যদি জেগে থাকে, তবে তাকে উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে মনে মনে বিষহরিকে ডাকতে হয়। ওই লগ্ন নাগিনী কন্যার বুকে নিশির নেশা জাগিয়ে তোলে। কুহক মায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে সে—এই বেদেদের বিশ্বাস। [দ্রঃ পৃঃ ২২৮]

তারপরই শুরু হয়েছে চাপাঁফুল সম্পর্কিত রূপকথারকাহিনীটি। কাহিনীতে আছে নদীর জলে ভেসে যায় সোনার চাঁপাফুল। রাজা পণ করেছেন, ওই চাঁপার গাছ তাকে যে এনে দেবে তাকেই দেবেন তার নন্দিনীকে। রাজনন্দিনী রয়েছেন সাত মহলার শেষ মহলায়, মহলায় মহলায় পাহারা দেয় হাজার প্রহরী। রাজপুত্র আসে তারা কন্যাকে দেখে, তারপর চলে যায় তারা নদীর কুলে কুলে, কোথায় কোন কুলে আছে সোনার চাঁপাগাছ। চলে চলে তারপর তারা হারিয়ে যায়, পিছনের পথ মুছে যায়। সোনার চাঁপার গাছ যে পাবে খুঁজে সেই পাবে ফিরবার পথ।' (পৃঃ ২৩০) ঔপন্যাসিক এখানে রূপকথার অভিপ্রায়ে লৌকিক জীবনকে পর্যবেক্ষণ করেছেন।

নাগিনী কন্যা সম্পর্কিত আর একটি লৌকিক বিশ্বাস : নাগিনী কন্যা যদি ভ্রষ্ট হয়ে পালিয়ে গিয়ে বাঁচে, সে যদি ঘর সংসার বাঁধে, সে যদি তার জাতি ধর্ম সব ত্যাগ করে, তবে মা বিষহরীর অভিশাপ গিয়ে পড়ে তার মাতৃত্বের উপর। সন্তান কোলে এলেই তার নাগিনী স্বভাব জেগে ওঠে। নাগিনী যেমন নিজের সন্তান ভক্ষণ করে, নাগিনী কন্যা তেমনই সন্তান হত্যা করে। দ্রঃ পৃঃ ২৫০)

নাগিনী কন্যা সম্পর্কিত এই বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের কাহিনী কি ভাবে তাদের জীবন ধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে তার জীবন্ত পরিচয় আছে সবলা ও পিঙ্গলার

মর্মান্তিক জীবনের দুঃখময় পরিসমাপ্তিতে। এই ধরনের নানা সংস্কার তাদের জীবনকে কি ভাবে বেঁধে রেখেছে তার পরিচয় আছে এই উপন্যাসের প্রতিটি ছত্রে। বাংলাদেশের ভ্রাম্যমান বেদে সম্প্রদায়ের একটি বিশেষ শাখা সাপুড়ে সম্প্রদায়ের আচার আচরণ, সংস্কার বিশ্বাস, জীবন সংগ্রাম, আশা আকাঙ্ক্ষা, কি করে এত জীবন্ত করে তুলেছেন, ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। সবচেয়ে বড় কথা তারাশঙ্করের আগে লৌকিক সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে জীবন সংগ্রামের চিত্র বাংলা উপন্যাসে খুব বেশী ফুটে ওঠে নি। মোটামুটি ভাবে বাংলা উপন্যাসের কালান্তরটিকে যদি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় যে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বাংলাদেশের জমিদার তন্ত্র ও অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবন চিত্র প্রতি ফলিত, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে উনিশ শতকের ব্রাহ্ম-সমাজ কেন্দ্রিক বুদ্ধি জীবি, উচ্চ মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি ফুটে উঠেছে, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে মূলতঃ নিম্ন মধ্যবিত্ত ও কিছু অবস্থাপন্ন কৃষক—পরিবারের সুখ দুঃখ বিরহ মিলন মান অভিমানের কাহিনী প্রতিফলিত হয়েছে, তবে তারাশঙ্করে এসেই দেখা যাবে ·বাংলাদেশের প্রকৃত সংখ্যা গরিষ্ঠ অবহেলিত নিষ্পেষিত গ্রামীন মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। যে মানুষ একান্তভাবে আঞ্চলিক, যুগ-যুগান্তের অশিক্ষা কুসংস্কারের অন্ধকারে সম্পূর্ণ আদিম অনাবৃত চরমতম দারিদ্রের মাঝখানে বাঁচবার চেষ্টা করেছে, তারাশঙ্কর সেই সব লোকজীবনের কিছু কিছু জীবন সংগ্রামের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কয়েকটি উপন্যাসে। 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' এই ধরণেরই একটি সার্থক উপন্যাস যার মধ্যে আছে এমন একটি সম্প্রদায়ের কাহিনী যেখানে হিজলের বনে মা মনসার আটন, মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুক, জড়ি বুটি নাগকন্যার নানা অলৌকিক বিশ্বাসের অন্ধকারে বিচিত্র কামনা-বাসনার আনাগোনা আর এসব নিয়েই পিঙ্গলা শালার মত অসংখ্য মানুষের জীবন সংগ্রামের চিত্র।

হাসুলী বাঁকের উপকথা

প্রত্যেক জাতির বা সমাজের একটা জীবনীশক্তি থাকে যার মধ্য দিয়ে সে প্রাণরস আহরণ করে থাকে এবং যুগযুগান্তর ধরে টিকে থাকবার চেষ্টা করে। নানা ঝড় ঝঞ্ঝা প্রাকৃতিক নানা দুর্বিপাক অভাব অনটন মহামারী দুর্ভিক্ষকে অগ্রাহ্য করে তারা বেঁচে থাকবার চেষ্টা করেছে। হাঁসুলী বাঁকের কাহার জাতের জীবনীশক্তি হচ্ছে তাদের লৌকিক বিশ্বাসগুলি যা তাদের বাঁচিয়ে রেখেছে টিকিয়ে রেখেছে যুগান্তর ধরে নানা বিপত্তির মধ্যদিয়ে। তাদের জীবনের

উত্থান-পতন, আশা-আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ-দারিদ্র সবকিছুকে নিয়ন্ত্রিত করে এই লৌকিক বিশ্বাস-অবিশ্বাস সংস্কার-কুসংস্কার।

কোপাই নদীর প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় সে বিখ্যাত বাঁকটার নাম হাঁসুলী বাঁক—বর্ষাকালে সবুজ মাটিকে বেড় দিয়ে পাহাড়িয়া কোপাইয়ের গিরিমাটি গোলা জলভরা নদীর বাঁকটিকে দেখে মনে হয় শ্যামলামায়ের গলার হাঁসুলী, নদীর বেড়ের মধ্যে হাঁসুলী বাঁকে ঘন বাঁশবনে ঘেরা মোটমাট আড়াইশো বিঘা জমি নিয়ে মৌজা বাঁশবাঁদি, লাট জঙ্গলের অন্তর্গত। সেই জঙ্গলের মধ্যে কে শিষ দিচ্ছে রাত্রে। দেবতা কি যক্ষ, কি রক্ষ বোঝা যাচ্ছে না। সকলে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে বিশেষ করে কাহারেরা। মোটকথা এদেশে—এই হাঁসুলী বাঁকের মানুষের কাছে এই শিষ দেওয়া ব্যাপার আশ্চর্য বলে মনে হচ্ছে। এখন তাদের ধারনা ব্রহ্মদৈত্যতলার কর্তা কোন কারণে এবার রুষ্ট হয়েছেন। হয়তো ওই কেশবন ও শ্যাওড়া জঙ্গল থেকে বিদায় নিয়ে নদীর ধারে ধারে চলে যাচ্ছেন—এই শিষ দিয়ে সেকথা জানিয়ে দিযে চলেছেন অধিবাসীদের। এ নিয়ে তাদের জল্পনা কল্পনা চলছিল। ঘরে ঘরে কুলুঙ্গীতে সিঁদুর মাখিয়ে পয়সাও তুলেছে তারা। "লুতুন" পূজো দেবে।

হাঁসুলী বাঁকের মানুষ এসব কুসংস্কারে আর লৌকিক বিশ্বাসের মধ্যেই আবর্তিত হয়েছে এবং তাদের জীবনীশক্তিও তৈরী হয়েছে। তাই তারা মজলিসে বসে কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জেনেছে পানুর খুঁতো পাঁঠাটি চৌধুরী এবার বেহ্মদত্যি তলার কত্তার পূজোয় উচ্ছুগো করেছে। শুনে সুচাঁদ বুড়ী হাঁসুলী বাঁকে কত্তা বাবার পুরাকথা (myth) শুরু করেছে। সে অনেকদিন আগে, তখন আমরা হই নাই, বাবার কাছে গল্প শুনেছি। দুপুরবেলায় ভাসতে লাগলো কোপাই। রাত একপ্রহর হতে হতে তু-ফা-ন। তারপর সেই ঘুরঘুট্টির এধ্যে কি করে নৌকা এসে লাগলো। বাবার থান থেকে কিভাবে কর্তাবাবা বেরিয়ে এলো এই ন্যাড়ামাথা, ধবধব করছে রঙ, গলায় রুদ্রাক্ষি, এই পৈতে, পরনে লাল কাপড, পায়ে খড়ম। তারপরে কিভাবে সাহেব মেম ঘুরণ চাকিতে ভেসে গেল, এবং চৌধুরী মশাই বেঁচে গেল। তারপর থেকেই হাঁসুলী বাঁকের এইখানেই কত্তাবাবার অধিষ্ঠান।

এদের জীবনে এইসব বিশ্বাসের প্রতি আকর্ষণ কিরূপে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে সুচাঁদের পুরাকথার আসরের বর্ণনায়:

"প্যাঁচাগুলো কর্কশ চেরা গলায় চীৎকার করে উড়ে যাচ্ছে। বাদুড় উড়ছে—

পথঘাটের শব্দে মাথার উপরের বাতাস চমকে চমকে উঠছে।...এরই মধ্যে সুচাঁদের এই গল্পে সেই বেলবন ও খ্যাওড়াবনের কর্তার মাহাত্ম্য, তার সেই গেরুয়াপরা ন্যাড়ামাথা রুদ্রাক্ষ ও ধবধবে পৈতেধারী চেহারার বর্ণনা শুনে এবং সেই কর্তার কাছে কুকুরে ধরা পাঁঠা দেওয়ার অপরাধের কথা মিলিয়ে সকলে একেবারে নিদারুণ ভয়ে আড়ষ্ট পঙ্গু হয়ে গেল।

হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনে ঘেরা আলো আঁধারের মধ্যে বাঁশবেঁদে গ্রাম। সেই গ্রামের সুচাঁদ বুড়ী। এ বুড়ী গ্রামের সমস্ত ব্যাপারের একটা মাথা। তার প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে একটা ব্রতকথা লেখক উপস্থিত করেছেন: গাঁয়ে ছিল এক নিঃসন্তান বুড়ী, ব্রত করত, ধর্মকর্ম করত, গাঁয়ের লোকের দুঃখে দুঃখ করেই তার ছিল সুখ। কারও দুঃখে কাঁদতে না পেলে বুড়ী পশুপক্ষীর দুঃখ খুঁজে বেড়াত। এমন দিনের সকালে বসে ভাবতে ভাবতে আপন মনেই বলত—"কাঁদি কাঁদি মন করছে, কেঁদে না আত্মি মিটছে, মহাবনে হাড়ী মরেছে, তার গলা ধরে কেঁদে আসি।" এই সুচাঁদ বুড়ীই করালীর সাপ মারার পর আবিস্কার করেছে সাপটি বাহন এবং চিৎকার করে উঠেছে।

ওয়ে আমার বাবাঠাকুরের বাহনরে। ওরই মাথায় চড়ে বাবাঠাকুর যে ভ্রমন করেন। আমি যে নিজের চোখে দেখেছিরে। দহের মাথায় বাবাঠাকুরের শিমুলগাছের দহের কোটরে সুখে নিদ্রে যাচ্ছিলেন রে, আমি যে পরশু দেখেছিরে।" এরপরে আর আবিস্কারের কিছু থাকে না। বাবাঠাকুরের শিমুলগাছ দহের মাথায় প্রাচীনতম বনস্পতি, তারই কোটরে এই আশ্চর্যজনক শিষ দেওয়া বিচিত্র বর্ণ বিষধর, তখন বাবাঠাকুরের আশ্রিত তাঁর বাহন এতে সন্দেহ কোথায়। সমবেত কাহারপাড়ার নরনারী শিউরে উঠল, মেয়েরা সমস্বরে বলে উঠলো হেই মারে! এই অলৌকিক বিশ্বাসই হাঁসুলী বাঁকের লোকজীবনের উৎসম্বল, তারা এইসব বিশ্বাস ও সংস্কারের মধ্য দিয়েই যুগযুগান্তর ধরে অতিবাহিত হয়েছে। তাই পুজা দিয়েছে আর ও ভক্তিমন্ত হয়ে আরো উপকরণের দ্বারা সজ্জিত করে বাবাঠাকুরের থানে। তারাশঙ্কর গ্রামীণ জীবনের মানুষ। হিন্দুসমাজে উচ্চবর্ণের দেবতার পাশাপাশি যেসব লৌকিক দেবতার যে অবস্থান আছে তা তিনি অত্যন্ত স্পষ্ট করে জানতেন। আর জানতেন বলেই সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন লৌকিক দেবপূজার:

"ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং-ড্যাডাং-ড্যাডাং-ড্যাডাঃ-এর-র-র ...... বাবাঠাকুর তলায় ভোরবেলায় ঝুঁকি ঝুকি থাকতে অর্থাৎ অন্ধকার থাকতেই ঢাকি ভোরের

বাজনা ধুমুল বাজাতে শুরু করলেন। রবিবার অমাবস্তা-ক্ষণ মিলেছে ভাল। বাবাঠাকুরের পুজো হবে। ফুলে বেলপাতায়, তেলে সিঁদুরে, ধূপে প্রদীপে, আতপে চিনিতে, দুধে রম্ভায় অর্থাৎ কলায়, মদে মাসে কাপড়ে দক্ষিণায় সমারোহ করে পুজো" (পৃঃ ৬৪)

হাঁসুলী বাঁকের উপকথার বাঁশবনের আদ্যিকালের অন্ধকারে লুকিয়ে আছে সেখানকার মানুষের অনেক লৌকিক বিশ্বাস ও কুসংস্কারের কাহিনী।

"বাঁশবনে দপদপিয়ে অর্থাৎ দপদপ করে জলে বেড়ায় পেত্যা অর্থাৎ আলেয়া। মধ্যে মধ্যে শাঁকচুন্নির চিলের মতন ডাক শোনা যায় শ্যাওড়া-শিমুলের মাথা থেকে। বাঁশবনে ক্যাঁ-ক্যাক-ক্যাঁ ডাক ওঠে। কাহারেরা মনশ্চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পায়—গেছো পেত্নী কি কোন ছোকরাভূত বাঁশের ডগাটা একবার মাটিতে ঠেকছে আবার ছেড়ে দিচ্ছে সেটা উঠে যাচ্ছে উপরে।" (পৃঃ ২২৬)

এসব কুসংস্কার আর লৌকিক বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গেই আছে নানা পালা-পার্বণ-উৎসব-অনুষ্ঠান যার মধ্য দিয়েই জীবনপ্রবাহ এগিয়ে চলেছে হাঁসুলী বাঁকের কাহারদের :

হাঁসুলী বাঁকের কাহারেরা তারই মধ্যে কেরোসিনের ডিবে জেলে কর্তাঠাকুরের নাম নিয়ে কোনমতে জটলা পাকিয়ে বসে থাকে। ছেলে ছোকরারা ঢোল বাজিয়ে কখনও গায় ধর্মরাজের বোলান, কখনও গায় মনসার ভাসান, ভাদ্রমাসে ভাদু—ভাঁজোর গান, আশ্বিন মাসে দশভুজার পূজায় গান পাঁচালী, কার্ত্তিক থেকে মাঘ ফাল্গুন পর্যন্ত শীত—তখন গান বাজনার আসর আসে টিমিয়ে, চৈত্রে আবার নুতন করে আসর বসে—ঘেঁটুর গান, সংক্রান্তির কাছাকাছি বসে গাজনের বোলানের গানের পালা।

আধুনিক জীবনের সঙ্গে কাহারদের জীবনের কোন যোগ নেই। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গেই এক লৌকিক জীবনধারা যে সদা প্রবাহমান এ উপন্যাসে তার প্রমাণ আছে। বনওয়ারী ভাবছে : "কোথা কোন্ 'ছাশে' সাত সমুদ্দুর তেরো 'নদী' পারে কে করছে কার সঙ্গে যুদ্ধ। এখানে চড়বে ধানের দর, চালের দর, আলু গুড় কলাই তরিতরকারির দর।...তবে কাহারপাড়ার হাঁসুলী বাঁকের বাঁশবনের মধ্যে যারা ছায়ার ঘেরায় বাস করে, তাদের ভাবনা নাই।" (পৃঃ ১৩০)

যুদ্ধ তাদের জীবনে খুব একটা আলোড়ন আনতে না পারলেও বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গানে প্রকাশ করেছে—

সায়েব লোকের লেগেছে লড়াই
ষাড়ের লড়াই যে মরে উল্ খাগোড়াই
ও হায়, মরিব মোরাই উল খাগোড়াই।

(পৃঃ ১৩৩)

অসংখ্য ঘেটু গান রচনা হচ্ছে।

(১) তাই ঘুনাঘুন—বাজেলা নাগরী
ননদিনীর শাসনে,—চরণের নূপুর থামিতে চায়না।
ঘরে থাকিতে মনো চায়না। ও-তাই-তাই ঘুনাঘুন।

(২) হায় কলিকালে, কতই দেখালে—
দেবতার বাহন পুড়ে ম'ল অকালে তাও মারলে রাখালে।
ও তার বিচার হ'ল না বাবা, তুমি বিচার কর।
অতি বাড় বাড়িল যারা তাদের ভেঙে পাড়ো।

(পৃঃ ১৩৫)

(৩) বিচার নাহিক বাবা পূরিল পাপের ভারা
সাঁজের পিদীপ বলো ফুঁ দিয়ে নিভালে কারা
ও বটতলাতে বাবা বটতলাতে
সাধু জনের একি লীলা সয্জে বেলাতে
মিহি গলাতে মোটা গলাতে হায় হায় কি গলাগলি
কত হাসি খুশি কত বলাবলি কত ঢলাঢলি!
সেই কাপড়ে বাবা তোমায় সয্জে দেখালে
হায় কলিকালে— (পৃঃ ১৩৬)

আচোটা মাটিকে অর্থাৎ কুমারী ভূমিকে প্রথম কর্ষণ করতে গেলে পূজা করতে হয়—এটি একটি লৌকিক বিশ্বাস। এই লোকবিশ্বাসটি আজও বাংলার সাধারণ মানুষ কিভাবে বহন করে চলেছে তার চিহ্ন আছে এই উপন্যাসে :

"বনওয়ারী এসে হাঁটু গেড়ে বসে প্রণাম করলে। আচোটা মাটিকে অর্থাৎ কুমারী ভূমিকে। মনে মনে বললে—তোমার অঙ্গে আঘাত করি নাই মা, তোমার অঙ্গকে মাজুনা করছি। সেবা করছি তোমার। তুমি ফসল দিয়ো। আমার ঘরে আলো হয়ে থেকো। তারপর সে কোঁচড় থেকে খুলে সেখানে নামিয়ে দিলে—বাবাঠাকুরের পূজার ফুল।"

আর একটি লোকবিশ্বাস ও সংস্কারের চিত্র।

সে তুলে নিলে একটি গোল নুড়ি। নুড়িটার কালো গায়ের মাঝখানে গোল সাদা দাগ—ঠিক পৈতের মত। বললে দেখ্! তারপর তুলে দেখালে একটা টুকরো অসুরের কাঁড়ি। ঠিক গাছের গুড়ির মতন চেহারা, এগুলিকে সুচাঁদ বলে—অসুরের কাঁড়ি। অর্থাৎ অসুরের হাড় জ'মে পাথর হয়ে গেছে। দেবতারা অসুর মেরেছিলেন, তাদেরই হাড়। এসব কাহারদের পিতিপুরুষের কথা। কিন্তু বনওয়ারীদের আমলে এসব বিশ্বাস চলে গিয়েছে।

সকল বুড়ার আদিবুড়া, সকল দেবতার বড় দেবতা—বাবা বুড়াশিব, বাবা কালারুদ্দু। বেলতলার বাবাঠাকুর। কাহারদের দেবতা। তাঁরও দেবতা বাবা কালারুদ্দু। ধর্মরঞ্জ যে ধর্মরাজ—তারও বড় বাবা কালরুদ্র। বাবা কালরুদ্রের প্রধানভক্ত চিরকাল হয় নীচ জাতের লোক। সেই আগ্যিকালের বান গোঁসাইয়ের কাল থেকে। এ প্রসঙ্গে একটি লোক কথা (Folk tale) চলে আসছে বহু কাল থেকে। সুচাঁদ পিসী বান—গোঁসাইয়ের কাহিনী বলে :

"বান গোসাই ছিল ছোট জাতের রাজা, কিন্তু ভোলা মহেশ্বর কালারুদ্ধের ভক্ত। মদ খেত, মাস খেত, কিন্তু বাবার চরণে ফুল দিতে, গাজনে সন্ন্যেস করতে কখনও ভুলতনা। সন্ন্যেস ক'রে আগুনের আঙারের ওপর বসে বাবাকে ডাকতেন। লোহার কাঁটার শয্যেতে শয়েন' করত সোনা রূপো হীরে মানিকের গয়না ছেড়ে মড়ার হাড়ের মালা গলায় পরত। কিবা আত্তি কিবা দিন গাল বাজিয়ে বম্—বম্ করত, বাবার নাম করতো। শিবোহে শিবোহে।' বাবার দয়াও তার উপর খুব। পিথীমির 'আজ্ঞা—আজড়া' থেকে দেবতারা পর্যন্ত বান গোঁসাইয়ের সঙ্গে এঁটে উঠতনা। গোঁসাইরের একশো পরিবার। একটি মাত্র সন্তান,—তাও কন্যে; নাম 'রোধা' অর্থাৎ উষা। সেই রোধাকে দেখে নারায়ণের নাতির মন টলল। নারায়ণের নাতি একদিন লুকিয়ে ঢুকল বান—গোঁসাইয়ের বাড়ীতে রোধাবতীর ঘরে। বান গোঁসাই জানতে পেরে বলে—কাটব নারায়ণের নাতিকে। নারায়ণের আসন টলল, মুকুট পড়ল, গুণে দেখতো? নারদ খড়ি পেতে গুণে বললেন বিবরণ। নারায়ণ ছুটে এলেন। গোঁসাই-এর বাড়ীতে হানাদিলেন। অ্যাই লেগে গেল লড়াই।

পিথিমী টলমল করতে লাগল। জলে আগুন লাগলো, মাটির বুক ফেটে ত জল উঠতে লাগল। আকাশের তারা খসে পড়ল। ছিষ্টি গেল ছিষ্টি গেল' রব উঠল। নারায়ণ "চক্ক" দিয়ে কেটে ফেললেন বান গোঁসাই-এর হাত পা। তবু গোঁসই হারে না, মরে না, মরে আবার বাঁচে। তখন এলে বাবার কালরুদ্দু।

কালরুদ্দু আর নারায়ণ—হরি আর আর হর, হরি হরের মিলন হলো। বাবা কালরুদ্দু মাঝে পড়ে রোধাবতীর সঙ্গে নারায়ণের নাতির বিয়ে দিয়ে দিলেন। হরি বললেন বান গোঁসাইকে, তোমাকে আমি বর দেব। তোমার কাটা হাত পা জোড়া লাগবে। তোমাকে পিথিমীর আজ্ঞা করে দেবে। বান গোঁসাই বললেন না কাটা হাত পা আমি চাই না। আজ্ঞাও আমি হব না বর যদি দেবে তো বর দাও। বাবা কালরুদ্দুর সাথে আমারও যেন পুজা হয়। আমার জাত জ্ঞাত পেজা সজ্জন ছাড়া বাবার গাজনের ভক্ত যেন কেউ না হয় হরি হর দুজনেই বললেন—তথাস্তু। সেই জন্যেই তো গোঁসইবানের হাত পা নাই, কেবল আছে ধড় অর্থাৎ শরীরটা আর মুণ্ডু।

সেই কারণেই বান-গোঁসই আজ কালরুদ্রের ভক্ত দেবতা। আগে বান গোঁসাইয়ের পূজো হবে, তবে, বাবা পূজো নেবেন। (পৃঃ ১৭৫)

গাজন ইত্যাদি লৌকিক ও পালাপার্বনগুলি গ্রাম্য মানুষের জীবনে কি অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে তার পরিচয় আছে এই উপন্যাসে। গাজনের বর্ণনা :

"বড় বড় ঢাকের পিঠে কাক চিল বকপক্ষীর পালক দিয়ে সাজানো ফুল্কো ডাঁটির মাথার চামরের চুল বাজনার সঙ্গে তালে তালে নাচে কাঁসি বাজে, শিঙা বাজে, ধূপের ধোঁয়ায় মৌ মৌ করে বাবা কালরুদ্রের থান, পাটাগণে অর্থাৎ পাটাঅঙ্গনে ভক্তরা নাচে—হাতে বেতের দণ্ড, গলায় 'উতুরী' অর্থাৎ উত্তরীয়, পরণে গেরুয়া কাপাড়, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গঙ্গামাটির 'তিনপুস্তক, রুখুচুল, উপবাসে শুকনো মুখ, তবু বাবার মহিমায় ধেই—ধেই করে নাচে"। (পৃঃ ২০১)

গাজন শেষের বর্ণনা :

"বছরের প্রথম দিন গাজন শেষ হল। শিব চললেন জলশয়নে কালীদহের তলায়, গোটা বছরটি থাকবেন সেথায়, আবার উঠবেন বছরের শেষে গাজনের একমাস আগে আগমী চৈত্রের শুভদিন অর্থাৎ পয়লা। বলবেন—সূর্যহে, চন্দ্রহে; আমি উঠলাম—বছরে শেষে কর। শিব জলশয়ানে যাচ্ছেন,—সেই মিছিল চলেছে জঙ্গলের কালারুদ্রের তলা থেকে বাঁশবাদির কাহার পাড়া হয়ে হাঁসলী বাঁকের কালীদহে। প্রথমে চলেছে ঢাক, কাঁসি, শিঘে, বাদ্যভাণ্ড, তারপর চলেছে সঙ। সঙ হ'ল আবার ভূত প্রেতের দানা দৈত্যের দল"

শিবপূজা ও গাজন হচ্ছে আসলে 'Sun-Festival' তারাশঙ্কর তা স্পষ্ট করেই উপস্থিত করেছেন।

উৎসব আর গান এই হচ্ছে হাঁসুলী বাঁকের কাহারদের জীবনের আনন্দ,

কাজে কর্মে ধর্মে—সমস্ত কিছুতেই তাদের গান। তাই ঘোষমশাই-এর বাংলা কুটির চাল ছাইতে ছাইতে গান ধরেছে পাগল :

ও সায়েব আস্তা বাঁধলে
হায় কলিকালে
কালে কালে সায়েব এসে আস্তা বাঁধালে—

ছেলেয়া ধুয়ো গাইলো—

ছমাসের কলের গাড়ী দণ্ডে চালালে
ও সায়েব আস্তা—

ঝপাঝপ খড় উঠেছে। ছুড়ছে নীচে থেকে বিচিত্র কৌশলে—উপরে চালে বসে বাব্রুইরা বাঁ হাতে ধরেছে অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে। পাশে গাদা করে রাখছে। বাঁখারিতে বাঁখারিতে বাবুই দড়ির বাধন দিচ্ছে, ঠুকছে, তারপর কোমর থেকে কাঠরি বা কাস্তে খুলে দড়ি কেটে আবার সেটা কোমরে গুজছে।

পাগলে গেয়ে চলেছে ঘেঁটুর গান—

লাল মুখো সায়েব এল কটা কটা চোখ
ছাশ বিছাশ থেকে এল দলে দলে লোক—
—ও সায়েব আস্তা—
ও সায়েব আস্তা বাঁধলে—কাহার কুলের অন্ন ঘুচাল
পাল্কী ছেড়ে র‍্যালে চড়ে কত বাবুলোক।
ও সায়েব আস্তা—(পৃঃ ২২৭)

আধুনিকীকরণের সঙ্গের সঙ্গে রেল গাড়ীর প্রবর্তন। হাসুলীবাঁকের কাহারদের জীবনে প্রভাব বিস্তার করেছে, অর্থনীতিতে আঘাত এনেছে তার ছবি আছে এই ঘেটু গানটিতে। কারখানার আকর্ষণ করালীর মতো কাহার পাড়াড় আরো যুবককে প্রলুব্ধ করছে। প্রাচীন পন্থীরা ভীত সন্ত্রস্ত। পাগলের আর একটি ঘেটু গানে তাই ফুটে উঠেছে :

জাতি যায় ধরম যায় মেলেচ্ছো কারখানা
ও পথে থেকো না বাবা, কত্তাবাবার মানা।
মেয়েরাও পথে গেলে, ফেরে নাকো ঘরে—
বেজাতেতে দিয়ে জাত যায় দেশান্তরে
লক্ষীরে চঞ্চল করে—অলক্ষীর কারখানা
ও পথে হেঁটোনা মানিক কত্তাবাবার মানা। (পৃঃ ২৩০)

পাল্কীর গান বাংলাদেশে লোকসঙ্গীতের মধ্যে কর্মসঙ্গীতের অন্তর্গত। আগেই বলা হয়েছে হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় কাহারদের কাজের পিছনে পিছনে সঙ্গীত এগিয়ে চলে। বিয়ের সঙ্গে দুটি পালকী যখন চলে তখন কার পাল্কী আগে যাবে, বরের না কনের তার প্রতিযোগিতা চলতে থাকে। 'পাল্কী বহনের গান'-এর একটি সুন্দর বর্ণনা এখানে উপস্থিত করে একথাই প্রমাণ হয় বাঙলাদেশের গ্রাম্য জীবনে সাধারণ নিম্নস্তরের জাতির মধ্যে লৌকিক সংস্কৃতির প্রভাব খুব বেশী। যথা:

"বনওয়ারীর পাল্কীতে বনওয়ারী আছে আর আছে সেই পাগল কাহার, পাল্কীর আগের ডাণ্ডায় প্রথমেই আছে পাগল। সে হাঁসুলী বাঁকের কাহার—পাড়াড় আদ্যিকালের গান গাইতে এসেছে। গান গাইতে পাগলের জুড়ি নাই। পাগল গেয়েছে—

সরাসরি ভাল পথে—
পিছন ওয়ালারা হেকেছে—প্লো-হিঁ
জোর পায়ে চলিব—
প্লো-হি-প্লো-হি—
আর ও জোর কদমে—
প্লো-হিঁ-প্লো-হিঁ-প্লো-হিঁ

পাগল হাসতে হাসতে সুর করে এবারে বলে—

বরেরো পাল্কি। প্লো-হিঁ-প্লো-হিঁ! পড়িল পিছনে—
প্লোহি—প্লো-হিঁ।
আগে চলে লক্ষ্মী—
প্লো-হিঁ-প্লো-হিঁ
পিছে এস নারায়ণ
হেঁ ইয়ো—হুঁশিয়ার
প্লো-হিঁ
পাশ কর পাল্কী—
প্লো-হিঁ
কর্ত্তার হুকুম মত—
প্লো-হিঁ
গিন্নির পাল্কী পিছনে পড়িল—
প্লো-হি-প্লো-হি-প্লো-হি-প্লা-হি [পৃঃ ২৫৩]

সংস্কারের বাঁশবন এবং জৈবকামনার আদিমকালের আপনি জন্মানো বট-অশত্থ-শিমূল-শিরীষ গাছের ঘন বনের ছায়ার তলায় ভূত-প্রেত-দানা-দৈত্য ইত্যাদি অলৌকিক জীবদের সর্বদা আনাগোনা। একটি দৃষ্টান্ত :

'বনওয়ারী বিস্ফারিত চেয়ে রয়েছে, ঘূর্ণিটা তাদের অতিক্রম করে সামনে এগিয়ে চলেছে। অদূরেই আটপৌরে পাড়ার বটগাছটা। ঘূর্ণিটা এগিয়ে গিয়ে কাণ্ডের গায়ে খুব ঘুরপাক খেয়ে থেমে চলে। গাছের পল্লবে চঞ্চলতা জেগে উঠল।

বনওয়ারী কাঁপতে লাগলো। ব্যাপারটা বুঝেছে বসন। সে শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে বা বাওড়? অর্থাৎ ভূত। কেবল হাঁসুলীবাকের কাহাররা কেন বাঙালাদেশের বহু গ্রাম্যমানুষ এই সব কুসংস্কার আর আদিম বিশ্বাস নিয়েই আজও জীবন অতিবাহিত করছে। বনওয়ারী মৃত কালশশীর প্রেতাত্মার কথা আরো ভাবছে : [পৃঃ ২৭৮]

"আটপৌরে পাড়ার বটগাছটার তলায় সে দাঁড়িয়ে আছে। ডালে দোল দিচ্ছে, হয়তো দোল খাচ্ছে। গভীর রাত্রে জ্যোৎস্নার মধ্যে সে নিশ্চয় এগিয়ে আসবে—বনওয়ারীর ঘরের দিকে। বাঁশবাদির বাঁশবন এবং গাছপালার ছায়ায় অন্ধকারের মধ্যে জ্যোৎস্নার সাদাগুণ-ছাপ গায়ে মেখে ঝরাপাতার উপর পা ফেলে শব্দ তুলে এসে দাঁড়াবে তার ঘরের পিছনে। টুপটাপ করে ঢেলা ফেলা দেবে ইশারা। আর ও গভীর রাত্রে বনওয়ারী উঠছে না দেখে গুনগুন করে গান গাইবে, তারপর ভোরের আকাশে শুকতারা উঠলে সে ফিরে যাবে বাঁশবনের ভিতর দিয়ে, কোপাইয়ের ধারে ধারে—কত্তার দহে গিয়ে নামবে, সেখান থেকে উঠে আবার আসবে বটতলায়।" (পৃঃ ২৯১)

হাঁসুলী বাঁকের উপকথার কালো বউয়ের প্রেত যোনী তো অলীক নয়। পিতিপুরুষের কথার মধ্যে ওরা আছে। তারা চোখে দেখেছে। ঘরের কোণে বাঁশবনের তলায়, হাঁসুলী বাঁকের মাঠে, জলার পাশে কেউ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে, কেউ কাঁদে, কেউ গান করে, কেউ ঘরের চালে বসে পা ঝুলিয়ে দেয়, কেউ মাঠে মাঠে আগুন লুফে লুফে খেলা ক'রে ছুটে বেড়ায়, কেউ জলে জলে পদক্ষেপের শব্দ তুলে বেড়ায়। এ ছাড়া আছে ভুলো, সে দিক ভুলিয়ে নিয়ে যায় বিপথে অপমৃত্যুর সম্ভাবনার দিকে। আর ও আছে 'নিশি'—রাত্রে কেউ কাউকে ডাকবার কথা থাকলে, নিশি এসে তার রূপ ধরে অবিকল তারই কণ্ঠস্বরে ডাকে। সেও নিয়ে যায় ওই অপঘাত মৃত্যুর পথে। এই সব প্রেতাত্মা মায়া অথবা

হিংসার-বশে ঘুরে বেড়ায় বাঁশবাদির ছায়ায় ছায়ায়—কোপাইয়ের কুলে, কুলে, ঘন পল্লব গাছের আড়ালে আড়ালে, হাঁসুলী বাঁকের মাঠে মাঠে। হাঁসুলী বাঁকের অলৌকিক জগতের পরিধি বহু বিস্তৃত—আকাশ থেকে মাটি পর্যন্ত, ইহলোক থেকে পরলোক পর্যন্ত। আর এই সব লৌকিক বিশ্বাস আর সংস্কারের মাঝখানে প্রবাহিত হয়ে চলছে বাংলাদেশে লোক সাধারণ। এই হচ্ছে তাদের নিজস্ব লোক সংস্কৃতি যা তাদের প্রতিদিনের জীবনকে পরিচালিত করে নিয়ে চলেছে। তাই বাঁশবাদির আদ্দিকালের বদ্দিবুড়ি সুচাঁদ আক্ষেপ করে বলে কিভাবে নয়নের বাবার বাবার বাবা চুরি করতে গিয়ে গেরস্তের ছুঁড়ে দেওয়া থালা কপালে গেঁথে মরে ভূত হয়েছিল, সুচাঁদ ভাষায় বলে :—

"মা, দিন আতে ঘরের সাধায়। না হয়তো-বাড়ির পঁদ্দাড়ে গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বসে থাকতেন। লোকে ভয়ে টটরস্ত।" (পৃঃ ২৯৩)

তারপর কিভাবে ভূত ছেলে ভুলাতো, কোপাই থেকে জল এনে দিত। রাজবাড়ি ভোজের খাদ্য দ্রব্য এনে দিত তার এক বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছে সুচাঁদ পিসি। এই হল হাঁসুলী বাঁকের সেকালের ভৌতিক লোকের ইতিকথা। তবে মানুষের জীবনের মত ভূতদেরও পরিবর্তন হয়েছে। ওই সুচাঁদই সেকথা আক্ষেপ করে বলে আজকালকার ছেলে-ছোকরারা বন্দুক, লাঠি, সোটা নিয়ে পরীক্ষা করবে ভূতেদের। সুচাঁদের ভাষা :

"তাঁদের কি গরজ? কেন তাঁরা এই সব ঝামেলায় থাকবেন? তার চেয়ে দূরে দুরান্তরে নদীর ধারে হাঁসুলী বাঁকের মাঠে দিব্যি থাকেন, শ্মশানের হাড় গোড় নিয়ে বাদ্যি বাজান, সাধ গেল নদীতে বিলে মাছ ধরে, চিতের আগুন লুফে খেলা করেন, গাছের মাথা থেকে হুস করে ভেসে চলে যান ও গাছে।"

(পৃঃ ২৯৪)

সুচাঁদ বলে হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, পাগল বাঁধে হাঁসুলী বাঁকের ছড়া পাঁচালী :

হাঁসুলী বাঁকের বনওয়ারী—যাই বলিহারী
বাঁধিল নতুন ঘর দখিণ দুয়ারী
সুবাসি বাতাসে ঘর উঠিল ভরি, মরিরে মরি।

কিংবা

অন্ধকারের ভাবনা কেনে হায়রে
অন্ধকারেই পরাণ পাখী সেই আশেতে যায়রে।
চোখে মুদিলেই হায় রোশ নাই এই আছে এই নাই রে।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে হাঁসুলী বাঁকের মানুষ যতই বিপর্যস্ত হোক না কেন পাল-পার্বন ব্রতউৎসব নাচ ও গান ভরিয়ে রেখেছে তাদের লৌকিক জীবনকে। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় 'পিথিমীর' সব জায়গার মতই আষাঢ় যায়, শাবন যায়, ভাদ্র আসে, শাবন শেষ হলে খেয়াল হয়, ক্ষেতে রোয়ার কাজ শেষ হ'ল। রোয়া শেষ হলে বাবাঠাকুরকে প্রণাম করে আর আয়োজন করে বাবাঠাকুরতলায় ইঁদপূজোর। ইঁদ হলেন ইন্দ্ররাজা, যিনি বর্ষার জল দিলেন, তার স্বর্গরাজ্যের রাজলক্ষ্মীর একঅংশ পাঠিয়ে দিলেন ভোম মণ্ডলে অর্থাৎ ভূমণ্ডলে। ইঁদ পূজোর ব্যবস্থা করেন জমিদার, খেটেখুটে যা দিতে হয় তা কাহারেরা দেয়, মাতব্বরী করেন জাঙ্গালের জোতদার মণ্ডল মহাশয়েরা। জমিদার দেন পাঁঠা, বাতাসা, মণ্ডা, মুড়কী, দক্ষিণে দুআনা, মণ্ডল মহাশয়েরা পাঁঠার চরণ অর্থাৎ ঠাঙ বৃত্তি পান, বাতাসা মণ্ডার প্রসাদ পান, কাহারেরা শেষ পর্যন্ত বসে থাকে। ইঁদ পূজোর শেষে থানটির মাটি নিয়ে পাড়ায় ফেরে। ওই মাটিতে পাড়ার মজলিশের থানটিতে বেদী বাঁধে। জিতাষ্টমীর দিন ভাঁজো সুন্দরীর পূজো হয়। ভাঁজো সুন্দরীর পূজাতে কাহার পাড়ার 'অঙখেলার চব্বিশ প্রহর থাকে, সে মাতনের হিসেব নিকেশ নাই।

ভাঁজো সুন্দরীর বেদী তৈরী করে লতায় পাতায় ফুল সাজিয়ে, আকণ্ঠ মদ খেয়ে পুরুষে মিলে গান করে আর নাচে। রাত্রে ঘুমাতে নাই, নাচতে হয়, গাইতে হয়—'জাগরণ' হল বিধি। পিতি পুরুষের কাল থেকে দেবতার হুকুম অঙের গান—অঙ'র খেলা সে যা খুশি করবে, চোখে দেখলে বলবে না কিছু, কানে শুনলে দেখতে যাবে না। ওই দিন সবকিছু মন থেকে মুছে ফেলবে।

কাহার সর্দার বনওয়ারী ছোকরাদের হুকুম দিয়েছে তুলে আন বেবাক—পুকুরের পদ্ম আর শালুক ফুল। পাগলও হাজির হয়েছে—ঐ দিনটিতে মাথায় আট—দশটা ডাঁটিসুদ্ধ শালুকফুল জড়িয়ে মাঝখানে একটা কাঁচা কাল ফুল গুঁজে বুড়ো ছোকরা গান গাইতে গাইতে হাঁসুলী বাঁকে ফিরেছে—

কোন ঘাটেতে লাগিয়েছ না ও আমার ভাঁজো সখিহে
আমি তোমায় দেখতে পৈছি না।
চাইতে তোমায় খুজতে এলাম হাঁসুলী বাঁকে—
বাঁশবনের কাশ বনে লুকায়েছ কোন ফাঁকে।
ইশারাতে দাও হে সখি সাড়া
আ-ভা চরণে তোমার লুটিয়ে পড়িগা
ও আমার ভাঁজো সখিহে।

পাগল ঢোল বাজনায় বোল তুলেছে—'কাজকাম' পাটকাম থাক্ থাক্ থাক্ থাক্। নাচ না কেনে মেয়েরা। নাচ না কেনে গো। চল, কোপাইয়ের ঘাট থেকে ঘট ভরে আনি। নে পাঁচ 'আকুড়ি'র সরা মাথায় নে। পাঁচ আকুরি অর্থাৎ পঞ্চাঙ্কুরা আবার সঙ্গে সঙ্গে গান উঠেছে:

'ভাজো লো সুন্দরী মাটি লো সরা
ভাজোর কপালে অঙের সিঁদুর পরা।
আলতার অঙের ছোপ মাটিতে দেব,
ও মাটি, তোমার কাছে মনের কথা বলিব।
পঞ্চ আকুড়ি আমার ধরলো ধরা। (পৃঃ ৩৭১)

পরিশেষে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থিত করা যেতে পারে। যথা: "গ্রন্থটির নামকরণের মধ্যেই ইহার অন্তঃপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হইয়াছে। ইহা ইতিহাস নয়, উপকথা। ইহার জীবনযাত্রা অতি প্রকৃতির ঘন কুহেলিকা মণ্ডিত। পৌরাণিক কল্পনা ·আলৌকিক সংস্কার ও বিশ্বাস, প্রাচীন কিংবদন্তীও অতীতের ঘটনা প্রতিফলিত জীবনদর্শন—এ সমস্তই প্রাত্যহিক জীবনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট।"

(বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসে ধারা। পৃঃ ৫৬৪)

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

অবশ্য এ প্রসঙ্গে বিংশশতকের সংগ্রামী লেখক মাণিক বন্দোপাধ্যায় এর দুটি উপন্যাস 'পুতুল নাচের ইতিকথা (১৯৩৬) এবং পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬) স্মরণীয়। তারাশঙ্করের পূর্বেই আঞ্চলিক জীবন চর্চা, লোকায়ত সংস্কার লৌকিক সাহিত্যকে কেন্দ্র করে দরিদ্রতম মানুষের জীবন সংগ্রামকে উপস্থিত করা হয়েছে। তারাশঙ্করের আঞ্চলিক উপন্যাস রাইকমল ১৯৩৫ এ প্রকাশিত হলেও আধুনিক জীবন সমস্যা ও যুগযন্ত্রণার রূপকার মাণিক বন্দোপাধ্যায়। জীবনে সাংকেতিকতা ও উদ্ভট সমস্যাকে মূর্ত করে তুলেছেন তার উপন্যাসে, নাগরিকতা দ্বারা আবিষ্ট হয়েও, মানব মনের সুগভীর রহস্যের মাঝে পদচারণা করলেও লৌকিক ঐতিহ্য ছিল তার অন্তরের গোপন কেন্দ্র। সচেতন নাগরিক বৈদগ্ধতার মাঝখানেই মাঝে মাঝে লৌকিক মানসিকতার প্রতিফলন হয়েছে। পুতুল নাচের ইতিকথা উপন্যাসে লৌকিক জীবনাচরণের কথা উপস্থিত আছে। আধুনিকতার বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেও গ্রামীণ জীবন ধারার যে একটা খুব বেশি

বদল হয়নি। গ্রামের মানুষ তাদের নিজস্ব লৌকিক সংস্কার, কুসংস্কার, আচার আচরণ ইত্যাদি নিয়ে আজও প্রবাহিত হয়ে চলেছে তাকেই গ্রামের ছেলে শশী ডাক্তার এক নুতন দৃষ্টি দেখেছে এবং পর্যালোচনা করেছে। পঞ্চানন চক্রবর্তীর জিজ্ঞাসায় শশী যখন উত্তর দিল 'ভূতো এই মাত্র মারা গেল,' তখন চক্রবর্তী মশাই বলতে শুরু করলো। 'বটে? বাঁচল না বুঝি ছেলেটা? তবে তোমাকে বলি শোন শশি, ভূতো যেদিন আছাড় খেলে। দিনটা ছিল বিষ্যুদবার। খবর পেয়ে মনে কেমন খটকা বাধল। বাড়ি গিয়ে দেখলাম পাঁজি,—যা ভেবেছিলাম। ছেলেটাও পড়েছে বারবেলাও হয়েছে খতম। লোকে বলে বারবেলা কি সবটাই সর্বনেশে বাপু? বিপদ যত ওই খতম হবার বেলা। বারবেলা যখন ছাড়ছে। পায়ে কাঁটাটি ফুটলে ঢুনিয়ে উঠে আক্যা পাইয়ে দেবে।—নবীন জেলের বড় ছেলেটাকে সেবার কুমিরে নিলে, সেদিনও বিষ্যুদবার, সেবারেও ছেলেটা খালে নামল, বারবেলাও অমনি ছেড়ে গেল, গাও দিয়ার খালে নইলে কুমির আসে?"

(পৃঃ ২৩)

খালের কুমির শুধু নয়, ভূতোর কথায় ভূতের কথাও এসে পড়লো শশী ভাবলো, এতগুলি মানুষের মনে মনে কি আশ্চর্য মিল। কারো স্বাতন্ত্র নাই, মৌলিকতা নাই, মনের তারগুলি একসুরে বাঁধা। সুখ দুঃখ এক, রসনাভূতি এবং ভয় ও কুসংস্কারে এক, হীনতা ও উদরতার হিসাবে কেউ কারো চেয়ে এতটুকু ছোট অথবা বড় নয়। [পৃঃ ২৩]

লোক মানসিকতার এই প্রধান লক্ষণগুলি মণিক বন্দোপাধ্যায় আশ্চর্যভাবে ধরতে পেরেছিলেন তারই পরিচয় উপস্থিত করেছেন তার উপন্যাসের মধ্যে।

আধুনিক ডাক্তারের সঙ্গে সংস্কারাচ্ছন্ন প্রাচীন কবিরাজের সংঘাত বাধে। যাদব বলে, "গাছেরপাতার রস নিংড়ে ওষধ করলে, গাছের পাতায় ওষুধের গুণ এল কোথা থেকে? সূর্য বিজ্ঞানে যে জানে—সে শেকড় পাতা খোঁজেনা, একখানি আতশী কাঁচের জোরে সূর্যরশ্মিকে তেজস্কর ওষুধে পরিণত করে রোগীর দেহে নিক্ষেপ করে,—মুহূর্তে নিরাময়। মোটা মোটা বই পড়ে ছুরি কাটা চালাতে শিখে কি হয়?

মনে মনে শশী রাগে। গ্রাম্য মনের অপরিত্যাজ্য সংস্কারে সেও যাদবকে ভক্তি কম করে না, তাই সায় না দিলেও তর্ক সে করিতে পারে না।" (পৃঃ ২৬)

লোক উৎসবের সঙ্গে গ্রাম্য জীবনের সুর পরিপূর্ণ জড়িত। নানা লৌকিক অনুষ্ঠানই গ্রাম্য লোকজনের আনন্দের খোরাক। তার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন লেখক।

গ্রামের পূজার উৎসব শুরু হইয়া গেল। উৎসব নয়, গ্রামের জমিদার শীতল বাবুর বাড়ী তিন দিন যাত্রা, পুতুল নাচ, বাজি পোড়ানো, সাতগাঁর মেলা পূজা তো আছেই। গ্রামবাসীর ঝিমানো জীবন প্রবাহে হঠাৎ প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে। যাত্রা আরম্ভ হয় সপ্তমীর রাত্রে। যাত্রার দল তার আগেই গ্রামে হাজির হইয়াছেন।" (পৃঃ ৪৩)

মেয়েলী গ্রাম্য ছড়া গ্রাম্য মেয়েদের একমাত্র বাক্য সম্পদ, কথায় কথায় তারা ছড়া বলে আনন্দ পায় বা উত্তর প্রত্যুত্তর দেয়, লেখক একটি জায়গায় এই লৌকিক উপাদানটিকে সুন্দর করে প্রকাশ করেছেন। যথা :

"কুমুদ খুশী হইয়া বলে, আজ যে তুমি এমন মতি ?
মতি বলে,—বিন্দে শুধায় আজকে তুমি এমন কেন রাই,
অধর কোণে দেখছি হাসি, শ্যাম তো কাছে নাই ?
কুমুদ বলে, মানে কি হল ?
মতি বলে, বলি গো বলি—
রাই কহিলেন, ওলো বিন্দে, চোখের মাথা খেলি !
ওই চেয়ে ছাখ কদমতলে আমরা গলাগলি।
কুমুদ আবার বলিল, মানে কি হল ?
মানে ? আনন্দের নেশায় এতটুকু গেঁয়ো মেয়ে ছড়া বলিয়াছে।
তারও মানে চাই ? মনে তো মতি জানে না।" (পৃঃ ১৮৩)

"পদ্মা নদার মাঝি" উপন্যাসের মধ্যেও আছে আঞ্চলিকতা এবং লৌকিক বিশ্বাস, মেলা পার্বণের এক সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

পদ্মার তীরবর্তী মাঝি ও জেলেদের জীবন সংগ্রামের সার্থক রূপচিত্র। এদেশের মানুষের পদ্মা ও পদ্মার খালগুলি প্রধান উপজীবিকা। কেউ মাছ ধরে কেউ মাঝিগিরি করে। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা পিপাসায়। কাম ও মমতায়, স্বার্থ ও সংকীর্ণতায়, আর দেশী মদে, এরই মাঝখানে প্রবাহিত এদের জীবন ধারা। ঔপন্যাসিক এর মধ্যে এদের লৌকিক ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগসূত্রটি তুলে ধরেছেন। রথ উপলক্ষে গ্রাম্য মেলার একটি সুন্দর রেখা চিত্র উপস্থিত করেছেন : 'রথের দিন এই মাঠে প্রকাণ্ড মেলা বসে, উলটা-রথ পর্যন্ত স্থায়ী হয়।…… গ্রাম্যবাসীর প্রয়োজনীয় ও শখের পণ্য সমস্তই মেলায় আমদানি হয়··· কাপড়ে দোকান, মনোহরী দোকান মাটির খেলনার দোকান। খাবারের দোকান, দোকান যে কত বসে তার সংখ্যা নাই। গোরু ছাগল বিক্রয় হয়, কাঁঠাল ও

আনারসে মেলার একটি দিক ছাইয়া যায়। (মাণিক গ্রন্থাবলী ১৩৭৬ পৃঃ ৪৩)

মেলার প্রভাব এই সব গ্রামীণ মানুষদের কিরূপ অসাধারণ, ঔপন্যাসিক তারও বর্ণনা উপস্থিত করেছেন: বৌরা হাসি মুখে লাল পাছা পাড় শাড়ী নাড়িয়া চাড়িয়া দেখে নুতন কাঁচের চুড়ির বাহারে মুগ্ধ হয়, কাঁচ ও কাঠের পুঁতির মালা সযত্নে কুলুঙ্গিতে তুলিয়া রাখে, ছেলে মেয়েরা বাঁশি বাজায় আর মাটির পুতুল বুকে জড়াইয়া ধরে।' (পৃঃ ৫৫)

গান পদ্মানদীর মাঝিদের জীবনের সঙ্গে একাত্ম। লোকসঙ্গীত ও লোক-জীবন…একত্রে সুগ্রথিত, তাই হোসেন মিয়া গান গায়:

আঁধার রাইতে আশমান জমিন ফারাক কইরা থোও
বোনধু কত ঘুমাইবা
মানের পাতে রাইতের পানি হইল রুপার কুপি,
উঠ্যা দেখবা না। (পৃঃ ৬৭)

আবার কখনও গায়: পিরীত কইরা জইলা মলাম সই, আ-লো-সই।
আগুন সমান সোনার, জউলা চুকা দৈ, আ-লো-সই!
থাকলি ঘরে ছ্যাচন কেমন ঢেঁকির তলে চিড়া যেমন,
বিদেশ গেলি, মনের পোড়ন ভাইজা করে খৈ, আ-লো-সই!
(পৃঃ ১১৫)

যাত্রা ও বিভিন্ন পল্লীগীতি বাংলার লোকসাহিত্যের বিশিষ্ট সম্পদ। এই উপন্যাসে তারও ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায় একটি যাত্রার দৃশ্য বর্ণনায় ও দর্শকদের উপর তার প্রতিক্রিয়ায়: 'তবু রাত জাগিয়া ভিড় করিয়া সকলে ভাসান যাত্রা শোনে, একবার নয় বহুবার। ভাঙা হারমোনিয়াম আর ঢ্যাপসা তবলার সংগত, মশালের লাল আলো, আলুবেচা, তেলবেচা, অভিনেতা তবু কী মোহ এ যাত্রার, কুবের ঠায় বসিয়া থাকে। ঢিমাইয়া ঢিমাইয়া অভিনয় চলে, মা মনসা একটা গান করেন, চাঁদ সদাগর দুটো কথা বলে, মৃত লক্ষীন্দর উঠিয়া একটা গান করিয়া আবার মরিয়া যায়। (পৃঃ ১৩৪)

বিভুতি ভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ গ্রাম্য জীবন ও গ্রামীণ মানুষের ঔপন্যাসিক, সুতরাং তার উপন্যাসগুলিতে লৌকিক জীবন ধারার ছবি থাকবে এতো স্বাভাবিক কথা। লৌকিক সংস্কার, আচার-আচরণ, কথা উপকথা, উৎসব অনুষ্ঠান এর পরিচয়

আছে তার উপন্যাসে। আরণ্যক উপন্যাসের ছত্রে ছত্রে এই লৌকিক মানসিকতার পরিচয় আছে। লেখক বলেছেন। "গন্নুর মুখে কত অদ্ভুত কথা শুনিতাম উড়ুক্কু সাপের কথা, জীবন্ত পাথর ও আতুড়ে ছেলের হাঁটিয়া বেড়াইবার কথা ইত্যাদি ওই নির্জন জঙ্গলের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে গন্নুর যে সব গল্প অতি উপাদেয় ও অতি রহস্যময় লাগিত আমি জানি কলিকাতা শহরে বসিয়া সে সব গল্প শুনিলে তাহা আজগুবি ও মিথ্যা মনে হইতে বাধ্য।......গন্নু আমাকে যে গল্প বলিত তাহা রূপকথা নহে। তাহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বিষয়।"

(পৃঃ ৩০)

একদল নাচতে এসেছে বিহারের গ্রাম্য লোকনৃত্য। কি নাচ তারা দেখাবে বলাতে এক বৃদ্ধ বললেন যে 'হো হো নাচ আর ছক্কর বাজি নাচ।' সেই নাচ লেখকের মনে হয়েছে—'অদ্ভুত ধরনের নাচ ও সম্পূর্ণ অপরিচিত সুরের গান। এই মুক্ত প্রকৃতির বিশাল প্রসার ও এই সভ্য জগৎ হইতে বহুদূরে অবস্থিত নিভৃত বন্য আবেষ্টনীর মধ্যে, এই দিগন্ত পরিপ্লাবী ছায়াবিহীন জ্যোৎস্না লোকে এদের এই নাচ গানই চমৎকার খাপ খায়। একটি গানের অর্থ এইরূপ।

শিশুকালে বেশ ছিলাম।

আমাদের গ্রামের পিছনে যে পাহাড়, তার মাথায় কেঁদবন, সেই বনে কুড়িয়ে বেড়াতাম পাকাফল, গাঁথতাম পিয়াল ফুলের মালা দিন খুব সুখেই কাটত, ভালবাসা কাকে বলে, তা তখন জানতামনা, পাচন হরী ঝরণার ধারে সেদিন কররা পাখী মারতে গিয়েছি। হাতে আমার বাঁশের নল ও আটা কাঠি। তুমি কুসুম রঙে ছোপানো শাড়ী প'রে এসেছিলে জল ভরতে। দেখে বললে, —ছিঃ, পুরুষ মানুষে কি সাত—নলি দিয়ে বনের পাখী মারে।

আমি নাহয় ফেলে দিলাম বাঁশের নল, ফেলে দিলাম আটা কাঠির তাড়া। বনের পাখী গেল উড়ে, কিন্তু আমার মন পাখী তোমার প্রেমের ফাঁদে চিরদিনের মত যে ধরা পড়ে গেল। আমার সাত নলি চেলে পাখী মারতে বারণ করে এ কি করলে তুমি আমার? কাজটা কি ভাল হ'ল, সখি? ওদের ভাষা কিছু বুঝি, কিছু বুঝি না, গানগুলি সেই জন্যই বোধ হয় আমার কাছে আরও অদ্ভুত লাগিল। এই পাহাড় ও পিয়াল বনের সুরে বাঁধা এদের গান। এখানেই ভালো লাগিবে।

(পৃঃ ৭২-৭৩)

নির্জন অরণ্যপ্রান্তে বাস করে সাধারণ গ্রাম্য মানুষ। নানা অলৌকিক উপদেবতার, হরী পরীর বিশ্বাস তাদের অন্তরে সুগ্রথিত, নানা কুসংস্কারের মধ্যেই

তাদের বসবাস। বিভূতিভূষণ এইসব মানুষদের দেখেছেন, তাদের সংস্কারাচ্ছন্ন জীবনযাত্রাকে পর্যালোচনা করেছেন এবং সযত্নে স্থান দিয়েছেন তার আরণ্যকের পাতায় পাতায়। বোমাই বুরু জঙ্গলের আমিন অলৌকিক কারণে পাগল হয়ে যাবার পর আসরফি টিণ্ডেল বলেছে: "ঠাকুর দাদার মুখে শুনেছি, বোমাই মারু পাহাড়ের উপর ওই যে বটগাছটা দেখছেন দুরে একবার তিনি পূর্ণিয়া থেকে কলাই বিক্রির টাকা নিয়ে জ্যোৎস্না-রাত্রে ঘোড়ায় করে জঙ্গলের পথে ফিরছিলেন—ওই বটতলায় এসে দেখেন একদল অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে হাত ধরাধরি করে জোৎস্নার মধ্যে নাচছে। এদেশে বলে 'ডামাবাণু'—একধরনের জীনপরী নির্জন অঞ্চলের মধ্যে থাকে। মানুষ বেঘোরে পেলে মেরেও ফেলে।" (পৃঃ ৭৬)

শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ ইজারাদারের ছেলেটি মারা যাওয়ায় এমন আতঙ্কের সৃষ্টি করল যে সন্ধ্যার পর ওখানে আর কেউ যেতে সাহস করতো না। দিনকতক সেখানে শুয়ে লেখক এক অজানা আতঙ্কে শিউরে উঠতো আর মনে হোত: এসব জায়গা ভাল নয়, এর জ্যোৎস্নাভরা নৈশ-প্রকৃতি রূপকথার রাক্ষসী রানীর মত, তোমাকে ভুলাইয়া বেঘোরে লইয়া গিয়া মারিয়া ফেলিবে, যেন এইসব স্থান মানুষের বাসভূমি নয় বটে, কিন্তু ভিন্ন লোকের রহস্যময়, অশরীরী প্রাণীদের রাজ্য, বহুকাল ধরিয়া তাহারাই বসবাস করিয়া আসিতেছিল, আজ হঠাৎ তাদের সেই গোপন রাজ্যে মানুষের অনধিকার প্রবেশ তাহারা পছন্দ করে নাই, সুযোগ পাইলেই প্রতিহিংসা লইতে ছাড়িবে না।" (পৃঃ ৮৩)

অরণ্যের আনাচে কানাচে পরী হুরির রাজত্ব, আমি রঘুবীর প্রসাদের কাছে সরস্বতী কুন্ডার কথা তুলতেই সে বলে—"হুজুর, ও মারাত্মক কুণ্ডী, ওখানে হুরী-পরীরা নামে, জ্যোৎস্না রাত্রে তারা কাপড় খুলে রাখে ডাঙ্গায় ঐ সব পাথরের ওপর, রেখে জলে নামে। সে সময় যে তাদের দেখতে পায়, তাকে ভুলিয়ে জলে নামিয়ে ডুবিয়ে মারে। জ্যোৎস্নার মধ্যে দেখা যায় মাঝে মাঝে পরীদের মুখ জলের উপরে পদ্মফুলের মত জেগে আছে।"

অরণ্য আদিমতার মাঝে নানা শ্রেণীর বনদেবতা, বিভূতিভূষণ এরকম এক দেবতার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন, 'টাঁড়বারো হচ্ছে বুনো মহিষের দেবতা। সাঁওতাল বুড়োর কথায় শোনা যাক: তারপর কি হ'ল শুনলে অবাক হ'য়ে যাবেন হুজুর। এখনও ভাবলে আমার গা কাঁটা দেয়। গহিন রাতে আমরা নিকটেই একটা বাঁশঝাড়ের আড়ালে অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছি। বুনো

মহিষের দলের পায়ের শব্দ শুনলাম। তারা এগিয়ে আসছে। ক্রমে তারা খুব কাছে এল। গর্ত থেকে পঞ্চাশ হাতের মধ্যে। হঠাৎ দেখি গর্তের দশহাত দূরে এক দীর্ঘাকৃতি কালোমত পুরুষ নিঃশব্দে হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে। এত লম্বা মূর্ত্তি, যেন মনে হ'ল বাঁশঝাড়ের আগায় ঠেকেছে, বুনো মহিষের দল তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, তারপরে ছত্রভঙ্গ হ'য়ে এদিক ওদিক পালাল। ফাঁদের ত্রিসীমানাতে এলনা একটাও। বিশ্বাস করুন আর না করুন, নিজের চোখে দেখা।" (পৃঃ ১৪৭)

পথের পাঁচালী

'পথের পাঁচালী' উপন্যাসটি লোকায়ত জীবনধারার সমস্ত পরিচয়কে বহন করে আছে। পথের পাঁচালী উপন্যাসে সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে লৌকিক উপাদান ও লৌকিক ঐতিহ্যের স্পর্শ। বল্লালী বালাই অধ্যায়-এর সূচনাতেই ইন্দির ঠাকরুণ ও দুর্গাও আন্তরিক সম্পর্কটি গড়ে উঠেছে ছড়া ও রূপকথার মধ্য দিয়ে। লেখক বর্ণনা দিয়েছেন। সন্ধার সময় তার মেয়ে ঘরের দাওয়ায় ছেঁড়া কাঁথা পাতা বিছানায় বসিয়া অনেকক্ষণ পর্যন্ত একমনে পিসিমার মুখে রূপকথা শোনে। খানিকক্ষণ এ গল্প ও গল্প শুনিবার পর খুকী বলে, পিতি, সেই ডাকাতের গল্পটা বল্‌তো!……তাহার পর সে পিসিমার মুখে ছড়া শুনে। সেকালের অনেক ছড়া ইন্দির ঠাকরুণের মুখস্থ ছিল।……তাহার জানা সব ছড়াগুলিই আজকাল প্রতি সন্ধ্যায় একবার ক্ষুদ্র ভাইঝিটির কাছে আবৃত্তি করিয়া ধার সানাইয়া রাখে। টানিয়া টানিয়া আবৃত্তি করে—

ও ললিতে চাঁপ কলিতে একটা কথা শুন্‌লে,
রাধার ঘরে চোর ঢুকেছে চুড়ো বাঁধা এক মিনসে। [পৃঃ ৯]

লৌকিক বিশ্বাসের নানা পরিচয় আছে। বীরু রায়ের কাহিনী বলে লেখক বলেছেন। 'বাড়ি আসিয়া বীরু রায় আর বেশী দিন বাচেন নাই। এই রূপে তাঁহার বংশে এক অদ্ভুত ব্যাপারের সূত্রপাত হইল। নিজের বংশ লোপ পাইলেও তাঁহার ভাইয়ের বংশাবলী ছিল। কিন্তু বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান কখনও বাঁচিত না, সাবালক হইবার পূর্বেই কোন না কোন রোগে মারা যাইত। সকলে বলিল ব্রহ্মশাপ ঢুকিয়াছে। হরিহরের মাতা তারকেশ্বরের দর্শনে গিয়া এক সন্ন্যাসীর কাছে কাঁদা কাটা করিয়া একটি মাদুলি পান। মাদুলীর গুণেই হোক বা ব্রহ্মশাপের তেজ দুই পুরুষ পরে কর্পূরের মত উবিয়া যাওয়ার ফলেই হোক, এত বয়সেও হরিহর আজও বাঁচিয়া আছে।' [পৃঃ ১৩]

ছড়া ব্যবহার—

(১) লাথি ঝাঁটা পায়ের তল,
ভাত পাথরটা বুকের বল— পৃং ২৯

(২) বালুচরের বালুরচরে একটা কথা কই—
মোষের পেটে ময়ূর ছানা দেখে এলাম সই।

মন্ত্র মূলক ছড়া

(৩) স্বগ্‌গো থেকে এলো রথ নামলো খেতুতলে
চব্বিশ কুটী বাণ বর্ষা শিবের সঙ্গে চলে
সত্য যুগের মড়া আর আগুন যুগের মাটী।
শিব শিব চলে রে ভাই ঢাকে ত্থাও কাঠি (পৃঃ ১৯৬)

(৪) লেবুর পাতায় করমচা
হে বৃষ্টি ধরে যা

(৫) হলুদ বনে বনে
নাক ছবিটি হারিয়ে গেছে সুখ নেইকো মনে।
(পৃঃ ২০১)

'ডাইনী বিশ্বাস' বাংলাদেশের একটি প্রচলিত লৌকিক বিশ্বাস, 'পথের পাঁচলীর আতুরী ডাইনীর কাহিনীতে তার পরিচয় আছে। লেখকের বর্ণনায়—অপুর মুখ শুকাইয়া গেল……আতুরী ডাইনীর বাড়ী।……সন্ধ্যাবেলায় কোথায় তাহারা আসিয়া পড়িয়াছে। কে না জানে ওই উঠানের গাছে চুরি করিয়া বিলাতী আমড়া পাড়িবার অপরাধে ডাইনীটা জেলেপাড়ার কোন এক ছেলের প্রাণ কাড়িয়া লইয়া কচুর পাতায় বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছিল। পরে গাছ তাহা খাইয়া ফেলিবার সঙ্গে সঙ্গে বেচারীর আমড়া খাইবার সাধ এ জন্মের মত মিটিয়া যায়। কে না জানে সে ইচ্ছা করিলে চোখের চাহনীতে ছোট ছেলেদের রক্ত চুষিয়া খাইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারে, যাহার রক্ত খাওয়া হইল, সেকিছুই জানিতে পারিবে না. কিন্তু বাড়ী গিয়া খাইয়া দাইয়া যেই সে বিছানায় শুইবে আর পরদিন উঠিবেনা। কতদিন শীতের রাত্রে লেপের তলায় শুইয়া দিদির মুখে আতুরী ডাইনীর গল্প শুনিতে শুনিতে বলিয়াছে—রাত্রিতে তুই ও সব গল্প বলিস্‌নে দিদি, আমার ভয় করে—তুই সেই কুচবরণ রাজকন্তের গল্পটা বল্‌ দিকি?"
(পৃঃ ১১০)

গ্রামের চড়ক পার্বণ, নীলপুজো। সমস্ত গ্রামেই তার চাঞ্চল্য। এই লোক উৎসব-এর লৌকিক বিশ্বাসের সমন্বয় ঘটেছে শিশু মনে তার প্রতিক্রিয়া :

টুনু বলিল—আজ রাত্রে সন্নিসিরা শ্মশান জাগাতে যাবে

রাণী বলিল—আহা, তা বুঝি আর জানিনে? একজন মরা হবে।

তাকে বেঁধে নিয়ে যাবে শ্মশানের সেই ছাতিমতলায়। তাকে আবার বাঁচাবে, তারপর মড়ার মুণ্ডু নিয়ে আসবে—ছড়া বলতে বলতে আসবে—ওর সব মন্তর আছে—"(পৃঃ ১৯৩)। অপুর মনে এর প্রতিক্রিয়া :

অপুর গায়ে কাঁটা দিয়া উঠিল। চারিধারে অন্ধকার সন্ধ্যা, আকাশে কালো মেঘ, বাঁশবন, শ্মশানের গন্ধ। শিবের অনুচর ভূতপ্রেত—ছোট ছেলের মন বিস্ময়ে, ভয়ে রহস্যে, অজানা অনুভূতি ভরিয়া উঠিল।

চতুর্থ অধ্যায়

॥ এক ॥

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মানুষের গল্পের প্রতি অনুরাগের মধ্যে নিহিত আছে উপন্যাসের মূল সূত্র। গল্প বা কাহিনী শুনবার প্রবৃত্তি মানুষের চিরায়ত। তাই আদি যুগের পৃথিবীর সমস্ত দেশের সাহিত্যই কাহিনী বা আখ্যানমূলক, আমাদের দেশের রামায়ণ-মহাভারত থেকে শুরু করে ওদেশের ইলিয়াড-ওডিসি প্রভৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যগুলি মূলতঃ আখ্যানমূলক। এসব মহাকাব্যগুলির মধ্যে যেমন আখ্যানের চমৎকারিত্ব আছে তেমনি আছে অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ যা দ্বারা কাহিনীগুলি একটি সম্পূর্ণ ঐক্যতা এবং স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভ করেছে। ঘটনার দুরন্ত প্রবাহের পটভূমিকায় চরিত্রগুলি সজীব ও স্বাতন্ত্র্যতায় ভূষিত হয়ে মহাকাব্যগুলির আখ্যানভাগ চিরকালের মানুষের কাছে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দেশ ও কালের সীমানা অতিক্রম করে আকর্ষণ লাভ করেছে। এসব মহাকাব্যের মধ্যে চরিত্র ও কাহিনী একসূত্রে গ্রথিত হয়ে এক অপূর্ব ব্যঞ্জনার মধ্যে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু আর এক প্রকার গল্প আছে যা মূলতঃ উদ্দেশ্যমূলক বা চমকপ্রদ ঘটনাবলীর সমাবেশ। এসব গল্প কাহিনীর মধ্যে চরিত্রের চেয়ে সমাজচিত্র, বাস্তব অভিজ্ঞতা, প্রাত্যহিক জীবনের নানা ইঙ্গিতময় উপাদান। পরিপূর্ণ বিকশিত স্বাতন্ত্র্য-তীক্ষ্ণ মানব চরিত্র এখানে অনুপস্থিত—ঘটনার ঘনঘটা, কাহিনীর চমৎকারিত্ব বাস্তব জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইঙ্গিতময় চিত্রাঙ্কণ, রোমান্সের মাধুর্য এখানে গল্পের মূল রসটি জমিয়ে তোলে এবং শ্রোতাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে। আমাদের দেশের হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, বৌদ্ধজাতক, কথা সরিৎসাগর, আরব্য উপন্যাস, য়ুরোপের ডেকামেরণ, বাংলার রূপকথা—উপকথা—ব্রতকথা এবং ইতিকথা পুরাকথা—এ জাতীয় গল্পের উদাহরণ। এসবের মধ্যে কতকগুলিতে পশুপক্ষীর রূপকচ্ছলে মানবজীবনের নানা তত্ত্বকথা ও মানবপ্রকৃতির নানা বৈশিষ্ট্য সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থিত করা হয়েছে, কতকগুলিতে নিরঙ্কুশ রঙীন কল্পনার সাহায্যে অবাস্তব অসম্ভব আজগুবি ঘটনা পরম্পরার মাধ্যমে জীবনের রহস্যময়, আকস্মিক কুয়াশাবৃত দিকটাকে সঙ্কেতের সাহায্যে উপস্থিত করা হয়েছে। এইসব গল্পের কাহিনীগুলি যেমন অস্পষ্ট ছায়াময় ও রহস্যাবৃত ঠিক

তেমনি কাহিনীর নায়ক নায়িকা ও চরিত্রগুলির কার্যাবলী; আচারণও অস্পষ্ট, ছায়াবৃত, কুহেলিকায় ঢাকা, আবার ঘটনা—চমৎকারিত্বের অন্তরাল থেকে অর্ধস্ফুট এই সব গল্পকাহিনীতে পাঠক ক্রমশঃ জড়াইয়া পড়ে ঘটনার প্রবাহ তাদের গল্পের গভীরে টেনে নিয়ে যায়, গল্পের মাধুর্য ও মায়াময় রসে তাদের অবিষ্ট করে ফেলে। ফলে পাঠকের আর নিজস্বতা থাকে না ক্রমশঃ সে গল্পের বুনুনীর জালে জালে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে গল্পের যে যাদুকরী মোহময়তা আছে তাতে আবিল হয়ে যায়।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্যে লৌকিক উপাদানের প্রভাব প্রসঙ্গে উপরোক্ত বক্তব্যটি প্রথমেই স্মরণ আসে। শরৎচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাস রচনার মূল কথাই হোল 'গল্পরস' বা গল্পের আকর্ষণ। একটি নিপুণ কথকের মতো শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসগুলিতে গল্পের পর গল্প সাজিয়ে কাহিনীর পর কাহিনী রচনা করে, ঘটনার পর ঘটনার মালা গেঁথে উপন্যাসের মধ্যে যে, আশ্চর্য গল্পের সম্ভার রচনা করেছেন তা অতি বিস্ময়কর। শরৎচন্দ্রকে পরবর্তীকালে যে অপরাজেয় কথা-শিল্পী রূপে আখ্যাত করা হয়েছে তারও মূল সূত্র বুঝি নিহিত আছে কথার পর কথা দিয়ে, ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে 'গল্পরস'কে এক মোহময় পট-ভূমিকায় স্থাপিত করার মধ্যে। লোকশ্রুতিবিদ লোককথার শিল্পরূপ (art of Folktale) প্রসঙ্গে বলেছেন: লোককথা সজীব শিল্প ইহাকে Living Art বলা হইয়া থাকে। ইহা বলিবার মধ্যে যে রসসৃষ্টি হইয়া থাকে, শুনিবার মধ্যেও তেমনই একটি আনন্দের সৃষ্টি হয়। ইহার মধ্যে নীরস গল্পের আবৃত্তি মাত্র শুনা যায় না, বরং একটি অপূর্ব শ্রুতি সুখকর রসের ব্যঞ্জনা অনুভূত হয়'। (বাংলার লোকসাহিত্য ৪র্থ খণ্ড, ২, ৭৬০, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য) রবীন্দ্রনাথও 'গল্পরসের' এই মাধুর্য ও মোহময় আকর্ষণটিকে তাঁর অপূর্ব ভাষায় প্রকাশ করে বলেছেন:

'এক যে ছিল রাজা।

তখন ইহার বেশী কিছু জানিবার আবশ্যক ছিল না। কোথাকার রাজা, রাজার নাম কি, এ সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া গল্পের প্রবাহ রোধ করিতাম না। রাজার নাম শিলাদিত্য কি শালিবাহন, কাশী কাঞ্চী কনোজ কোশল অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গের মধ্যে ঠিক কোনখানটিতে তাঁহার রাজত্ব এসকল ইতিহাস-ভূগোলের তর্ক আমাদের কাছে নিতান্তই তুচ্ছ ছিল। আসল যে কথাটি শুনিলে অন্তর পুলকিত হইয়া উঠিত এবং সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্তের মধ্যে

বিদ্যুৎবেগে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হইত, সেটি হইতেছে—এক যে ছিল রাজা···

গল্প যখন ফুরাইয়া যায়, আরামে শ্রান্ত দুটি চক্ষু আপনি মুদিয়া আসে, তখনো তো শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটিকে একটি স্নিগ্ধ নিস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ স্রোতের মধ্যে সুষুপ্তির ভেলায় করিয়া ভাসাইয়া দেওয়া হয়, তারপরে ভোরের বেলায় কে দুটি মায়ামন্ত্র পড়িয়া তাহাকে এই জগতের মধ্যে জাগ্রত করিয়া তোলে।

ছেলেবেলায় সাতসমুদ্র পার হইয়া মৃত্যুকেও লঙ্ঘন করিয়া গল্পের যেখানে যথার্থ বিরাম, সেখানে স্নেহময় সুমিষ্ট স্বরে শুনিতাম—

আমার কথাটি ফুরালো
নটে গাছটি মুড়ালো।'

—উপরোক্ত দুটি উদ্ধৃতির মধ্যে আমাদের চিরায়ত লোককথা বিশেষ করে রূপকথার আঙ্গিকের (Form of Folk Tale) যে বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে :

প্রথমতঃ লোককথার একটি কাহিনী থাকবে, দ্বিতীয়তঃ কাহিনীটি ঘটনার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকবে, তৃতীয়তঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা গল্পের সমাবেশ থাকবে, চতুর্থত: ক্ষুদ্র গল্পগুলি একটি মূল কাহিনীর সূত্রে গ্রথিত থাকবে। পঞ্চমতঃ ঘটনাগুলি চমকপ্রদ, উত্থান পতনময়, বেগসঞ্চারী হবে। ষষ্ঠতঃ ঘটনা ও গল্পগুলি একটি সুর, ছন্দ, স্থাপনের দ্বারা একসূত্রে গ্রথিত হয়ে একটি সুরের মায়াময় জগৎ তৈরী করবে। সপ্তমতঃ চরিত্রগুলি ঘটনা-স্রোতের প্রবাহে প্রবাহিত হবে। অষ্টমতঃ লোককথার রচয়িতা বা কথকের বলার ভঙ্গিতে একটি সুরেলা ভাব, মাদকতার মাধুর্য, কল্পলোকের কল্পনা বিশাল থাকবে। ফলে রূপকথার শ্রোতা এক মায়াময় স্বপ্নরাজ্যে যেমন বিচরণ করবে তেমনি তার চার ধারে একটি 'শ্রুতিসুখকর ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করবে। নবমতঃ গল্পর মধ্যে এমন আকর্ষণীয় বস্তু থাকবে যার ফলে 'সমস্ত হৃদয় এক মুহূর্তের মধ্যে বিদ্যুৎবেগে চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হবে। আর দশমতঃ 'শিশুর ক্ষুদ্র প্রাণটিকে একটি স্নিগ্ধ নিঃস্তব্ধ নিস্তরঙ্গ' গল্পস্রোতের মধ্যে 'সুষুপ্তি ভেলায়' ভাসিয়ে ভোরের বেলায় দুটি 'মায়ামন্ত্রে' তাকে জাগ্রত করে তুলবে।

শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ উপন্যাসগুলির 'কথনভঙ্গির শিল্পরূপে' (Story telling Art)র মধ্যে আছে লোককথার রূপকথা উপকথা ব্রতকথার কথনভঙ্গির উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য। তিনি যে উপন্যাসের মধ্যে কাহিনী বর্ণনায় গল্প বলার ভঙ্গিই

গ্রহণ করেছিলেন, 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের সূচনাতেই আছে তার সার্থক পরিচয়। সেখানে প্রথম পর্বের সূচনাতেই লেখক রূপকথার কথকের মতো শুরু করেছেন:

"আমার এই 'ভবঘুরে' জীবনের অপরাহ্ন বেলায় দাঁড়াইয়া ইহারই একটা অধ্যায় বলিতে বসিয়া আজ কত কথাই না মনে পড়িতেছে।" লেখক এখানে 'কতকথার' কথকতা শুরু করেছেন—গল্পের কথকতা রচনা করেছেন সমগ্র উপন্যাসে। আবার তিনি একটু পরেই বলেছেন: "কিন্তু, কি করিয়া 'ভবঘুরে' হইয়া পড়িলাম, সেকথা বলিতে গেলে, প্রভাত-জীবনে এ নেশায় কে মাতাইয়া দিয়াছিল, তাহার একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। তাহার নাম ইন্দ্রনাথ।" এর পরই শুরু হয়েছে ইন্দ্রনাথের গল্প—ফুটবল ম্যাচ, সিদ্ধিভক্ষণ, ইস্কুল পলায়নের কাহিনী। তারপরেই লেখক আবার শুরু করেছেন: 'সে দিনটা আমার খুব মনে পড়ে। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই।' আরম্ভ হয়েছে নতুন গল্পের—মেজদার তত্ত্বাবধানে বালকগণের অধ্যয়ন, বহুরূপী রূপ বাঘের আবির্ভাব, পিসেমশাইএর ক্রোধ ভোজপুরি দরোয়ানের ভীতি এবং পরিশেষে ইন্দ্রনাথের সাহসিকতায় হাস্যপরিহাসে এই গল্পের পরিসমাপ্তি, তারপরে ইন্দ্রনাথের দুঃসাহসিক জীবনের আর একটি নতুন গল্পের সূচনা করেছেন শরৎচন্দ্র। সমগ্র 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসটিতে এভাবে ঘটনার মালা গেঁথে গেঁথে রূপকথার মতো একটা না একটি গল্পের যাদু রচনার চেষ্টা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা রূপকথার ঘটনা-বলীতে যেমন চমৎকারিত্ব থাকে, অভিনবত্ব থাকে কিংবা একটি ঘটনার কৌতূহল ফুরাতে না ফুরাতে আর একটি গল্প বা ঘটনাকে সমভাবে কৌতূহলোদ্দীপক করে তোলার প্রচেষ্টা থাকে শরৎচন্দ্র কেবল শ্রীকান্ত উপন্যাসেই নয়, তার সমগ্র উপন্যাস রচনার মধ্যেই রূপকথার এই গল্প বলার ভঙ্গিটিকে গ্রহণ করেছেন। শরৎচন্দ্রের আর একটি ক্ষুদ্র উপন্যাসএর উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে। রূপকথায় অনেক ক্ষেত্রে সংলাপের মধ্যে দিয়ে গল্প বা কাহিনীর সূচনা হয়ে থাকে। পরে আস্তে আস্তে কথক গল্পের গভীরে যায়। 'শুভদা' উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের একটি অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস। কিন্তু এই উপন্যাসের মধ্যেও লোককথার কথন ভঙ্গির পরিচয় ফুটে উঠেছে। প্রথম অধ্যায় ১ম পরিচ্ছেদেই দেখা যায় 'গঙ্গায় আগ্রীব নিমজ্জিতা কৃষ্ণপ্রিয়া ঠাকুরাণী চোখ কান রুদ্ধ করিয়া তিনটি ডুব দিয়া পিত্তল কলসীতে জল পূর্ণ করিতে করিতে বলিলেন, কপাল যখন পোড়ে তখন এমনি করেই পোড়ে। ঘাটে আরও তিন-চারজন স্ত্রীলোক স্নান করিতেছিল, তাহারা সকলেই অবাক হইয়া ঠাকুরাণীর মুখপানে

চাহিয়া রহিল। পাড়াকুঁদুলি কৃষ্ণঠাকুরুণকে সাহস করিয়া কোন একটা কথা জিজ্ঞাসা করা, কিংবা কোনরূপ প্রতিবাদ করা, যাহার তাহার সাহসে কুলাইত না। বিশেষতঃ যাহারা ঘাটে ছিল তাহারা সকলেই তাঁহা অপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা। তাই বলচি বিন্দু, মানুষের কপাল যখন পোড়ে তখন এমনি করে পোড়ে।

যে ভাগ্যবতীকে উদ্দেশ্য করিয়া এই বলা হইল তাহার নাম বিন্দুবাসিনী। বিন্দু বড়লোকের মেয়ে, বড় লোকের বউ, সম্প্রতি বাপের বাটী আসিয়াছিল।

বিন্দু দেখিল কথাটা তাহাকে বলা হইয়াছে, তাই সাহসে ভর করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কেন পিসিমা ?

এই হারাণ মুখুজ্জের কথাটা মনে পড়ল। ভগবান যেন ওদের মাথায় পা দিয়া ডুবুচ্ছেন।

বিন্দুবাসিনী বুঝল হারাণ মুখুজ্জেদের দুরদৃষ্টের কথা হইতেছে।

এরপরই শুরু হয়েছে হারাণ মুখুজ্জেদের দুরদৃষ্ট (Reversal of Fortune আর Motif) অভিপ্রায়এর কাহিনী। গল্পকার প্রথম পরিচ্ছেদে টুকরো টুকরো সংলাপের মধ্য দিয়ে কাহিনীর প্রতি কৌতূহল সৃষ্টি করে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ থেকে গল্পের সূচনা করেছেন ! 'এ স্থানটির নাম হলুদপুর।......শুনিয়াছি এ গ্রামে পূর্বে অনেক ধনবান ব্যক্তির নিবাস ছিল এবং তাহা সম্ভবত কারণ একে ত ইহা গঙ্গার উপরে স্থাপিত তাহার উপর বহুকালের দুই-চারিটা জীর্ণ ভগ্ন শিবমন্দির, বেতবন ও শ্যাকুল ঝোপের মধ্যে অর্ধলুক্কায়িতভাবে মৌনব্রতধারী যোগী মূর্তির মত বসিয়া আছে দেখিতে পাওয়া যায়। এরপর ব্রতকথার মতই গল্পটি তরতরে ভঙ্গিতে সুরেলা ছন্দে ভাগ্য বিপর্যয়ের কাহিনী রচনা করে এগিয়ে গেছে। শরৎচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'বড়দিদি' থেকেই—এই বাঙলা দেশের প্রচলিত লোক কথার কথন ভঙ্গি বা গল্প বলার রীতিটিকে অনুসরণ করেছেন। রূপকথা-উপকথার এই ঐতিহ্যানুসারী গল্পকথনের ভঙ্গি (Traditional story telling Pattern) শরৎচন্দ্র উপন্যাস লেখার সূচনা থেকে যে অনুসরণ করেছেন 'বড়দিদি' উপন্যাস-এ তার প্রমাণ আছে। গল্প বলার ভঙ্গিতে তিনি আরম্ভ করেছেন : এ পৃথিবীতে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে, তাহারা যেন খড়ের আগুণ। দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেও পারে, আবার খপ্ করিয়া নিবিয়া যাইতেও পারে। তাহাদিগের পিছনে সদা সর্বদা একজন লোক প্রয়োজন—সে যেন আবশ্যক অনুসারে খড় যোগাইয়া দেয়।...

সুরেন্দ্রনাথের প্রকৃতিও কতকটা এইরূপ।...তারপরই শুরু করেছেন আসল

গল্প : "সুরেন্দ্রের পিতা সুদূর পশ্চিমাঞ্চলে ওকালতি করিতেন। এই বাঙালা দেশের সহিত তাঁহার বেশি কিছু সম্বন্ধ ছিল না।...এইভাবেই ধীরে ধীরে পাঠককে গল্পের গভীরে টেনে নিয়ে গিয়েছেন, গল্পরসের মাধুর্যে ও মোহময়তায় আকৃষ্ট করে ফেলেছেন। গল্প বলার এই চাতুর্যটুকু তিনি বাঙলা দেশের রূপকথা-ব্রতকথা-ইতিকথা-পুরাকথার রীতি থেকেই যে গ্রহণ করেছেন তার আরও উদাহরণ উপস্থিত করা যেতে পারে। পূর্ববঙ্গ, বর্তমান বাঙলা দেশের সংগৃহীত একটি কিংবদন্তি উপস্থিত করলে দেখা যাবে শরৎচন্দ্র প্রচলিত ইতিকথা (legend) বা কিংবদন্তির রীতিটিকেও গ্রহণ করেছিলেন গল্প বলার কৌশল আয়ত্তের ক্ষেত্রে।

কমলারানীর দিঘি

'সে অনেক বৎসর পূর্বের কথা। সে সময়ে এদেশের রাজা ছিলেন ধর্মনারায়ণ। ধর্মনারায়ণ ছিলেন প্রজাবৎসল, ন্যায়পরায়ণ রাজা। তাঁহার রাজ্যে কোন অভাব-অনটন ছিল না। রাজা প্রতি বৎসর নিজ হস্তে দরিদ্রদেরকে ধন দান করিতেন।

এই ধর্মনারায়ণের প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর, এক ক্ষুদ্র রাজ্যে রাজার কন্যা কমলা সুন্দরীকে বিবাহ করিলেন। কমলা ছিলেন গুণে লক্ষ্মী। তিনিও রাজার মত প্রজাবৎসল ছিলেন; প্রজাদের দুঃখকষ্টকে নিজের দুঃখ কষ্ট মনে করিতেন। রাজ্যে প্রজাদের মুখে মুখেই রাজা ও রানীর গুণগান। এমনি সুখে স্বচ্ছন্দে তাঁদের দিন অতিবাহিত হইতেছে।

একবার দেবরাজ ইন্দ্র ধর্মরাজ ও কমলাসুন্দরীর প্রজাবৎসলতা পরীক্ষা করার জন্য দেশে পানীয় জলের অভাব করিল। চারিদিকে নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুরের জল শুকাইয়া গেল।" তারপর গল্পটির মধ্যে কিভাবে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করা সত্ত্বেও দীঘিতে এক ফোঁটা জল উঠল না এবং পরিশেষে ধর্মরাজ স্বপ্নাদেশ পেলেন 'সাগর পুকুরে রানী কমলাসুন্দরীকে উৎসর্গ করিলে জল উঠিবে এবং দেশ হইতে জল কষ্ট দূর হইবে।...তারপর কিংবদন্তি আরও অগ্রসর হয়েছে, 'কমলারানী ছয়মাস বয়স্ক শিশুপুত্র রঘু নারায়ণকে রাজার হস্তে তুলিয়া দিয়া লক্ষ্মী কুলায় ধান-দুর্বা ও মঙ্গল প্রদীপ সাজাইয়া পুকুরের তীরে উপস্থিত হইলেন। তীরের পুরনারীগণ জয়দী পোকার দিলে রানী পুকুরের প্রথম সিঁড়িতে নামিলেন। প্রথম সিঁড়িতে নামিবামাত্রই পুকুরের বালু জলে ভিজিয়া উঠিল। এক এক করিয়া রানী পুকুরের তলদেশের মাটি স্পর্শ করিবা মাত্রই জলে পুকুর ভরিয়া উঠিল। কমলারানী হাসি মুখে প্রজাদের সুখের জন্য সে জলে প্রাণ বিসর্জন করিলেন।.........

কমলারানী সাগরপুকুরে উৎসর্গিত হইলেন। দেশ হইতে জলকষ্ট দুর হইল। সেই হইতে 'সাগর দীঘির' নাম কমলারানীর দীঘি' হইল।" [লোকসাহিত্য সংকলন, দশম খণ্ড, বাঙলা একাডেমী, বর্ধমান হাউস, ঢাকা, পৃঃ ৫৯-৬০]

শরৎচন্দ্রও তার বহু উপন্যাসে ইতিকথা কিংবদন্তীর আশ্রয় নিয়েছেন গল্পের মধ্যে একটি জমাট ভাব আনয়নের জন্যে। কিংবদন্তীর জনশ্রুতিমূলক কাহিনীর একটি মোহমুগ্ধতা বা আকর্ষণীয় মাদকতা আছে যা পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধের মত কাহিনীর মধ্যে আকর্ষণ করে নিয়ে যায়। শরৎচন্দ্রও বহু উপন্যাসের প্রারম্ভে এবং ভিতর কার অনেক পরিচ্ছদের সূচনায় গল্পকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে কিংবদন্তীমূলক কাহিনীর আশ্রয় নিয়েছেন। যেমন 'দেনাপাওনা' উপন্যাসের সূচনা : 'চণ্ডীগড়ে চণ্ডী বহু প্রাচীন দেবতা। কিংবদন্তী আছে রাজা বীরবাহুর কোন এক পূর্বপুরুষ কি একটা যুদ্ধ জয় করিয়া বারুই নদীর উপকূলে এই মন্দির স্থাপিত করেন, এবং পরবর্তীকালে কেবল ইহাকেই আশ্রয় করিয়া এই চণ্ডীগড় গ্রাম খানি ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছিল। হয়ত একদিন যথার্থই সমস্ত চণ্ডীগড় গ্রাম দেবতার সম্পত্তি ছিল ; কিন্তু আজ মন্দির সংলগ্ন মাত্র কয়েক বিঘা ভূমি ভিন্ন সমস্তই মানুষে ছিনাইয়া লইয়াছে। গ্রামখানি এখন বীজগাঁর জমিদারের ভুক্ত'। তারপরই আসল গল্প শুরু হয়েছে এইভাবে : 'সেই জীবানন্দ চৌধুরী সম্প্রতি রাজ্য পরিদর্শনচ্ছলে চণ্ডীগড়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন।.......'সুতরাং সূচনায় কিংবদন্তিটিকে শরৎচন্দ্র উপন্যাসের প্রারম্ভ রচনায় উপযুক্ত ভাবেই ব্যবহার করেছেন।

শরৎচন্দ্র ছিলেন মূলতঃ পল্লীর গ্রাম্যমানুষ। তাঁর জন্ম গ্রামে, শিক্ষা গ্রামে, পরবর্তী জীবনের অনেকটাই কেটেছে গ্রামীণ পরিবেশের মধ্যে। তাই তার সাহিত্যের তিনভাগ অংশই বাংলাদেশের গ্রাম জীবন ও পরিবেশ তার নিজস্ব স্থানটি দখল করে নিয়েছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য তাই এককথায় গ্রামীণ জীবন ও লোকায়ত মানুষের জীবনবেদ। তার কারণ হিসাবে বলা চলে একটি মানুষের জন্ম-কর্ম-ধর্মের প্রেক্ষাপটই তার নিজস্ব মানসিকতাটিকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। শরৎচন্দ্রের জন্ম হুগলী জেলায় দেবানন্দপুর গ্রামে। ইতিহাস প্রসিদ্ধ সপ্তগ্রামের সাতটি গ্রাম বাসুদেবপুর, বংশবাটী, খামার পাড়া, কৃষ্ণপুর, শিবপুর, ত্রিশবিঘা, এবং দেবানন্দপুর। ভারতচন্দ্র এই গ্রামটির প্রসঙ্গে বলেছেন :

দেবের আনন্দধাম, দেবানন্দপুর গ্রাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুন্সী

ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশ যার যশ গায়
হয়ে মোর কৃপায় দায় পড়াইল পারসী।

প্রচলিত কিংবদন্তি আছে যে উক্ত সপ্তগ্রামে সপ্তঋষি তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করে ছিলেন বলে এর নাম হয় সপ্তগ্রাম। শরৎচন্দ্রদের পিতৃভূমি বা আদি নিবাস ছিল ভাগীরথীর পূর্ব পাড়ে কাঁচড়াপাড়ার অন্তর্গত মামুদপুর গ্রামে। এই দেবানন্দপুর ও মামুদপুরের সেদিনের হিসাবে দূরত্ব খুবই কম, মাঝখানে শুধু ভাগীরথী। দেবানন্দ সুপ্রচীন বন্দর এবং ত্রিবেণী সঙ্গম তীর্থের অন্তর্গত সপ্তগ্রামের মধ্যে অবস্থিত। অপর পক্ষে মামুদপুর ভাটপাড়ার অন্তর্গত বৈদিক ব্রাহ্মণ, সংস্কৃতির ঐতিহ্য প্রতিপালিত। নিকটবর্তী হালিশহরের শক্তি-তান্ত্রিক ভাবধারা এবং খড়দহের বৈষ্ণব ভাবধারার এক মিশ্রিত সাংস্কৃতিক চেতনা শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলালের রক্তে সঞ্চারিত হয়েছিল এবং অপরদিকে শাক্ত আবহাওয়া পরিবর্ধিত মাতা ভুবনমোহিণী। এ দুয়ের সংমিশ্রণে শরৎচন্দ্র এক উচ্চতর সংস্কৃতির অধিকারী হয়েছিলেন রক্তের সূত্রে। তাই পরবর্তী জীবনে গ্রাম্য সংস্কৃতির পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে এই উচ্চতর সংস্কৃতির অধিকারী শরৎচন্দ্র নিজেকে আরো বলিষ্ট ও বর্ধিত করতে পেরেছিলেন। গ্রামীণ ও লোকায়ত সংস্কৃতির প্রাণরসটিকে যথার্থ ভাবে আত্মস্থ করতে পেরেছিলেন।

শরৎচন্দ্র নিজেই বহু জায়গায় আত্মকথনের ভঙ্গিতে নিজের ছেলেবেলার কথা বলতে গিয়ে বার বার পল্লীগ্রামের কথাই বলেছেন: 'ছেলেবেলার কথা মনে আছে, পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে, ডোঙ্গাঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি. তার আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে উঠে তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হই।' এ পাড়াগাঁ নিশ্চয়ই দেবানন্দপুর এবং তৎসন্নিহিত গ্রামগুলি এবং পরবর্তী জীবনের পাণিত্রাস সামতাবেড়ের হাওড়া জেলার গ্রামসমূহ। শরৎচন্দ্র তাঁর ৬১ বছরেরও অধিক আয়ুষ্কালের মধ্যে ২২।২৩ বছরেরও অধিককাল দেবানন্দপুর ও সামতাবেড়েতে কাটিয়েছিলেন। তাছাড়া ভাগলপুর বিহারের বর্ধিষ্ণু অঞ্চল হলেও সেখানকার গঙ্গার উদাত্ত পরিবেশ ও সেখানকার বাঙালী সমাজ একটি বাঙলাদেশের গ্রমীণ আবহাওয়া তৈরী করেছিলো। শ্রীকান্ত উপন্যাসের তৃতীয় পর্বের প্রথম পরিচ্ছেদের একটি অংশে শ্রীকান্ত যে আত্মচিন্তা করছে তার মধ্যে দিয়ে শরৎচন্দ্রের গ্রামপ্রীতি ও লোকায়ত সংস্কৃতি প্রীতির একটি পূর্ণ পরিচয় উপস্থিত হয়েছে: 'রেল ষ্টেশনের উদ্দেশে আমরা যখন যাত্রা করিলাম তখন সূর্যদেব

বহুক্ষণ অস্ত গিয়াছেন। আঁকাবাঁকা গ্রাম্য পথের দুই ধারে যদৃচ্ছা-- বর্ধিত বঁইচি, শিয়াকুল এবং বেতবন, সঙ্কীর্ণ পথটিকে সঙ্কীর্ণতর করিয়াছে এবং মাথার উপর আম-কাঁঠালের ঘন সারি শাখা মিলাইয়া স্থানে স্থানে সন্ধ্যার আঁধার যেন দুর্ভেদ্য করিয়া তুলিয়াছে।' লেখক তখন গ্রামবাংলার সহজ শান্ত আলো আঁধারের পরিবেশে বাংলাদেশের গ্রামীণ জীবন প্রবাহ ও হাজার হাজার বছরের পিতৃ-পিতামহদের ঐতিহ্যানুসারিত জীবনযাত্রার এক চিত্র অঙ্কণ করেছেন : আমি তখন দু'চক্ষু মেলিয়া সেই নিবিড় অন্ধকারের ভিতর দিয়া কত কি যেন দেখিতে লাগিলাম। মনে হইল, এই পথের উপর দিয়াই পিতামহ একদিন পিতামহীকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছিলেন, সেদিন এই পথই বর যাত্রীদের কোলাহল ও পায়ে-পায়ে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। আবার একদিন যখন তাঁহারা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, তখন এই পথ ধরিয়াই প্রতিবেশীরা তাঁহাদের মৃতদেহ নদীতে বহিয়া লইয়া গিয়াছিল। এই পথের উপর দিয়াই মা আমার একদিন বধূবেশে গৃহপ্রবেশ করিয়াছিলেন, এবং আবার একদিন যখন তাঁহার এই জীবনের সমাপ্তি ঘটিল, তখন ধুলা-বালির এই অপ্রশস্ত পথের উপর দিয়াই আমরা তাঁহাকে মা-গঙ্গায় বিসর্জন দিয়া ফিরিয়াছিলাম।' এই হচ্ছে লৌকিক ঐতিহ্যের (Folk Tradition) অনুস্মৃতি। লেখক আত্মচিন্তার মাধ্যমে আমাদের লৌকিক সংস্কৃতির ও জীবন চর্চার সুমহান ঐতিহ্যকে উপলব্ধি করেছেন। আবার বর্তমানের সেই ঐতিহ্যমণ্ডিত লোকায়ত জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির অধঃপতনের কথাও চিন্তা করেছেন : 'তখনও এই পথ এমন নির্জন এমন দুর্গম হইয়া যায় নাই, তখনও বোধ করি ইহার বাতাসে বাতাসে এত ম্যালেরিয়া, জলাশয়ে জলাশয়ে এত পঙ্ক, এত বিষ জমা হইয়া উঠে নাই। তখনও দেশে অন্ন ছিল, বস্ত্র ছিল, ধর্ম ছিল—তখনও বোধ হয় দেশের নিরানন্দ এমন ভয়ঙ্কর শূন্যতায় আকাশ ছাপাইয়া ভগবানের দ্বার পর্যন্ত ঠেলিয়া উঠে নাই।'

শরৎচন্দ্রের এই গ্রামীন ঐতিহ্য ও লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা কত প্রখর এরই পরবর্তী অংশে প্রকাশিত হয়েছে : দুই চক্ষু জলে ভাসিয়া গেল, গাড়ির চাকা হইতে কতকটা ধুলা লইয়া তাড়াতাড়ি মাথায় মুখে মাখিয়া ফেলিয়া মনে মনে বলিতে লাগিলাম, হে আমার পিতৃ-পিতামহের সুখে-দুঃখে বিপদে-সম্পদে, হাসি-কান্নায় ভরা ধুলাবালির পথ, তোমাকে বার বার নমস্কার করি। অন্ধকার বনের মধ্যে চাহিয়া বলিলাম, মা জন্মভূমি! তোমার বহু কোটি অকৃতী সন্তানের মত আমিও কখনো তোমাকে ভালবাসি নাই—আর

কোনদিন তোমার সেবায় তোমার কাজে, তোমারই মধ্যে ফিরিয়া আসিব কি না জানি না, কিন্তু আজ এই নির্বাসনের পথে আঁধারের মধ্যে তোমার যে দুঃখের মূর্তি আমার চোখের জলের ভিতর দিয়া অস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিল, সে এ জীবনে কখনো ভুলিব না।'

আসলে কোন লেখকই তাঁর দেশ ও দেশজ সংস্কারের উর্দ্ধচারী হতে পারেন না। যে পরিবেশের মধ্যে লেখক তাঁর জীবনরসকে পরিপুষ্ট করে তোলেন সেই দেশ ও সমাজের মানুষ, তার আচার আচরণ, ভাললাগা মন্দ লাগা, সংস্কার কুসংস্কার, বিশ্বাস-অবিশ্বাস কোনকিছুকে অতিক্রম করতে ত' পারে না বরং এসবের মধ্য থেকেই তাঁর সাহিত্য ও শিল্পকর্মের প্রাণরসকে পরিপুষ্ট করে তোলেন। কয়েকটি উদাহরণ দিলে শরৎ উপন্যাসে এই সব লৌকিক উপাদান কিভাবে উপস্থিত হয়েছে এবং উপন্যাসের আখ্যান রচনায় ও চরিত্র নির্মাণে এবং পরিবেশ সৃষ্টিতে কিরূপ সহায়ক হয়েছে তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বেই আমরা দেখেছি শ্রীকান্তকে নৌকায় বসিয়ে ইন্দ্রনাথ যখন জেলেপাড়ায় মাছ বিক্রি করতে গেল তখন সে বারবার শ্রীকান্তকে সাবধান করে গেছে: "উপরে, মাথার উপর আবার সেই আলো-আঁধারের লুকোচুরি খেলা এবং পশ্চাতে বহু দূরাগত সেই অবিশ্রান্ত তর্জন। এটা কোন জায়গা, তাই ভাবিতেছি, দেখি ইন্দ্র ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। কহিল, শ্রীকান্ত, তোকে একটা কথা বলতে ফিরে এলুম। কেউ যদি মাছ চাইতে আসে, খবরদার দিসনে—খবরদার বলে দিচ্ছি। ঠিক আমার মত হয়েও যদি কেউ আসে, তবুও দিবিনে—বলবি, মুখে তোর ছাই দেব—ইচ্ছে হয় নিজে তুলে নিয়ে যা। খবরদার—হাতে করে দিতে যাসনে যেন—ঠিক আমি হলেও না,—খবরদার।

"কেন ভাই? ফিরে এসে বলব—খবরদার কিন্তু—, বলিতে বলিতে সে যেমন ছুটিয়া আসিয়াছিল, তেমনি ছুটিয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল।" ভৌতিক বিশ্বাস (Ghost belief) বাংলা দেশের প্রচলিত একটি লৌকিক বিশ্বাস। ইন্দ্রনাথের সাবধান বাণীর মধ্যে সেই প্রচলিত বিশ্বাসের সমস্ত চিহ্ন বর্তমান। অশরীরীকে কোন বস্তু নিজে হাতে দিতে নাই, প্রিয়জনের রূপ ধরে এলেও যে নিজে হাতে দিতে নাই, নিজে তুলে নাও বলতে হয়—এগুলি শরৎচন্দ্র ভালভাবেই জানতেন, ইন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতো, তাই সেই লৌকিক ভৌতিক বিশ্বাসের একটি সার্থক রেখাচিত্র তিনি অঙ্কন করতে পেরেছেন।

ইন্দ্রনাথের সাবধানবাণীতে শ্রীকান্তের যে প্রতিক্রিয়া তার মধ্যেও ভৌতিক বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটেছে। 'এইবার আমার পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্যন্ত কাঁটা দিয়া খাড়া হইয়া উঠিল। বোধ হইতে লাগিল, যেন দেহের প্রতি শিরা উপশিরা দিয়া বরফজল বহিয়া চলিতে লাগিল।...মনে হইল যেন মানুষের কণ্ঠস্বর শুনিলাম। পৈতাটা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে শতপাকে বেষ্টন করিয়া মুখ নীচু করিয়া উৎকর্ণ হইয়া রহিলাম। কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইলে বেশ বুঝিলাম, দুই-তিনজন লোক কথাবার্তা বলিতে বলিতে এই দিকেই আসিতেছে। একজন ইন্দ্র এবং আর দুইজন হিন্দুস্থানী।' শ্রীকান্তের মধ্যে ভৌতিক সংস্কারটি আছে। তাই সে দেখে নিল যে তাদের ছায়া পড়েছে কিনা। শরৎচন্দ্রের ভাষায়: দেখিয়া লইলাম, চন্দ্রালোকে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে কি না। কারণ এই অবিসংবাদী সত্যটা ছেলেবেলা হইতেই জানিতাম যে, ইহাদের ছায়া থাকে না।' লৌকিক সংস্কারও যেমন আছে তেমনি তার থেকে এর মুক্ত হওয়ার ও প্রতিকারের উপায়ও লৌকিক সংস্কার থেকেই উদ্ভূত হয়। পরবর্তী অংশে শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের কথাবার্তার মধ্যে তারই স্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। যথা: জিজ্ঞাসা করিলাম, আচ্ছা, ইন্দ্র, তুমি কখন ঐ সব দেখেছো?

—কি সব?

—ঐ যারা মাছ চাইতে আসে?

—না ভাই দেখিনি—লোকে বলে তাই শুনেছি।

—আচ্ছা, তুমি একলা আসতে পারো।

ইন্দ্র হাসিল। কহিল, আমি ত একলাই আসি।

—ভয় করে না?

—না। রামনাম করি। কিছুতে তারা আসতে পারেনা; একটু থামিয়া কহিল, রামনাম কি সোজা রে? তুই যদি রামনাম করতে করতে সাপের মুখ দিয়ে চলে যাস, তবু তোর কিছু হবে না। সব দেখবি ভয়ে ভয়ে পথ ছেড়ে দিয়ে পালাবে। কিন্তু ভয় করলে হবে না। তাহলেই তারা টের পাবে, এ শুধু চালাকি করচে—তারা সব অন্তর্যামী কি না।'

শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের এই ভৌতিক বিশ্বাস এবং এ সম্পর্কে তাদের ধ্যানধারণা তাদের আজন্ম সংস্কার থেকেই উদ্ভব এবং জীবন সম্পৃক্ত।

এই সমস্ত লৌকিক বিশ্বাসের মধ্য দিয়েই যেমন বাংলাদেশের লোকায়ত মানুষ প্রতিপালিত ও বর্ধিত হয় অপর দিকে তারা এক মহৎ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠে। ইন্দ্রনাথ যখন বালকের মৃতদেহটি প্রসঙ্গে বলল যে মড়ার আবার জাত কি?

তখন লেখকের মনে হয়েছে: ওই বয়সে কাহারো কাছে কিছুমাত্র শিক্ষা না করিয়া বরঞ্চ প্রচলিত শিক্ষা সংস্কারকে অতিক্রম করিয়া এই সকল তত্ত্বও সে পাইত কোথায়? শরৎচন্দ্র পরেই সেই উত্তর নিজের মনের মধ্যেই আবিষ্কার করেছেন: 'বাস্তবিক, অকপট সহজবুদ্ধিই ত সংসারে পরম এবং চরম বুদ্ধি। ইহার উপরে ত কেহই নাই।' লোক বিশ্বাস—যেমন মানুষ সহজবুদ্ধির পরম সত্যে পৌঁছে দেয় আবার অপর দিকে সংস্কারগুলি যখন কুসংস্কারের ডোবায় পঙ্ক ও ঘোলা জলের সৃষ্টি করে তখন তা যে কি মারাত্মক হতে পারে তা শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের 'সমাজ' নামক বস্তুটির মধ্য দিয়ে দেখিয়েছেন। বেণী ঘোষাল এবং গোলক চাটুয্যের দল সহজবুদ্ধির পথে বাধা সৃষ্টি করে 'লোক মানস' (Folk mind)-কেযে কত বিভ্রান্তির পথে নিয়ে যায় তার বহু দৃষ্টান্ত তিনি উপস্থিত করেছেন। ইন্দ্রনাথের 'সহজবুদ্ধির' প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি মিথ্যার অস্তিত্বরূপে কুসংস্কার যে মানুষকে কত নীচে নামাতে পারে তার একটি ছোট গল্প উপস্থিত করেছেন, যথা: এই ঘটনার দশ-বারো বৎসর পরে, হঠাৎ একদিন অপরাহ্ণকালে সংবাদ পাওয়া গেল যে, একটি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী ও-পাড়ায় সকাল হইতে মরিয়া পড়িয়া আছে—কোনমতেই তাহার সৎকারের লোক জুটে নাই। না জুটিবার হেতু এই যে তিনি কাশী হইতে ফিরিবার পথে রোগগ্রস্ত হইয়া এই সহরেই রেলগাড়ী হইতে নামিয়া পড়েন এবং সামান্য পরিচয় সূত্রে যাহার বাটীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তিনি 'বিলাত ফেরৎ' এবং সে সময়ে 'এক ঘরে'। ইহাই বৃদ্ধার অপরাধ যে, তাহাকে নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় এই 'একঘরে'র বাটীতে মরিতে হইয়াছে।"

তুক তাক, সাপের মন্তর, বিষ-পাথর ইত্যাদি বিষয়গুলি মূলতঃ লোকবিশ্বাসের অন্তর্গত যাদুবিদ্যা বা Magic-এর উপাদান। "In short, Magic is a spurious system of natural law as well as a fallacious guide of conduct; it is a false science as well as abortive art. [Sir James Frazer, The Golden Bough, P. 15, abridged Macmillan Edition]. আদিম যুগে মানুষ যখন সম্পূর্ণভাবে প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভরশীল ছিল। ঝড়-ঝঞ্ঝা, বিদ্যুৎ-বজ্রপাত, বন্যা-প্লাবন, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি, প্রচণ্ড দাহ-প্রবল শৈত্য, হিংস্র পশুর অনাবৃত আক্রমণ—এ সমস্ত কিছুর মূলে মানুষ যখন অসহায় ছিল সে যুগ থেকেই মানুষ এইসব তুকতাক, মন্ত্র-তন্ত্র, জড়িবুটি—ইত্যাদি লোকায়ত সংস্কারগুলি আত্মস্থ করে নিতে বাধ্য হয়েছে—কারণ এ-ছাড়া সেদিন কোন বাঁচার আর উপায় ছিল না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সেই আদিম লৌকিক

বিশ্বাসগুলি আজও মানুষের প্রবৃত্তির মধ্যে বাসা বেঁধে আছে, মনে প্রাণে আজকের লোকায়ত মানুষই নয়, সমস্ত শ্রেণীর নরনারী এগুলি বিশ্বাস করে—জন্ম জন্ম ধরে এই সব সংস্কার তাদের অন্তরে গাঁটছড়া হয়ে বাঁধা পড়ে আছে। শ্রীকান্ত উপন্যাসের ১ম পর্বে যেখানে ইন্দ্র শাহজীর সাপের ঝাঁপি খুলে সাপের ছোবলের মুখে পড়ে অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছিলো। তখন অন্নদা দিদি বলেছিলো: এ সব ভয়ানক জানোয়ার নিয়ে কি খেলা করতে আছে ভাই? ভাগ্যে তোমার হাতের ডালাটায় ছোবল মেরেছিল, না হলে আজ কি কাণ্ড হত বলত?

আমি কি তেমন বোকা দিদি! বলিয়া ইন্দ্র সপ্রতিভ হাসিমুখে ফস্ করিয়া তাহার কোঁচার কাপড়টা ফেলিয়া কোমরে সুতা—বাঁধা কি একটা শুক্‌না শিকড় দেখাইয়া বলিল, এই ছ্যাখো দিদি, আট ঘাট বেঁধে রেখেছি কিনা! এ না থাকলে কি আর আজ আমাকে না ছুবলে ছেড়ে দিত?…আর যদিই বা কামড়াত—তাতেই বা কি! সাহজীকে টেনে তুলে তক্ষুণি বিষ-পাথরটা ধরিয়ে দিতুম। আচ্ছা দিদি, ঐ বিষ-পাথরটায় কতক্ষণে বিষ টেনে নিতে পারে? আধ ঘণ্টা? এক ঘণ্টা? না অতক্ষণ লাগে না, না দিদি?

দিদি কিন্তু তেমন নীরবে চাহিয়া রহিলেন।…ইন্দ্র লক্ষ্য করিল না, কিন্তু আমি তাহার দিদির মুখের পানে চাহিয়া বেশ অনুভব করিলাম যে তাঁর মুখখানি কিসের অপরিসীম ব্যথায় ও লজ্জায় যেন একেবারে কালিবর্ণ হইয়া গেল!"

কারণ অন্নদা দিদি জানতেন এই বিষপাথর, মন্ত্র, জড়িবুটি আসলে লোকবিশ্বাস মাত্র—এগুলোর পিছনে সত্যকার কোন তত্ত্ব বা তথ্য নাই। অনেকটাই ফাঁকিবাজি। তাই তিনি বললেন: "হাঁ রে ইন্দ্র, তুই কি তোর দিদির বাড়ীতে শুধু সাপের মন্তর আর বিষপাথরের জন্যেই আসিস রে?

ইন্দ্র অসঙ্কোচে বলিল, তবে না ত কি!…কেবলই আমাকে ভোগা দিচ্ছে—এ তিথি নয়, ও তিথি নয়, সে তিথি নয়, সেই যে কবে শুধু হাত চালার মন্তরটুকু দিয়েছিল, আর দিতেই চায় না।"

অন্নদা দিদি কিন্তু জানে এসব কিছু বিশ্বাসের পিছনে গ্রাম্য মানুষের যুগ-যুগান্তরের মানসিকতা কাজ করছে। কিন্তু ইন্দ্রনাথ গ্রামের ছেলে, দুরন্ত, ডানপিটে—এ সমস্ত কিছু বিশ্বাস করাই তার ধর্ম। কারণ যুগ যুগান্তর ধরে এসব জিনিস তারা বিশ্বাস করতে শিখে এসেছে। এই বিষপাথর, হাত চালার পর 'কড়ি চালা'র কথা সে উপস্থিত করেছে: "আমার দিকে চাহিয়া কহিল, কড়ি-

চালা কখনো দেখেছিস শ্রীকান্ত? দুটি কড়ি মন্তর পড়ে ছেড়ে দিলে তাঁরা উড়ে গিয়ে যেখানে সাপ আছে, তার কপালে গিয়ে কামড়ে ধরে, সাপটাকে দশ দিনের পথ থেকে টেনে এনে হাজির করে দেয়। এমনি মন্তরের জোর! আচ্ছা দিদি, ঘর-বন্ধন, দেহ-বন্ধন ধূলো পড়া এসব জান ত?"

শরৎচন্দ্র গ্রামীণ মানুষ ও গ্রামজীবনের রূপকার। তাই তার উপন্যাসের প্রতিটি ছত্রেই আছে এ ধরনের নানা লৌকিক উপাদানের সম্ভার। কারণ হিসাবে বলা চলে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের পনেরো আনা অংশই জুড়ে গ্রামময় বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের গ্রাম্য মানুষের নানা কাহিনী, গল্পকথা আর অসংখ্য গ্রামীণ নরনারীর চরিত্রের মিছিল। কেবল শ্রীকান্ত উপন্যাসেই নয়, পল্লীসমাজ, বিরাজবৌ, নিষ্কৃতি, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, দেনা-পাওনা, দত্তা, পণ্ডিত মশাই, দেবদাস, বামুনের মেয়ে, অরক্ষণীয়া, একাদশী বৈরাগী, শুভদা-য় তাদের জীবনকাহিনীর নানা বিষয়কে চিত্রিত করা হয়েছে। সুতরাং সেখানে ইন্দ্রনাথের মতই যে লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কারগুলি যুগ যুগ ধরে গ্রাম্য মানুষের দল লালন-পালন করে আসছে তার বিচিত্র পরিচয় শরৎ-উপন্যাসে উপস্থিত হয়েছে।

'লোকসংস্কার' শব্দটিকে ইংরাজীতে কখনও Folk-belief কখনও Superstition,[১] কখনও Magic অর্থে বোঝান হয়েছে। লোকসংস্কার প্রধানতঃ নিরক্ষর লোকসমাজে (non-literate Society) ও অল্পাধিক পরিমাণে সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে (civilized and literate) প্রচলিত সমস্ত বাহ্যিক কর্মকাণ্ড, যথা অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আচরণাদি এবং অপরদিকে মানসিক ক্রিয়াদি যথা: ধারণা, বিশ্বাস প্রবণতা ও সহজাত প্রবৃত্তি সমূহের মধ্যে এমন সব উপাদানকে বোঝায় যার মধ্যে যুক্তি (Reason) অপেক্ষা অ-যৌক্তিকতার (Unreason) প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয়।[২] লোকসংস্কারের ক্ষেত্রে দেখা যায় বহু সংস্কারের বহু বিষয় আদিম কাল থেকে একাল এসে পৌঁচেছে আবার প্রাচীনকালের অনেক সংস্কার হারিয়ে গেছে। তবে একটা জাতির বা সমাজের সঙ্গে এই সব লোকসংস্কারগুলি যুক্ত হয়ে গেলে তারা সহজে দূরীভূত হয়

না, ববং জন্ম প্রজন্মের মধ্য দিয়ে কাল-ধর্ম-জাত নির্বিশেষে প্রবাহিত হয়ে চলে। আধুনিকতার মাঝখানেও কোন কোন ক্ষেত্রে তা স্ফুলিঙ্গের মত দেখা দেয়। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসিকদের ক্ষেত্রে এই লোকসংস্কারের মধ্যে প্রতিপালিত ও বর্ধিত চরিত্রগুলি যে সংস্কার থেকে কোন মতে মুক্ত হতে পারে না তার বহু উদাহরণ তাঁরা উপস্থিত করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের দেবীচৌধুরানী উপন্যাসে প্রফুল্লকে ভবানী পাঠক যতই অনুশীলন তত্ত্বে দীক্ষা দিক না কেন, নিরামিষ আহারে অভ্যস্ত করুক না কেন, আসলে সে নারী এয়োস্ত্রী। বাঙালী ঘরের বধূর যে লোকায়ত সংস্কার তার থেকে সে কোন মতে বিমুক্ত হতে পারে না। তাই সজাগ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র প্রফুল্লকে দেবী চৌধুরাণীতে রূপান্তরিত না করে একান্তভাবে বাঙলা-দেশের চিরন্তন বধূরূপেই চিত্রিত করেছেন। এয়োতির চিহ্নরূপে একাদশীর দিন অন্তত মাছ তাকে খেতেই হবে। এ সংস্কার তার জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার। 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে এরই চিহ্ন: "তবে প্রফুল্ল এক বিষয়ে ভবানী ঠাকুরের অবাধ্য হইল। একাদশীর দিন সে জোর করিয়া মাছ খাইত—গোবরার মা হাট হইতে মাছ না আনিলে প্রফুল্ল খানা, ডোবা, বিল, খালে আপনি ছাঁকা দিয়া মাছ ধরিত; সুতরাং গোবরার মা হাট হইতে একাদশীতে মাছ আনিতে আর আপত্তি করিত না।" যুগ যুগান্তরের সংস্কারের মধ্যেও মানবের মানবত্ব যে কোথায় নিহিত আছে শিল্পী বঙ্কিম তা জানতেন। আর জানতেন বলেই একাদশীর দিন মাছ না খাওয়া যে পতিব্রতা স্ত্রীর কাছে স্বামীর অকল্যাণ স্বরূপ এই চরম মানবিক সত্যটি সংস্কারের মধ্য দিয়ে কিভাবে সার্থকরূপে চরিত্র মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র তার নিদর্শন দেখিয়েছেন উপরোক্ত ঘটনাটির মধ্য দিয়ে।

শরৎচন্দ্রের অন্নদাদিদি চরিত্রটি লোক-সংস্কারের মাঝখানে মানবিক সত্য প্রতিষ্ঠার আর একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত। শাহজী মুসলমান হওয়ার পরও অন্নদাদিদি শাহজীকে পরিত্যাগ করেনি তার কারণ হিন্দু রমণীর আজন্ম সংস্কার যে পতিই তার ধর্ম, পতিই তার কর্ম এবং ইহ জীবন ও পর জীবনের সমস্ত কিছুরই মূলাধার। শাহজীর মৃত্যুর পরই ইন্দ্রনাথ জানতে পারলো যে শাহজী তাঁর স্বামী। স্বামীর মৃত্যুর পর হিন্দু রমণী যে আচরণগুলি পালন করে সেগুলি তার জন্মগত সংস্কার বশতই করে, সেখানে কোন শাস্ত্রীয় নির্দেশ নাই। শরৎচন্দ্র স্বামীর মৃত্যুর পর হিন্দু রমণীর সংস্কার পালনের একটি নিখুঁত বর্ণনা উপস্থিত করেছেন:

"দিদি কথা কহিলেন না। মূর্চ্ছিতের মত কিছুক্ষণ তেমনিভাবে পড়িয়া

থাকিয়া শেষে উঠিয়া বসিলেন। তারপরে উঠিয়া আসিয়া তিন জনে গঙ্গাস্নান করিলাম। দিদি হাতের নোয়া জলে ফেলিয়া দিলেন, মাটি দিয়া সিঁদুর তুলিয়া সদ্য বিধবার সাজে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কুটিরে ফিরিয়া আসিলেন।

কেবলমাত্র লোকসংস্কারের আচার পালনই নয়, সংস্কার কিভাবে নরনারী চরিত্রকে তৈরী করে শরৎচন্দ্রও চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই লৌকিক মাধ্যমটিকে সযত্নে গ্রহণ করেছেন। সংস্কার যে মানুষের জীবনকে, মানুষের ধ্যান ধারণাকে তৈরী করে তার সার্থক দৃষ্টান্ত এই অন্নদা দিদির চরিত্র। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্নদাদিদির সংলাপের একটি অংশ তুলে ধরলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

"এতদিন পরে আজ তিনি প্রথম বলিলেন যে, শাহজী তাঁর স্বামী ছিলেন। ইন্দ্র কিন্তু কথাটা ঠিকমত মনের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারিল না। সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, কিন্তু তুমি যে হিন্দুর মেয়ে দিদি!

দিদি বলিলেন, হাঁ বামুনের মেয়ে। তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ইন্দ্র ক্ষণকাল অবাক হইয়া থাকিয়া কহিল, জাত দিলেন কেন?

দিদি বলিলেন, সে কথা ঠিক জানিনে ভাই! কিন্তু তিনি যখন দিলেন,—তখন আমারও সেই সঙ্গে জাত গেল। স্ত্রী সহধর্মিণী বই ত নয়। নইলে আমি নিজে হতে জাতও দিইনি—কোন দিন কোন অনাচারও করিনি!"

চিরকালের লোকসংস্কার বশতঃ অন্নদা দিদি জানে স্বামীর ধর্মই হচ্ছে স্ত্রীর ধর্ম, তাই স্বামীর ধর্মান্তরিকরণের সঙ্গে সঙ্গে সেও মুসলমান হয়েছে; আবার তার সঙ্গে আজন্ম সংস্কার বশতঃ হিন্দু নারীর বিশ্বাস ও আচার আচরণগুলিও সযত্নে লালন-পালন করে, তার কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হতে দেয় না। 'দেনা পাওনা' উপন্যাসের ষোড়শী চরিত্রটি তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বহু বাধানিষেধ ইত্যাদির সংস্কারের বেড়াজাল দিয়ে তৈরী হয়ে ছিলো চণ্ডীগড়ের ভৈরবীর পদটি। এককড়ি জমিদার জীবানন্দকে ভৈরবীর যে ইতিহাসটি দিয়েছিলো তা নিম্নরূপ:

ভৈরবী কাহারও নাম নয়, গড়চণ্ডীর প্রধান সেবিকাদের ইহা একটা সাধারণ উপাধি। যেমন বর্তমান ভৈরবীর নাম ষোড়শী এবং পূর্বে যিনি ছিলেন তাঁহার নাম ছিল মাতঙ্গিনী ভৈরবী। মাতার আদেশে তাঁহার সেবায়েত কখনও পুরুষ হইতে পারে না, মেয়েরাই এপদ চিরদিন অধিকার করিয়া আসিতেছে। আন্দাজ বৎসর পনর ষোল হইবে হঠাৎ একদিন জানা যায় মাতঙ্গিনী ভৈরবীর

স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। কথাটা অনেক কষ্টে যখন সত্য বলিয়াই প্রমাণিত হয়, তখন বাধ্য হইয়া মাতঙ্গিনীকে পরিত্যাগ করিয়া কাশী চলিয়া যাইতে হয়।

জীবানন্দ এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, বিধবা হলে বুঝি ভৈরবীগিরি খারিজ হয়ে যায়?

এককড়ি কহিল, হ্যাঁ হুজুর।

তাই বুঝি তিনি স্বামীটিকে অজ্ঞাতবাসে পাঠিয়েছিলেন।

এককড়ি বলিল, সে ছাড়া আর ত কোন উপায় নেই হুজুর! মায়ের আদেশে বিয়ের তেরাত্রি পরে স্বামীর ভৈরবী স্পর্শ করিবারও জো নেই। তাই দুর দেশ থেকে দুঃখী গরীবের একটা ছেলে ধরে এনে বিয়ে দিয়ে পরের দিনই টাকাকড়ি দিয়ে সেই যে বিদায় করা হয়, আর কখনও কেউ তার ছায়া পর্যন্ত দেখতে পায় না। এই-ই নিয়ম, এই-ই চিরকাল ধরে হয়ে আসছে।" এই যে নিয়ম, যা চিরকাল ধরে চলে আসছে সেটিই সংস্কার। এই সংস্কারের পিছনে যেমন কিছু আচরণ ও বিশ্বাস (behaviour and belief) থাকে, তেমনি থাকে কিছু বাধা বা নিষেধ (Tabu)। এই Tabu হচ্ছে লৌকিক সংস্কার। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে : The concept and observence, however, are common among most primitive People. Tabu sets apart a person, thing, place, name (Something even the distinctive Syllable of a name) or an action the untouchable, unmentionable, unsayable or not to be done for a number of reason : 1) because of its sacredness or holiness, 2) because it posseses some inherent mysterious Power, [S. D. F. M. L. Page 1098] সুতরাং লৌকিক সংস্কারের মধ্যে নিষেধ বা 'Tabu' স্থানটি কত গভীরে উপরোক্ত মন্তব্যটি থেকে বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। তাই এককড়ি যখন ভৈরবী হওয়ার লোক-প্রচলিত যোগ্যতা সম্পর্কে বলে যে বিধবা হলে ভৈরবী থাকা চলবে না, কিংবা বিয়ের তেরাত্তিরের পর আর স্বামীস্পর্শ চলবে না তখন লৌকিক সংস্কারের দৃঢ়তা যে কতদুর সুদুরপ্রসারী তা বেশ বোঝা যায়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের কৃতিত্ব এই যে তিনি একটি কথাশিল্পীর ভূমিকা নিয়ে চরিত্র সৃষ্টি করেছেন। লৌকিক সংস্কারের ভিত্তিমূলে নিষেধের Tabu-র ভূমিকা যতই বড় হোক না কেন, বাঙালী পতিব্রতা নারীর সংস্কারগুলি বাঙালী নারী চরিত্রের ভিত্তিমূলে আরো গভীরভাবে প্রোথিত। তাই যেমন প্রফুল্লকে ভবানীপাঠকের অনুশীলনতত্ত্ব তার নিজস্ব বাঙালী বধূসত্তার

সংস্কার থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি, অন্নদা দিদির আজন্ম সংস্কার যেমন তাকে হিন্দু নারীর লোকসংস্কারমূলক আচরণ থেকে নিবৃত্ত করতে পারে নি ঠিক তেমনি দেনাপাওনার ষোড়শীও ভৈরবীত্বে পর্যবসিত হয় নি, তার আলাদা সত্তা অর্থাৎ প্রেয়সী সত্তা এবং ষোড়শী অর্থাৎ স্ত্রী সত্তাই তাকে ভৈরবীত্বের নিষ্ঠুর সংস্কারের বন্ধন থেকে মুক্ত করে তার চিরায়ত গভীর হিন্দু রমণীর পতিব্রতের সংস্কার তাহাকে নিষ্ঠুর, লম্পট জীবানন্দের মত স্বামীর নিকটবর্তী করিয়েছে। উপন্যাসের শেষে তাই দেখি জীবানন্দের কাছে অলকার আত্মসমর্পণ—ভৈরবীর শুষ্ক সংস্কারের বা বাধানিষেধের পর্বত ডিঙিয়ে পত্নীত্বের চিরকালীন সংস্কার জয়ী হয়েছে; "কথা শুনিয়া অলকার দু'চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল এবং এমন একান্ত আত্মসমর্পণের দ্বারা যে তাহার সর্বস্ব জয় করিয়া লইয়াছে, তাহারই মুখের প্রতি চাহিয়া তাহার পদতলের মাটিটা পর্যন্ত যেন অকস্মাৎ কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল, কিন্তু আপনাকে সে তৎক্ষণাৎ সংবরণ করিয়া লইয়া হাতের উপরে একটু চাপ দিয়া হাসিয়া বলিল, আচ্ছা চল ত এখন। নৌকাতে বসে তখন ধীরে-সুস্থে ভেবে দেখবো কি কি ক্ষমতা তোমাকে দেওয়া যেতে পারবে এবং কি কি একেবারেই দেওয়া চলবে না।

সেই ভালো! বলিয়া জীবানন্দ ষোড়শীর হাত ধরিয়া অগ্রসর হইল।

এখানেই শরৎচন্দ্রের সার্থকতা। লৌকিক সংস্কারের মাঝখানেই মানুষকে দেখেছেন, বিচার করেছেন, তারপর লোকায়ত মানুষের চিরকালের রূপটাকে ফুটিয়ে তুলেছেন অসামান্য দক্ষতার সঙ্গে। তাই বঙ্কিমই হোক আর শরৎচন্দ্রই হোক লোকজীবনের আচার ব্যবহার, বিশ্বাস অবিশ্বাস, ভালো লাগা মন্দ লাগার মাঝখান থেকে মানুষগুলোকে তুলে ধরেছেন আমাদের সামনে, কিন্তু শিল্পীর দক্ষতায় তাদের অসাধারণত্বটুকুকেও চিরকালের সত্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন!

ধর্ম যে যে পদ্ধতিতে অতীন্দ্রিয় শক্তি ও দেবদেবীকে সন্তুষ্ট করবার চেষ্টা করে তাকে বলা যায় ক্রিয়া (Ritual) ও অনুষ্ঠান (ceremony)। ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ঐশ্বরিক শক্তি ও বিভিন্ন দেবদেবী বা কখনও মৃত আত্মা (Spirit) ইত্যাদির কাছে আবেদন জানালে তাদ্বারা মানুষের মনস্কামনা পূর্ণ হবে, গৃহ ধনে জনে পরিপূর্ণ হবে, শস্য ফলবে অপর্যাপ্ত, সন্তানসন্ততিতে গৃহ সমৃদ্ধ হবে—এ সমস্ত কিছুর উদ্দেশেই অনুষ্ঠিত হয়েছে নানা লোক উৎসব (Folk Festival)। শরৎচন্দ্রও গ্রামীণ লোকায়ত মানুষের পরিবেশ ও জীবনবৃত্ত রচনা করতে গিয়ে অসংখ্য লোক-উৎসবের প্রেক্ষাপট রচনা করেছেন লোকায়ত পরিবেশটি ফোটানোর জন্যে। মানুষ শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও কি নিয়ে বেঁচে আছে, কিসের আনন্দ

প্রেরণায় জীবন অতিবাহিত করছে, সেই আনন্দের উৎসস্থল কোথায়?—এ-সমস্তই আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়েছেন শরৎচন্দ্র লোক উৎসবের বর্ণনায়। দেনাপাওনা উপন্যাসের পনর পরিচ্ছেদে এরকম একটি লোক উৎসব বা লোক ক্রিয়ার (Ritual) অনুষ্ঠানের সার্থক রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন। যথা: "চৈত্রের সংক্রান্তি আসন্ন হইয়া উঠিল। চড়ক গাজন উৎসবের উত্তেজনায় কৃষিজীবীর দল প্রায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে—এত বড পর্বদিন তাহাদের আর নাই।" শরৎচন্দ্র লোকায়ত জীবন ও পর্ব-পার্বনকে যে গভীরভাবে জানতেন তার সার্থক প্রমাণ উপরোক্ত মন্তব্য। একজন যথার্থ সমাজবিজ্ঞানীর মতই তিনি মন্তব্য করেছেন যে যে কৃষিজীবী সমাজের কাছে চড়ক গাজনের মত এত বড় পার্বণ আর নাই। সত্যই চড়ক ও গাজন আসলে একটি সূর্যোৎসব বা Sun Festival এবং এর প্রধান দেবতা শিব হচ্ছেন আসলে সূর্যদেবতা। লোকশ্রুতিবিদের মতে: "চৈত্র মাসের শেষভাগে আমাদের দেশে বর্তমান শিবের গাজন নামে যে একটি লৌকিক অনুষ্ঠান পালন করা হইয়া থাকে পূর্বে ইহার সঙ্গে শিবের কোন সম্পর্ক ছিল না, কারণ ঐ সময় কিংবা চৈত্র মাসের শেষ দিন অর্থাৎ যেদিন শিবের গাজন অনুষ্ঠানটি সম্পূর্ণ হয় সেদিন শিবপূজার কোন তিথি নাই, বরং ঐ সময় সূর্য দ্বাদশ রাশির যাত্রা শেষ করিয়া নুতন যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয় বলিয়া তাহা সূর্য পূজারই তিথি হইতে পারে—আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, ধর্ম ঠাকুর সূর্যদেবতা ছাড়া আর কিছুই নহে। অতএব মনে হয় সমাজে শৈবধর্মের প্রভাবের ফলে চৈত্র মাসের শেষভাগে অনুষ্ঠিত সূর্য বা ধর্মঠাকুরের গাজনই বর্তমানে শিবের গাজন বলিয়া পরিচিত হইয়াছে।" (ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলার লোকশ্রুতি, পৃঃ ৯০)

এই 'গাজন' উৎসবের প্রভাব বাংলাদেশের লোকায়ত জীবনে অত্যন্ত ব্যাপকতর। শরৎচন্দ্র তাঁর লৌকিক মানসিকতা নিয়ে নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন: "নরনারী নির্বিশেষে যাহারা সমস্ত মাস ব্যাপীয়া সন্ন্যাসের ব্রতধারণ করিয়া আছে, তাহাদের পরিধেয় বস্ত্রে ও উত্তরীয়ের গৈরিকে দেশের বাতাসে যেন বৈরাগ্যের রং ধরিয়া গেছে। পথে পথে 'শিব-শম্ভু' নিনাদের বিরাম নাই, চণ্ডীর দেউলে তাহাদের আসাযাওয়ার শেষ হইতেছে না—প্রাঙ্গণ সংলগ্ন শিবমন্দির ঘেরিয়া দেবতার অসংখ্য সেবকে যেন মাতামাতি বাধাইয়া দিয়াছে। পূজা দিতে, তামাসা দেখিতে, বেচাকেনা করিতে যাত্রী আসিতে আরম্ভ করিয়াছে, বাহিরে প্রাচীরতলে দোকানীরা স্থান লইয়া লড়াই করিতে শুরু করিয়া দিয়াছে—চোখ চাহিলেই মনে হয় চণ্ডীগড়ের একপ্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত মহোৎসবের সূচনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া

উঠিতে আর বিলম্ব নাই।" কেবল চণ্ডীগড় নয় সারা বাঙলাদেশে বিশেষ করে পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের গ্রামে গ্রামে চৈত্রের সারা মাস ধরেই চলে এই গাজন উৎসব। এই সময় মানুষের উৎসবের যেমন বিরাম নেই তেমনি নেই সময়ের কোন সীমা। উৎসব আর ব্যস্ততা—সমস্তক্ষণই গ্রাম্য মানুষ মত্ত হয়ে থাকে এই সব লোক উৎসবের মধ্যে কারণ এই উৎসবই হচ্ছে জীবন। তাই পনর পরিচ্ছেদে জীবানন্দ যখন পাইক বরকন্দাজ নিয়ে এসে ভৈরবী ষোড়শীর কাছে দেবীর অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব চেয়েছে তখন ষোড়শী উত্তর দিয়েছে: "কাল দেবীর অস্থাবর সম্পত্তি বুঝিয়ে দেবার সময় আমার নেই এবং পরন্তু মন্দিরের কোথাও সভাসমিতির স্থানও হবে না। এগুলো বন্ধ রাখতে হবে।" এই সময় না হওয়া ও জায়গা না পাওয়ার কারণ হিসেবে ষোড়শী উপস্থিত সকলকে শুনিয়েছিলো: আপনি ত জানেন রায়মশাই, এখন গাজনের সময়। যাত্রীর ভিড়, সন্ন্যাসীর ভিড়, আমারই বা সময় কোথায়, তাদেরই বা সরাই কোথায়?"

সুতরাং বলা চলে শরৎচন্দ্র উপযুক্ত সংলাপই ব্যবহার করেছেন, লোকায়ত জীবন ও উৎসব যে একসূত্রে গ্রথিত এটি উপলব্ধি করে ষোড়শীর সংলাপে তা প্রকাশ করেছেন। এই লোকউৎসবগুলির প্রভাব যে কিরূপ তাও শরৎচন্দ্র নিপুণ সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে দেখেছেন ও পর্যালোচনা করেছেন। পরের পরিচ্ছেদেই তিনি বলেছেন: "চৈত্রের সংক্রান্তি নিরুপদ্রবে কাটিয়া গেল—'শিব-শম্ভু'র গাজন-উৎসবে কোথাও কিছুমাত্র বিঘ্ন ঘটিল না। দর্শকের দল ঘরে ফিরিল, দোকানীরা দোকান ভাঙিতে প্রবৃত্ত হইল, বাতাসে তেলে-ভাজা খাবারের গন্ধ ফিকা হইয়া আসিল, এবং গেরুয়াধারীরাও চীৎকার ছাড়িয়া গৃহকর্মে মন দিবার প্রয়োজন অনুভব করিল। চিরদিনের অভ্যস্ত সুরে চারিদিকের আবহাওয়া সুখ-দুঃখের আবার সেই পরিচিত স্রোত দেখা দিল"।

ভৌতিক বিশ্বাস এবং আত্মা সম্পর্কে সংস্কার পৃথিবীর আদিম যুগ থেকে আজকের লোক সমাজে প্রবাহিত হয়ে আসছে। পৃথিবীর সব জাতি ও জনগোষ্ঠী নৈর্ব্যক্তিক শক্তি (Mana) কে যেমন স্বীকার করে নিয়েছে, তেমনি এই শক্তিকে দেবদেবীরূপে রূপান্তরিত করেছে। এই সব দেবদেবী যেমন মানুষের মঙ্গলও করতে পারে, তেমনি অন্যের ক্ষতিও করতে পারে। এদেরই লোকায়ত সমাজ ভূত-প্রেত, দৈত্য-দানো ইত্যাদি রূপে চিহ্নিত করে অশুভ আত্মা (Evil Spirit) র প্রতীক হিসেবে কল্পনা করেছে। বাংলাদেশের লোকসমাজ এমনকি উচ্চতর সমাজ দৈত্য-দানো অপেক্ষা ভূত-প্রেতের কথাই

বেশী বিশ্বাস করেছে। শ্রীকান্ত উপন্যাসের মধ্যে দেখা যায় কুমার সাহেবের তাঁবুতে গ্রামেরই এক হিন্দুস্থানী প্রবীণ ভদ্রলোক বললেন: "প্রেত-যোনিতে যদি কাহারও সংশয় থাকে—যেন আজিকার এই অমাবস্যার তিথিতে, এই গ্রামে আসিয়া চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া যান। তিনি যে জাত, যেমন লোকই হোন, এবং যত ইচ্ছা লোক সঙ্গে করিয়া লইয়া যান, আজ রাত্রে মহাশ্মশানে যাওয়া তাঁহার পক্ষে নিষ্ফল হইবে না। আজিকার ঘোর রাত্রে এই শ্মশানচারী প্রেতাত্মাকে শুধু যে চোখে দেখা যায়, তাহা নয়, তাহার কণ্ঠস্বর শুনা যায়, এবং ইচ্ছা করিলে তাহার সহিত কথা বার্তা পর্যন্ত বলা যায়।" ভৌতিক বিশ্বাসটি (Ghost belief) কত সুদৃঢ় যে এই গ্রাম্য মানুষ মনে করে অমাবস্যার বিশেষ ক্ষণে শ্মশানে গেলে প্রেতাত্মাকে শুধু যে চোখে দেখা যায় তা নয়, তার কণ্ঠস্বর শোনা যায় এবং তার সঙ্গে কথা বার্তাও বলা সম্ভবপর। শ্রীকান্ত যখন অবিশ্বাস করেছে এবং বলেছে যে সে ছেলেবেলায় অনেক শ্মশানেই রাত্রি কাটিয়েছে তখন বৃদ্ধ চটে উঠে যা বললেন তার মধ্য থেকে এরূপ লোক বিশ্বাস-গুলির ভিত্তি যে কত গভীর ও ব্যাপক তা বেশ স্পষ্ট উপলব্ধি করা যায়। "আপ্ সেখি মৎ করো বাবু, বলিয়া তিনি সমস্ত শ্রোতৃবর্গকে স্তম্ভিত করিয়া, এই শ্মশানের মহা ভয়াবহ বিবরণ বিবৃত করিতে লাগিলেন। এ শ্মশান যে যে-সে স্থান নয়, ইহা মহাশ্মশান এখানে সহস্র নরমুণ্ড গণিয়া লইতে পারা যায়, এ শ্মশানে মহা-ভৈরবী তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া প্রত্যহ রাত্রে নরমুণ্ডের গেণ্ডুয়াখেলিয়া নৃত্য করিয়া বিচরণ করেন; তাহাদের কল কল হাসির বিকট শব্দে কতবার কত অবিশ্বাসী ইংরাজী জজ-ম্যাজিস্ট্রেটেরও হৃদস্পন্দন থামিয়া গিয়াছে—এমনি সব লোমহর্ষণ কাহিনী এমন করিয়াই বলিতে লাগিলেন যে, এত লোকের মধ্যে দিনের বেলা তাঁবুর ভিতরে বসিয়া থাকিয়াও অনেকের মাথার চুল পর্যন্ত খাড়া হইয়া উঠিল।" এই ভৌতিক বিশ্বাসটি এত তীব্র যে শরৎচন্দ্র কেবল গল্প বক্তার ধারণাটাই এখানে উপস্থিত করলেন না, উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে তার কি প্রতিক্রিয়া তারও একটি নিখুঁত বর্ণনা উপস্থিত করে প্রমাণ করেছেন এইসব লৌকিক বিশ্বাসগুলির শিকার প্রায় প্রত্যেকটি মানুষ—কি গ্রাম্য কি শহরে, কি মূর্খ কি শিক্ষিত। যারা এইগুলি বিশ্বাস করে না তাদের সম্পর্কে সাধারণের ধারণা ও প্রতিক্রিয়াটি কি তাও শরৎচন্দ্র সুন্দর ভাবে উপস্থিত করেছেন: "আমি পাখী মারিতে পারি না, কিন্তু বন্দুকের গুলিতে ভূত মারিতে পারি; বাঙ্গালী ইংরাজী পড়িয়া হিন্দু শাস্ত্র মানে না; তাহারা মুরগী খায়; তাহারা মুখে

যত বড়াই করুক, কার্যকালে ভাগিয়া যায়, তাহাদিগকে তাড়া দিলেই তাহাদের দাঁত-কপাটি লাগে—এই প্রকারের সমালোচনা চলিতে লাগিল।" আসলে সমাজের যে বাতাবরণের মধ্যে মানুষ বাস করে তার বাইরে যাবার চেষ্টা করলে কিংবা কোন কিছুকে খতিয়ে দেখার বা বিচারের ভূমিকা নিলেই সমাজ নামক বস্তুটি তা সহ্য করতে পারে না। তখন সেখানে লোকবিশ্বাসটিও হিন্দুধর্মের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়, মুর্গী খাওয়া এবং ইংরাজী পড়া মহাপাতকের বিষয় বলে বিবেচিত হয়। এমনি লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কারের দৃঢ়প্রোথিত শিকড়। তাই ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত, ভূত-অবিশ্বাসী, সংসার বিহীন শ্রীকান্ত ও মহাশ্মশানে দাঁড়িয়ে যে সত্য উপলব্ধি করেছে তা হচ্ছে: আমার সেই রাম-নামের অভেদ্য কবচ কই? আমি ত ইন্দ্র নই যে, এই প্রেতভূমিতে নিঃসঙ্গ দাঁড়াইয়া, চোখ মেলিয়া প্রেতাত্মার গেণ্ডুয়া—খেলা দেখিব?………হঠাৎ কে যেন পিছনে—দাঁড়াইয়া আমার ডান কানের উপর নিশ্বাস ফেলিল। ঘাড় না তুলিয়াও স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, নিশ্বাস যে নাকের মস্তফুটাটা হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহাতে চামড়া নাই, মাংস নাই, এক ফোঁটা রক্তের সংশ্রব পর্যন্ত নাই—কেবল হাড় আর গহবর।…………মনে হইতে লাগিল, সমস্ত প্রেত লোকের ঠাণ্ডা হাওয়া যেন এই গহ্বরটা দিয়াই বাহির হইয়া আসিয়া আমার গায়ে লাগিতেছে। এত কাণ্ডের মধ্যেও কিন্তু একথাটা ভুলি নাই যে, কোনমতেই আমার চৈতন্য হারাইলে চলিবে না। তাহা হইলে মরণ অনিবার্য্য, দেখি ডান পা-টা ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। থামাইতে গেলাম, থামিল না। যেন আমার পা নয়।" এরপরে রতন লোকজন নিয়ে যখন ডাকতে এসেছে তখন শ্রীকান্তের অবস্থা আরও শোচনীয়: "উল্লাসে চেঁচাইয়া সাড়া দিতে গেলাম, কিন্তু স্বরফুটিল না। একটা প্রবাদ আছে, ভূত-প্রেত যাবার সময় কিছু একটা ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়। যে আমার পিছনে ছিল, সে আমার কণ্ঠস্বরটা ভাঙ্গিয়া দিয়াই বিদায় হইল" Thompson, R. Campbell তাঁর Semetic Magio (Luzac and Co. 1908) গ্রন্থে এই অপদেবতা বিশ্বাসকে তিনটি ভাগে বিভক্ত করেছেন: (ক) অদেহীশক্তি—মৃত্যুর পর নর-নারীর আত্মা এস্থলে অন্য কোনরূপ মূর্তি পরিগ্রহ না করে অদেহী অবস্থাতে থাকে। (খ) নৈর্ব্যক্তিক শক্তি—পৃথিবীর সঙ্গে বড় সম্পর্ক নেই। মানুষের অকল্পনীয় শক্তিতে বা মূর্তিতে এরা আবির্ভূত হতে পারে। এরাই দৈত্য-দানবরূপে পরিচিত। গ) অর্ধ-নৈর্ব্যক্তিক শক্তি ও অর্ধমানব—অনিয়মিত অতিপ্রাকৃত

যৌনমিলনের ফলস্বরূপ এদের আবির্ভাব। বিশ্বের সকল পুরাণে এদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। (পৃঃ ২) থম্পসনের মতে যদি মৃতকে যথাবিধি 'অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার মাধ্যমে সমাহিত বা দাহ করা না হয় তাহলে তাঁর অতৃপ্ত আত্মা ঘুরে বেড়ায়। সে কখনো মানুষের মূর্তিতে আবির্ভূত হয়ে আবার মিলিয়ে যায়। লোকবিশ্বাস যে মৃত্যুর পর মৃতের জন্য শান্তির ব্যবস্থা না করলে বা তার উদ্দেশ্যে খাদ্যাদি উৎসর্গ না করলে মৃতের আত্মা লোকসমাজে ঘুরে বেড়ায় ও মানুষের ক্ষতি করতে থাকে। রোগ, ব্যাধি ও অন্যান্য মানবিক অকল্যাণের জন্য এরাই দায়ী। সুতরাং শ্রীকান্ত অবিশ্বাসী হলেও রক্তের মধ্যে এই সব সংস্কার বাসা বেঁধে আছে তাকে দূর করা অসম্ভব। তাই শ্মশানের নিঃশব্দ ভয়ঙ্করতায় তাঁর সংস্কারগুলি বার বার ফিরে ফিরে এসেছে। পরের দিনই আবার তার মনে হয়েছে: "কাহার পায়ের শব্দে ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। ফিরিয়া দেখিলাম শুধু অন্ধকার—কেহ কোথাও নাই।" কিসের আকর্ষণে শ্রীকান্ত তেঁতুলগাছের ঝাড় অতিক্রম করে বাঁধের উপর দিয়ে মোহাবিষ্ট হয়ে মহাশ্মশানে উপনীত হয়েছে তখন শ্রীকান্ত উপলব্ধি করেছে: "যা ভাবিয়াছিলাম, ঠিক তাই। ঠিক নিচেই মহাশ্মশান! আবার কাহার পদশব্দ সমুখ দিয়াই নীচে শ্মশানে গিয়া মিলাইয়া গেল। এইবার টলিয়া টলিয়া সেই ধূলা বালুর উপরেই মূর্ছিতের মত ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িলাম।" আসলে পরদিনেই শ্মশানের এই আকর্ষণ—এটি কিন্তু সাইকোলজিক্যাল ঘটনামাত্র। কিন্তু অবিশ্বাসী শ্রীকান্তেরও এই উপলব্ধি হয়েছে যে কোন প্রেতাত্মার অশরীরী আকর্ষণ তাকে 'এক মহাশ্মশান হইতে আর এক মহা শ্মশানে পথ দেখাইয়া পৌঁছাইয়া দিয়া গেল।'

আসলে শরৎচন্দ্র কেবলমাত্র শিল্পী বা ঔপন্যাসিক মাত্র ছিলেন না। তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ব্যতীত সারা জীবনের সামাজিক অভিজ্ঞতা ও পৃথিবীর তাবৎ গ্রন্থপাঠ শরৎচন্দ্রকে এক বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছিলো যার ফলে তাঁর সমগ্র সাহিত্যের পিছনে সমাজ বা ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ মতবাদ বা তত্ত্বকথার শৃঙ্খলা কাহিনী রচনা বা চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে কার্যকর ছিল। যেমন আধুনিক সাহিত্যের ইতিহাসকার বলেছেন: শরৎচন্দ্র যখন আসরে অবতীর্ণ হলেন তখন বাঙালীর সমাজ নামক সেই institution-টি প্রায় ভেঙে পড়েছে, নাগরিক জীবনের সমাজ সংকীর্ণতাপ্রাপ্ত হয়ে তিনটি প্রাণীর মধ্যে আবর্তিত হতে আরম্ভ করেছে—স্বামী-স্ত্রী ও সন্তান। এই পটভূমিকায় আবির্ভূত নরনারীর ব্যক্তিত্বের

সঙ্গে অদৃষ্ট ও সমাজের কাল্পনিক সংঘর্ষ শরৎ সাহিত্যের একটা মূল উপাদান।'[১] এ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আর একটি মন্তব্য : কিন্তু তার দু একটি উপন্যাসের মধ্যে যে গ্রামজীবনের রূপ তিনি প্রকাশ করেছেন, তা কেবল শিল্প-সাহিত্য কিংবা সামাজিক অর্থনৈতিক দিক থেকেই মূল্যবান নয়, আরও একটি বিষয়ের উপর আলোক-পাত করে আমাদের বাংলার গ্রাম-জীবন সম্পর্কে মৌলিক একটি গবেষণার ক্ষেত্র উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছে, তা আমাদের দেশের প্রাচীন পল্লী-সংগঠন (ভিলেজ অর্গানাইজেশন)।'[২] সুতরাং দেখা যাচ্ছে শরৎচন্দ্র লেখক জীবনের সূচনা থেকেই একটা পূর্বপরিকল্পিত ভাবেই নিজেকে পরিচালিত করেছেন। শরৎ চন্দ্র ছিলেন মূলতঃ সমাজতাত্ত্বিক। কখনও কখনও নৃতত্ত্বের দৃষ্টি নিয়ে তিনি বাংলার গ্রাম সমাজ ও মানুষকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, বিশ্লেষণ করেছেন এবং স্বার্থকভাবে তাকে সাহিত্যের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধটি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় শরৎচন্দ্র তার সমগ্র সাহিত্যে নারীর নিগৃহীত জীবনের বেদনামধুর যে সব চিত্র অঙ্কন করেছেন সেই নারীর ইতিহাসটি সমাজ-তাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিকের দৃষ্টি নিয়ে ওই প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন। সুতরাং লোকায়ত জীবন এবং তার সমাজ ও মানুষকে বোঝার জন্য যে মৌলিক বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন, নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্বের বহু গ্রন্থাদি পাঠ করে শরৎচন্দ্র তা পূর্ব থেকেই তৈরী করে নিয়েছিলেন। নারীর প্রতি সহানুভূতি বশতঃ আবেগের দ্বারা পরিচালিত হয়ে যখন তিনি উপন্যাসের কাহিনীগুলির পরিকল্পনা করেছিলেন, তখনই বোধ হয় নারীর পারিবারিক ও সামাজিক লাঞ্ছনার দিকটি সমাজ, ইতিহাস ও নীতির দিক থেকে চিন্তা করেছিলেন। শোনা যায় রেঙ্গুনে বসবাস কালে তিনি নারীজীবন, বিশেষতঃ পতিতাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক দিকগুলি আলোচনা করার জন্য বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে নানা স্থান থেকে হতভাগিনী কুলত্যাগিনীদের যথার্থ ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন। 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন : বার-তের বৎসর পূর্বে জনৈক ভদ্রলোক এই বাঙলাদেশে কুলত্যাগিনী বঙ্গরমণীর ইতিহাস

১। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শরৎ পরিক্রমা। সাহিত্যিক বর্ষপঞ্জী। শরৎ সংখ্যা পৃঃ ১৪৬।

২। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। দেনাপাওনায় পল্লী সমাজ। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, শরৎ সংখ্যা। পৃঃ ৭২।

সংগ্রহ করিতেছিলেন। তাহাতে বিভিন্ন জেলায় বহু সহস্র হতভাগিনীর নাম, ধাম, বয়স, জাতি, পরিচয় ও কুলত্যাগের সংক্ষিপ্ত কৈফিয়ত লিপিবদ্ধ ছিল।...... আমি হিসাব করিয়া দেখিয়া বিস্মিত হইয়া গিয়াছিলাম যে এই হতভাগিনীদের শতকরা সত্তরজন সধবা। বাকী ত্রিশটি মাত্র বিধবা।" খুব সম্ভব শরৎচন্দ্র নিজেই এই ইতিহাস সংগ্রহ করে তার আলোচনায় ব্রতী হয়েছিলেন. তিনি হয়তো দেখাতে চেয়েছিলেন পতিতাবৃত্তির মূল কারণ স্ত্রীলোকের কামোন্মাদনা নয়। সমাজ ও পরিবারের লাঞ্ছনা, কোথাও বা নিদারুণ দারিদ্রের জন্য বহু কুলবধূকে গৃহত্যাগ করতে হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র নারী চরিত্রের এই পরিণামের হেতু বিশ্লেষণের অভিপ্রায়ে সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, নীতিবাদ, নারী আন্দোলনের সম্পর্কে বহু গ্রন্থাদি পাঠ করে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন তা হচ্ছে এই যে পাশ্চাত্যে ও আমাদের দেশে নারীকে স্বতন্ত্র মূল্য দেওয়া সত্বেও নারীর যে যথার্থ স্থান সমাজে আজও নির্ণয় হয়নি তার কারণ হচ্ছে পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের স্বার্থপরতা। আমাদের দেশের সহমরণের কারণ অনুসন্ধানে বলেছেন: 'নারীর জন্য সতীত্ব। পুরুষের জন্য নয়। এ সতীত্বের চরম দাঁড়াইয়া ছিল —সহমরণে। কবে এবং কি হইতে ইহার সূত্রপাত, সে কথা ইতিহাসে লেখে না।' কিন্তু একজন প্রকৃত Anthropologist-র মত মানবসভ্যতার সূচনাতে আদিম যুগেই যে এর উৎস নিহিত আছে পর মুহূর্তেই তা আবিষ্কার করে ফেলেছেন: 'অথচ দেখা যায় অসভ্য জাতির মধ্যে এ প্রথার বেশ প্রচলন। দাক্ষিণাত্যে সতীর কীর্তিস্তম্ভ যথেষ্ট, এবং আফ্রিকায় ও ফিজিদ্বীপে ভাগ্যে কীর্তিস্তম্ভের বালাই নাই, না হইলে ও দেশগুলোয় বোধ করি—এতদিনে পা ফেলিবার স্থানটুকুও থাকিত না। এক একটা ডাহেমি সর্দারের মৃত্যু উপলক্ষে তাহার শতাবধি বিধবাকে সমাধি স্থানের আশে পাশে গাছের ডালে ডালে গলায় দড়ি দিয়া ঝুলাইয়া দেওয়া হইত; অর্থাৎ, পরলোকে সঙ্গে পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইত।' সুতরাং শরৎচন্দ্রের মানসিকতার পিছনে একটি সমাজ বিজ্ঞানীর মনোভাব কাজ করেছে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তাই উপন্যাসের লৌকিক উপাদানের পিছনেও ওই একই সমাজতাত্ত্বিক ও নৃতত্ত্ববিদের মানসিকতা কাজ করেছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলির গঠনভঙ্গি ও চরিত্র পরিকল্পনাটি বিশ্লেষণ করলে শরৎচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক লোকায়ত দৃষ্টি ভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যাবে।

প্রাচীনকালে এক একটি গোষ্ঠীর (কমিউনিটি) মানুষ নিয়ে এক একটি গ্রাম গড়ে উঠতো। সেই গ্রাম এক একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠান।

তার মধ্যে এক গোষ্ঠীর ভিন্ন অন্য গোষ্ঠীর লোক কোন মতেই প্রবেশ করতে পারতো না। গ্রামের একক সত্তা রক্ষা করবার জন্য সেই গ্রামের অধিকারী গোষ্ঠী তার সকল শক্তি নিয়োগ করত। গ্রামের মধ্যে বৃত্তিবিভাগ থাকলেও মূলতঃ জাতি বিভাগ ছিল না। গ্রামের সমস্ত মানুষকে একতা বদ্ধ করে রাখার জন্য গ্রাম দেবতার বারোয়ারী পুজো হোত। কখনো গ্রাম দেবতার নিকট একক কেউ পূজো দিতে পারতো না। গ্রাম দেবতার সম্পত্তি যে যার শক্তি ও সামর্থ অনুযায়ী ভোগ দখল করত এবং দেবতার বাৎসরিক পূজার সময় তার জন্যে খাজনা দিতে হোত। খাজনা আদায় করার পদ্ধতিও খুব সুন্দর ছিল। কবে গ্রাম দেবতার বাৎসরিক পূজো হবে তা সকলেই আগে থেকেই জানতো। তার জন্যে সকলেই প্রস্তুত থাকতো, খাজনা বার্ষিক দেয় বলে নগদ টাকাতেই হোক আর ফসলেই হোক তারা আগে থেকেই আলাদা করে রাখত। তারপর দেবতার বার্ষিক পূজো যখন আসন্ন হোত তখন একদিন দেবতার একটি প্রতীক কাষ্ঠাসনে বসিয়ে ভার প্রাপ্ত কোন গ্রামবাসী বাদ্য ভাণ্ডসহ গ্রামবাসীর ঘরে এসে উপস্থিত হোত। দেবতার প্রতীককে বাড়ীর আঙ্গিনায় নামিয়ে রাখবামাত্র গৃহস্থ যে পরিমাণ দেবতার জমি ভোগ করে সেই অনুপাতে সে নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ খাজনা কিংবা জমির ফসল এনে দেবতার পাশে রেখে দিত। এই ভাবে প্রত্যেক বাড়ি থেকে খাজনা সংগ্রহ করা হোত। দেবতার নাম তার সঙ্গে যুক্ত থাকতো বলে গ্রামে বাস করে কেউ তা দিতে অস্বীকার করতো না বরং কর্তব্য বলে তারা মনে করতো।[১] তারপর বহু রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক উত্থান পতনের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত যখন ইংরেজ রাজত্বে জমিদারী প্রথার প্রবর্তন হোল তখন জমিদার এবং তার গোমস্তা গ্রাম জীবনের উপর এক নুতন অধিকার স্থাপন করবার প্রয়াস পেল। প্রচলিত সংগঠনের উপর জমিদার যখন তাঁর নিজস্ব প্রভুত্ব স্থাপন করতে গেলেন তখন এক নুতন সঙ্কট দেখা দিল। পাল রাজাদের আমলের ধর্মীয় ও সামাজিক সঙ্কট এর পরে দেখা দিল নুতন অর্থনৈতিক সঙ্কট, প্রচলিত গ্রাম ব্যবস্থার সঙ্গে জমিদারের নির্লজ্জ স্বার্থের সংঘাতের উপর ভিত্তি করেই শরৎচন্দ্রের 'দেনা পাওনা' উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে অপর দিকে গ্রাম বা সমাজ সংগঠনের সঙ্গে ব্যক্তি সত্তার সংঘর্ষটি স্পষ্ট করে দেখানো হয়েছে। লোকায়ত স্তরে মানুষের সমাজ

১। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য। দেনাপাওনায় পল্লীসমাজ। ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, শরৎ সংখ্যা। পৃঃ ৭২।

সংগঠনের সঙ্গে আধুনিক ব্যক্তি মানুষের সংঘাত ও সংঘর্ষএর চিত্রই শরৎ উপন্যাসের ভিত্তি রচনা করেছে। একদিকে প্রচলিত লোকায়ত সমাজ ও গ্রাম' সংগঠনগুলি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়ছে জমিদারী তন্ত্রের আঘাতে এবং অপর দিকে সেই বিলীয়মান দৃশ্য বা অদৃশ্য সমাজ শক্তির সঙ্গে ব্যক্তি সত্তার সংঘাত বেঁধেছে—শরৎ উপন্যাসে এরই প্রতিচ্ছবি।

সমাজ শাসিত গ্রামীণ জীবনের এবং লোকায়ত সমাজ জীবনের কি রূপ, তার বিকৃত চেহারাটাই বা শরৎচন্দ্র তা বেশ স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে ছিলেন। তারই কি সার্থক রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন 'শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রথম পর্বে পিয়ারী বাইজীর উপাখ্যানে: "ভাগ্নীদের বিবাহ হয় না, মামা ভাবিয়া খুন। দৈবাৎ জানা গেল, বিরিঞ্চি দত্তের পাচক ব্রাহ্মণ ভঙ্গ-কুলীনের সন্তান। এই কুলীন সন্তানকে দত্ত মশায় বাঁকুড়া হইতে বদলী হইয়া আসার সময় সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ছিলেন। বিরিঞ্চি দত্তের দুয়ারে মামা ধন্না দিয়া পড়িলেন ব্রাহ্মণের জাতি রক্ষা করিতেই হইবে। এতদিন সবাই জানিত দত্তদের বামুনঠাকুর হাবাগোবা ভালমানুষ। কিন্তু প্রয়োজনের সময় দেখা গেল, ঠাকুরের সংসার বুদ্ধি কাহারো অপেক্ষা কম নয়। একান্ন টাকার পণের কথায় সে সবেগে মাথা নাড়িয়া কহিল, অত সস্তায় হবে না মশায়—বাজারে যাচিয়ে দেখুন। পঞ্চাশ এক টাকায় এক জোড়া ভাল রামছাগল পাওয়া যায় না তা জামাই খুঁজছেন। একশ একটি টাকা দিন—একবার এ পিঁড়িতে বসে, আর একবার ওপিঁড়িতে বসে, দুটো ফুল ফেলে দিচ্ছি দুটি ভাগ্নীই একসঙ্গে পার হবে। আর একশখানি টাকা—দুটো ষাঁড় কেনার খরচটাও দেবেন না। কথাটা অসঙ্গত নয়, তথাপি অনেক কষা-মাজা ওসহি-সুপারিসের পর সত্তর টাকায় রাজী হইয়া একরাত্রে একসঙ্গে সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মীর বিবাহ হইয়া গেল। দুদিন পরে সত্তর টাকা নগদ লইয়া দু পুরুষে কুলীন জামাই বাঁকুড়া প্রস্থান করিলেন।" কিংবা 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসেও বিশ্বেশ্বরীর সেই একই আর্তনাদ: 'কেন ভগবান তাকে এতরূপ, এতগুণ, এত বড় একটা প্রাণ দিয়ে সংসারে পাঠিয়ে দিলেন এবং কেনই বা বিনা দোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন! একি অর্থপূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় তাঁরই, না এ শুধু আমাদের সমাজের খেয়ালের খেলা।'

আসলে স্বয়ং শাসিত আমাদের লোকায়ত গ্রাম সংগঠনটি জমিদারের আবির্ভাবের পর যখন তার ভারসাম্যটি হারিয়ে ফেললো যখন তার অর্থনৈতিক

স্বাধীনতা চলে গেল, তখন 'সমাজ' নামক বস্তুটি সমাজের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে লাগলো এবং ক্রমশঃ তার সত্তাটুকু তলানীতে এসে ঠেকলো। তারই ফলে লোক সমাজ একটি আবর্জনা স্তূপ হয়ে উঠলো এবং লোকায়ত সমাজ জীবনের এই আবর্জনাস্তূপ ও কলঙ্কময় অধ্যায়কে শরৎচন্দ্র বাস্তব ভাবে তাঁর উপন্যাস সমূহে উপস্থিত করেছেন।

শরৎচন্দ্রের চরিত্র সৃষ্টির পিছনেও আছে একটি সুনির্দিষ্ট লোকায়ত জীবন বোধ। শরৎচন্দ্র নৃতত্ত্বে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন বলে তিনি জানতেন লোকায়ত কৃষিজীবি সমাজে মাতৃতান্ত্রিকতার প্রাধান্য। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে যে স্ত্রী চরিত্রের প্রাধান্য আছে তার পিছনে ঐ নৃতত্ত্ব মূলক মনোভাব বিশেষভাবে কাজ করেছে। বাংলাদেশের সমাজ জীবনে আর্যদের পিতৃতান্ত্রিকতার আবির্ভাবের বহু পূর্ব থেকেই আদিবাসী অনার্যদের প্রভাব বর্তমান ছিল। আদিবাসী অনার্যরা বিশেষ করে বাংলাদেশের অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় গোষ্ঠী ও পাহাড় অঞ্চলের ভোট চীনা গোষ্ঠীর সমাজ ছিল মূলতঃ মাতৃতান্ত্রিক। তাই বাংলাদেশের গৃহ ধর্ম-কর্ম সমস্ত কিছুতেই নারীর প্রাধান্য। পারিবারিক জীবনের মাতা-কন্যা-স্ত্রী রূপে তাদের যেমন প্রাধান্য ধর্মের ক্ষেত্রেও শ্রীরাধা রূপে, আদ্যাশক্তি মহামায়া রূপে, কখনও চণ্ডী-মনসা—অন্নদা রূপে নারীই বিরাজিতা। সেই লোকায়ত ঐতিহ্য অনুসরণ করেই শরৎ সাহিত্যে নারীর প্রাধান্য। এমন কি যে উপন্যাসে পুরুষ চরিত্র ঘটনার নিয়ামক সেখানেও তার নির্দেশক নারী চরিত্র—প্রেয়সী বা জায়া।[১] যেমন 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস, কিংবা 'পথের দাবী,' দেবদাস ইত্যাদি। এ ছাড়া সমস্ত পারিবারিক উপন্যাসগুলিতে বিশেষ করে নিষ্কৃতি, বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, পল্লীসমাজ, শুভদা, বিরাজ বউ, মেজদিদি, দর্পচূর্ণ, আঁধারে আলো, পথ নির্দেশ, অনুরাধা, সতী, ছবি, মন্দির, বড়দিদি ইত্যাদিতে নারী চরিত্রে মাতৃরূপ, প্রেয়সীরূপ, কন্যারূপ ও জায়ারূপই বিধৃত হয়েছে। এর পিছনে বাংলা দেশের লোকসমাজের মাতৃ-তান্ত্রিকতার প্রভাব বিশেষভাবে কার্যকরী হয়েছে।

১। ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র ও 'নারীর মূল্য'। চতুষ্কোণ শরৎ সংখ্যা। পৃঃ ২২।

॥ দুই ॥

দুযুগের দুই বিস্মৃত উপন্যাস

"বেণের মেয়ে" (১৯১৯)

'বেণের মেয়ে' উপন্যাসখানি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন। এই উপন্যাসে তিনি বৌদ্ধ ও আদিহিন্দু যুগের জীবনযাত্রার ও লোকায়ত জীবন চর্যার একটি সরস ও উজ্জ্বল ছবি অঙ্কিত করেছেন। 'মুখপাত' এ স্বয়ং লেখক বলেছেন: "বেণের মেয়ে' ইতিহাস নয়; সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কেননা, আজকালকার 'বিজ্ঞান সঙ্গত' ইতিহাসের দিনে পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন ইতিহাসই হয় না। আমাদের রক্ত-মাংসের শরীর, আমরা পাথুরে নই, কখন হইতেও চাই না। 'বেণের মেয়ে' একটা গল্প। অন্য পাঁচটা গল্প যেমন আছে এও তাই। তবে এতে এ-কালের কথা নাই। সব সেই সেকালের, যে কালে বাংলার সব ছিল। বাংলার হাতী ছিল, ঘোড়া ছিল, জাহাজ ছিল, ব্যবসায় ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, কলা ছিল। বাঙ্গালী এখন কেবল একেলে 'গণিকাতন্ত্রে'র উপন্যাস পড়িতেছেন। একবার সেকেলে সহজিয়াতন্ত্রের একখানি বই পড়িয়া মুখটা বদলাইয়া লউন না কেন।" [বেণের মেয়ে ১৩২৩]

সেকালের বাঙালীর জীবন কথা ও সহজিয়াতন্ত্রের কথা ও কাহিনী নিয়েই 'বেণের মেয়ে উপন্যাসটি যে রচনা হয়েছে লেখকের 'মুখপাতে' তা বেশ বোঝা গেল।

'বেণের মেয়ে'উপন্যাসের পটভূমিকা দশম শতাব্দীর বাংলাদেশ। তারা পুকুরের রূপাবাগদী এখন সাতগাঁ'এর রাজা। তিনি মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক পরম সৌগত শ্রীশ্রী ১০৮ রূপনারায়ণ সিংহ উপাধি নিয়ে প্রবল প্রতাপে সাতগাঁ শহর ও সপ্তগ্রামভুক্তি শাসন করছেন অন্ততঃ দশ হাজার বাগদী পলটন, হাতী, ঘোড়া, ও রথ তাঁর আছে। তারাপুকুর গ্রামখানি কুন্তী নদীর ধারে, বর্তমান মগরার উপরে অবস্থিত ছিল। পূর্বকালে ওখানে তারাদেবীর এক মন্দির ছিল এবং মন্দিরের সম্মুখে এক প্রকাণ্ড দীঘি ছিল, সেই দীঘিরই নাম তারাপুকুর। উপন্যাসের সূচনাতেই দেখা যায় বৈশাখ মাস, পূর্ণিমা তিথি গাজনের ভারী ধুম। 'কারণ, রূপা রাজা ঠিক করিয়াছে, গাজন তাহার বাড়ি হইতেই বাহির হইবে, বাহির হইয়া সাতগাঁ এর বড় রাস্তা দিয়া ধরমপুরের বিহারে পৌছিবে তাহার একটু দক্ষিণে বিহার প্রতিষ্ঠা হইবে।' এবার বেশী ধুমের কারণ, রূপার এই প্রথম

গাজন ও বিহার প্রতিষ্ঠা, রূপার জীবনে প্রধান সৎকাজ। রূপা লুই সিদ্ধার চেলা। সে এবার অনেক কাকুতি-মিনতি করে লুই সিদ্ধাকে অনুরোধ করেছে, 'গুরুদেব, এই বিহার প্রতিষ্ঠায় গাজনে আপনাকেই মূল সন্ন্যাসী হইতে হইবে।' লুই সিদ্ধা দলবল নিয়ে তারাপুকুর গ্রামে দু তিন দিন থেকে আড্ডা গেড়েছেন। নাঢ় পণ্ডিতের সঙ্গে লুই এর বনে না, রূপা তাঁকেও সঙ্গে এনেছেন। নাঢ় পণ্ডিতের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী শক্তি নাঢ়ীও এসেছে। ঔপন্যাসিকের ভাষায়: 'এ নাঢ়ী বড় কম মেয়ে নয়। ইঁহার দেওয়া নাম নিগু এখন প্রায় লোপ হইয়া আসিয়াছে। জ্ঞান মার্গে ইঁহার বড়ই প্রতিপত্তি বলিয়া ইঁহার নাম জাহির হইয়াছে, জ্ঞান-ডাকিনী।' এঁদের সঙ্গে আরও শিষ্য শিষ্যা। একেবারে মেলা বসে গেছে। লেখকের বর্ণনায় "গ্রাম তারাপুকুর ও দীঘি তারাপুকুরের মাঝখানে হৈ-হৈ রৈ-রৈ কাণ্ড বাঁধিয়া গিয়াছে। কেহ তাঁবুতে রহিয়াছে, কেহ তালপাতার কুঁড়ে বাঁধিয়া রহিয়াছে, কেহ খেজুর পাতার কুঁড়ে বাঁধিয়া আছে। কোথাও বা বড় বড় বাঁশের মেরাপের উপর বড় বড় সামিয়ানা ও পাল খাটান আছে; নীচে অসংখ্য লোক; কেহ ঘুমাইতেছে, কেহ পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে, কেহ বসিয়া গল্প করিতেছে, কেহ হাই তুলিতেছে, কেহ গান করিতেছে, কেহ গাঁজায় দম দিতেছে, কেহ বা ধান্যেশ্বরীর উপাসনা করিতেছে।" এ মেলার বর্ণনার সঙ্গে লোক ধর্মের মেলার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়, ঘোষ পাড়ার সতীমার মেলাই হোক আর কেন্দুলীতে জয়দেবের মেলাই হোক না কেন মোটামুটি লোক ধর্মকে কেন্দ্র করে যেসব মেলা অনুষ্ঠিত হয় তাদের বৈশিষ্ট্য গুলির সঙ্গে উপরোক্ত বর্ণনা প্রায় হুবহু মিলে যায়। একটি প্রচলিত লৌকিক আচরণ লেখক উপস্থিত করেছেন, সেটি হল পঙ্‌তি ভোজনের সময় গুরুর অনুমতি প্রার্থনা। "পাত সাজান হইলে, সন্ন্যাসীর দল বসিয়া গেল, অতিথি অভ্যাগত সব বসিয়া গেল, বসিলেন না কেবল রাজগুরু লুই সিদ্ধা। সকলে বসিয়া গেলে, রাজা তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া খোলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সব পরীক্ষা করিয়া গুরুদেবকে ভোজনের অনুমতি দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। গুরু খোলার একধার হইতে আর একধার পর্যন্ত দেখিয়া গেলেন, বলিলেন, সব উত্তম হইয়াছে, তোমরা আহার করিতে বস। তিনি নিজেও আপনার পাতে বসিয়া গেলেন।" বিকালে গাজন বার হবে। তারাপুকুর থেকে সরস্বতী নদী পর্যন্ত খুব একটা চাটাল রাস্তা তৈরী হয়েছে। সমস্ত রাস্তা গোবর গঙ্গা জলে ধুয়ে দেওয়া হয়েছে। রাস্তার দু ধারে কেবল ফুলের মালা বাঁশের থাম হইতে ঝুলিতেছে, রাস্তার উপর দিয়ে ফুলের মালা বাঁশে

ঝুলান। রাস্তার মাঝে মাঝে বিচিত্র তোরণ। তোরণের উপর থেকে দিকমালাগুলি চারিদিকে ছড়িয়ে ফর ফর শব্দ করছে। দিকমালাগুলি প্রায়ই সোনার পাতে তৈরী, মাঝে মাঝে অভ্রের পাত লাগান। ফলে সূর্যের আলো অভ্রের পাতে পড়তে নানা রঙে আলোক বিকীর্ণ করছে, মাঝে মাঝে ধ্বজার উপর নানা রকমের নানা রঙের, নানা আকারের পতাকা উড়ছে, কোনটি তেকোণা, মুখে ঝালর দেওয়া সমস্তটাই রেশমের তৈরী, কোনটি চৌকোণা সামনে ও নীচে ঝালর কাপাসের জমির উপর রেশমের কাজ করা। রাস্তার দুধারে বাঁশের থাম। প্রত্যেক থামের গোড়ায় পূর্ণ কলস, তার উপর আম্রশাখা, তার উপর একটি টাটকা ডাব। কলসীতে সিঁদুর, চন্দন ও হলুদের দাগ। পূর্ণ কলসের পিছনে একটি কলা গাছ।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী শাস্ত্রজ্ঞ, গবেষক ও পণ্ডিত হলেও বাঙালী ও বাঙলাদেশের লোকায়ত সমাজ, তার উৎপত্তি তার বিচিত্র সাজসজ্জা, লোকশিল্পকলাকে ভাল ভাবেই জানতেন। আর জানতেন বলেই তাঁর 'বেণেরমেয়ে' উপন্যাসে গাজনের সাজসজ্জা বর্ণনায় তার বিচিত্র পরিচয় উপস্থিত করেছেন, কলসী সিঁদুর, চন্দন ও হলুদের দাগ এবং পূর্ণ কলসের পিছনে একটি কলাগাছ—এই লোকসজ্জার বৈশিষ্টটি যে সেই সুদূর দশম শতাব্দী থেকে আজও পর্যন্ত প্রবাহিত হয়ে চলেছে এবং এই প্রবাহমানতাই যে লোকশিল্পের বৈশিষ্ট্য এটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ভাল করে উপলব্ধি করেছিলেন, তিনি উপন্যাসের সূচনায় এই গাজনের বর্ণনা দিচ্ছেন, এই গাজনটি আসলে ধর্মঠাকুরের গাজন। এদেশে এই লৌকিক দেবতা ধর্মঠাকুরের ইতিহাস বড় প্রাচীন। পশ্চিমবাঙলার বিস্তৃত অঞ্চলে, বিশেষতঃ ভাগীরথীর পশ্চিমতীর থেকে আরম্ভ করে ছোটনাগপুরের অরণ্যভূমি পর্যন্ত এই লৌকিক দেবতার পূজার এখনও ব্যাপক প্রচলন আছে। এইসব লৌকিক দেবতা প্রসঙ্গে একজন নৃতত্ত্ববিদ বলেছেন: That Primitive worship has primarily practical aim is seen from the fact that the lower people generally worship only those spirits or deities who are supposed to influence human affairs. The real reason why the supreme Beings are not, as a rule, worshiped, is their indiferance to the course of nature and the life of men, [R. Karsten, The origins of Religion, Lon, 1935, p. 20] অর্থাৎ প্রত্যেক আদিম জাতির ধর্মোপাসনার একটি বাস্তব উদ্দেশ্য আছে। তাই যে-সব উপদেবতা

কিংবা দেবতা বা আত্মা মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকে, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ তাঁদেরই উপাসনা করে থাকে। পরমেশ্বর বা দেবাদিদেব ভক্তের ঐহিক সুখদুঃখ এবং প্রাকৃতিক বিষয়ে নিশ্চেষ্ট ও উদাসীন বলে তারা সাধারণতঃ তাঁর আরাধনা করে না। অতএব বলা চলে নিশ্চেষ্ট ও ভক্তের ঐহিক দুঃখে উদাসীন পরমেশ্বর প্রকৃতির দেবতা (supreme Being) শৈব-শক্তির বিরুদ্ধে আদিম ধর্ম প্রবৃত্তি জাত বিভিন্ন ধরণের লৌকিক দেবদেবীর (folk gods and godesses) আবির্ভাব। পরবর্তী যুগে শৈবশক্তির প্রতীক দেবাদিদেব পরমেশ্বর শিব রূপান্তরিত হল ভোলানাথ লৌকিক শিবরূপে। বৌদ্ধ যুগের অবসানের পর হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আবির্ভাবে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের সর্বত্রই বৌদ্ধ ও হিন্দু দেব দেবীর সংমিশ্রণে এক নুতন ধরণে লৌকিক দেব-দেবী বা গ্রাম্য দেব-দেবীর আবির্ভাব হল। বিশেষজ্ঞ-এর অভিমত : there has been a strong tendency in the Tamil country, where Brahmin influence is strong to connect in old village deities with the Hindu Pantheon, and especially with in God Siva, the most popular deity in south India. [H. whitehead. The village gods of south India, Calcutta 1921, P. 133] সুতরাং বলা চলে মঙ্গলকাব্যের যুগে যেসব লৌকিক দেব-দেবী চণ্ডী, মনসা, ধর্ম, অন্নদা, শীতলা, কালিকা ইত্যাদির আবির্ভাব হয়েছিলো তা মুলতঃ লৌকিক, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মের সংমিশ্রিত রূপ। ধর্ম পূজার ইতিহাস সম্পর্কে বলতে গিয়ে এই উপন্যাসের লেখক ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির একটি সভায় 'Discovery of living Buddhism in Bengal নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে ধর্ম ঠাকুর প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ দেবতা। কিন্তু পরবর্তীকালের আরো বিস্তৃত গবেষণার পর দেখা যায় প্রাচীনকালে পুর্বে ভাগীরথী, উত্তরে ময়ূরাক্ষী, দক্ষিণে দামোদর ও পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পার্বত্যভূমি—এই সীমানা বেষ্টিত বিস্তৃত ভূভাগের রাঢ় অঞ্চলে আদি অষ্ট্রাল বা প্রোটো অষ্ট্রালয়েড নামক এক প্রবল অনার্যজাতির অধিষ্ঠান ছিল। ষোড়শ শতকের কবি মুকুন্দরাম এই জাতির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন : অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়। / কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ় "/ ব্যাধ গোহিংসক রাঢ় চৌদিকে পশুর হাড়" ।। অষ্টাদশ শতকের কবি ঘনারাম তাঁর ধর্ম মঙ্গলে লিখেছেন, 'ডোম, রাঢ়, চোয়াড়'। H. H. Risley তাঁর Tribes and casts of Bengal গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের

ডোমগণ মৎস্য পুচ্ছ বিশিষ্ট নরাকৃতি ধর্ম ঠাকুর পূজা করে থাকেন। বৌদ্ধ হিন্দু প্রভাবিত সমাজের বাইরেও পশ্চিমবঙ্গে ধর্মঠাকুরের পূজা প্রচলিত ছিল এবং তার আকৃতি কূর্মমূর্তি নয়। আসলে ধর্মঠাকুর একটি লৌকিক দেবতা এবং তা মূলতঃ সূর্যপূজা,—আদিম সভ্যতার কাল থেকেই এই পূজা প্রচলিত হয়ে আসছে। এ সম্পর্কে বিশেষজ্ঞের অভিমত: "ধর্মঠাকুরের নিকট নিঃসন্তান গ্রামবাসিগণ সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানায়। লোকের বিশ্বাস, অনাবৃষ্টির কালে ধর্মঠাকুরের পূজা দিলে অবিলম্বে সুবৃষ্টি হয়। কুষ্ঠ রোগ হইলে ধর্মঠাকুরের মানসিক করিতে হয়,—পূর্বজন্ম কিংবা ইহজন্মকৃত কোন পাপের জন্য ধর্ম ঠাকুরই কুষ্ঠ রোগ দিয়া থাকেন বলিয়া বিশ্বাস। চক্ষু রোগেও ধর্মঠাকুরের পূজা মানসিক করিতে হয়। মৃতবৎসার সন্তাননাশ নিরোধ করিবার উদ্দেশ্যেও ধর্মঠাকুরের পূজা দেওয়া হইয়া থাকে। [ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য / বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস / ষষ্ঠ সং / পৃঃ ৬২৭]

ধর্মঠাকুরের পূজা সাধারণতঃ তিনটি প্রণালীতে পূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। প্রথমতঃ নিত্যপূজা। যাদের বাড়ি পারিবারিক ধর্মশিলা প্রতিষ্ঠিত আছে তাদের গৃহে নিত্য পূজা ব্যতীত অন্য কোন অনুষ্ঠান সাধারণত দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত বার্ষিক পূজা। বারোয়ারী ধর্মঠাকুরের বাৎসরিক পূজা চৈত্র পূর্ণিমা, বৈশাখী পূর্ণিমা, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমা ও আষাঢ়ী পূর্ণিমাতেই সাধারণতঃ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, পূর্ণিমার নয় দিন পূর্ব থেকেই—'ভক্ত্যা কামান' অর্থাৎ ভক্তদের ক্ষৌর কামান হয় এবং সেইদিন ভক্ত্যাগণ মন্দির প্রাঙ্গনে সমবেত হয়ে তাদের সঙ্কল্প দেয়াশীর নিকট ব্যক্ত করে। তারপর তারা একগাছি করে উতুরী বা উত্তরীয় পায় এবং প্রত্যেক ভক্ত্যার হাতে একগাছি করে বেত দেওয়া হয়। ধর্মশিলার স্নানোৎসব ধর্মরাজ ঠাকুরের বাৎসরিক অনুষ্ঠানের একটি অঙ্গ। ভক্ত্যাগণ পালকিতে করে ধর্ম শিলাটিকে নিয়ে শোভাযাত্রা সহকারে অগ্রসর হয়। বিরাট বাদ্যভাণ্ড, ভক্ত্যাগণ এই শোভাযাত্রাটি অনুসরণ করে। তৃতীয় প্রকার ধর্মপূজার নাম 'ঘরভরা'। রোগমুক্তি কিংবা অন্যান্য কারণে ব্যক্তিবিশেষের নামে মানসিক করে ধর্মপূজার যে আড়ম্বর পূর্ণ বিশেষ অনুষ্ঠান পালন করা হয়ে থাকে তারই নাম 'ঘর-ভরা'। স্নানযাত্রার সময় 'নিয়ম কলসী' পূর্ণ করা হয়। গ্রামবাসীদের বিশ্বাস 'স্নান জলের' 'প্রথম বিন্দু' যে মাথায় ধারণ করতে পারবে সেই নারী এক বৎসরের মধ্যেই সন্তানবতী হবে। এরই প্রত্যাশায় শত শত বন্ধ্যা নারী ওই সময় সমবেত হয়। বিশেষজ্ঞের অভিমত এই যে: ধর্মঠাকুর সূর্য দেবতার প্রতীক— আদিম সমাজে

সূর্যই উৎপাদন শক্তির মূল উৎস বলে বিবেচিত হয়—এই উৎপাদন অর্থে পৃথিবীর শস্যোৎপাদনও যেমন বুঝায়, নারীর সন্তানোৎপাদনও তেমনি বুঝায়। পৃথিবী এবং নারী উভয়েই সূর্যের শক্তি দ্বারাই এক জন শস্যোৎপাদন ও আর একজন সন্তানোৎপাদন করিয়া থাকে বলিয়া বিশ্বাস, বাংলা দেশ বিশেষতঃ ভাগীরথী তীরবর্তী অঞ্চলে হিন্দু প্রভাব বশতঃ আদিম সমাজের এই সূর্যদেবতাই শিবরূপে পরিণতি লাভ করিয়াছেন।" (প্রাগুক্ত গ্রন্থ পৃঃ ৬৩০)

ধর্মরাজের শোভাযাত্রায় এককালে যে জাঁক-জমক ছিল অন্ততঃ যে যুগে ডোম বাগ্দী সমাজ উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিল সে যুগে এই সমাজের পৃষ্ঠ পোষকতায় ধর্মরাজের গাজনের শোভাযাত্রা যে বিশাল জাঁকজমক পূর্ণ হবে তাতে আর বিচিত্র কি। লেখক 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে লোকায়ত ধর্মের এই বিচিত্র লোক উৎসবের জাঁকজমক পূর্ণ শোভাযাত্রা পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন। যথা: "৩টার সময় রাজবাড়ীতে গাজনের সাজন হইল। মূল সন্ন্যাসীর মাথা নেড়া, লম্বা দাড়ী, গোঁপ কামান, গায়ে আলখাল্লা, তাঁহার গায়ে ছোট ছোট নানা রঙের রেশমের, পাটের বাকলের টুকরা লাগান। তাঁহাকে রাজা আসিয়া নমস্কার করিলেন এবং তাঁহার হাত ধরিয়া একটা হাতীর হাওদায় তুলিয়া দিলেন। খুব সাজান একটা হাতী, সর্ব্বাঙ্গে শিঙার করা, বড় বড় রাঙ্গা রাঙ্গা শাদা শাদা কাল কাল ডোরা দেওয়া, তাহার উপর কিংখাপের হাওদা, হাওদার চারিদিক দড়ী দিয়া ঘেরা খুব জাঁকাল, খুব জমকালো।"

গাজনের বিচিত্র বর্ণনা: এই বার গাজন। প্রথমে একদল বাজন্দার,—ঢাক, ঢোল, কাড়া, নাকারা লইয়া যাইতে লাগিল। এ দল লড়াইয়া বাজন্দার; জাতে মুচি—খুব চোটে বাজাইতে লাগিল। তাহার পিছনে একদল পদাতিক সৈন্য—ছয় জন করিয়া সারি; মালকোচা মারা, মাথায় বাবরীকাটা ঝাঁকড়া চুল, তাহার উপর বাঁধা পাগড়ী, হাতে বাঁশের লাঠি। তাহার পিছনে আবার একদল মুচি বাজন্দার। পিছনে ঘোড় সোয়ার—চারিজন করিয়া এক এক সারিতে; সোয়ারদের গায়ে আঙরাখা, মাথায় মাথা ঢাকা পাগড়ী ও হাতে লম্বা লম্বা বল্লম; ফলাগুলি খুব সাজান, চক্ চক্ করিতেছে, তাহার উপর সূর্যকিরণ পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে।" শোভাযাত্রার জাঁকজমকের সঙ্গে সঙ্গে আছে লোকায়ত সঙ্ এবং নানা লৌকিক নাট্যানুষ্ঠানের ট্যাবলো। তারও সুন্দর বর্ণনা লেখক উপস্থিত করেছেন: "ইহাদের পর কয়েকখানা গোরুর গাড়িতে সঙ—বানর, রাক্ষস, যক্ষ, কিন্নর, মারসেনা, মার কন্যা, তাহার ওপরে কতকগুলি 'চৌপাল্লায়' নাটক।

বিশেষ বেশন্তর নাটক ; এই নাটক দেখিলে এখনও তিব্বতীয়গণ উন্মত্ত হইয়া উঠে, তখনকার বাঙ্গালীদের ত কথাই নাই।……তাহার পর গুরুদেবের হাতী ; তাহারও পিছনে গুরুদেবের সাঙ্গ পাঙ্গ খোল করতাল লইয়া কীর্তন করিতে করিতে দেহতত্ত্বের গান গাইতে গাইতে যাইতেছেন। তাহার পিছনে নেড়া-নেড়ীর দল……এই রূপে নানা সম্প্রদায়ের গুরু চলিয়া গেলে দেব দেবী আসিলেন, সব এক এক খোলা ঘোড়ার রথে। আসিলেন গণেশ, দুর্গা, সূর্য্য, বিষ্ণু, শিব, কৃষ্ণ, রাম, নানা রকমের সঙ। তাহার ও পিছনে হই-হাই, লোকজন, রঙ্গ তামাসা—ফষ্টি।"

গাজন এর দর্শক বৃন্দের একটি নিখুঁত রেখা চিত্র এবং তাদের প্রতিক্রিয়ার রূপ লেখক অঙ্কিত করেছেন : 'গাজন প্রায় এক মাইল লম্বা। গাজন চলিল, রূপা রাজার এমনি দবদবা, সবাই যে যাহার কাজ, তাহাই করিতেছে, কেহই কোন রূপ গোলমাল করিতে পারিতেছে না। গাজন সরস্বতীর ধারে আসিল। দেখা গেল, মাস্তুলে, মাস্তুলে লোক এক দৃষ্টে গাজন দেখিতেছে ; মাস্তুলের মাথার কাছে মাচা বাঁধিয়াছে—শুদ্ধ গাজন দেখার জন্য—দুই এর উপর মাস্তুলের দড়ি ধরিয়া, নদীর পাড়ে গাছের উপর উঠিয়া, অগণ্য লোক গাজন দেখিবার জন্য কতক্ষণ ধরিয়া বসিয়া আছে। গাজন নৌকায় পৌঁছিলে গাজনের ভরে নৌকা টলিতে লাগিল। …এবার সাতগাঁ এর পথে গাজন। গাঁয়ের পথে ঢুকিবামাত্রই উপর হইতে খই পড়িতে লাগিল, ফল পড়িতে লাগিল, অনেক মাঙ্গল্য দ্রব্য পড়িতে লাগিল।"

বিহারীদত্ত সমুদ্রযাত্রা করেছে। সঙ্গে স্ত্রী-কন্যা আছে, দু চার দিন পর মেয়ে ডাঙার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছে। পাঁচ সাত দিনের পর যখন একটা কাল দাগ সমুদ্রের মধ্যে দেখা দিল মেয়ে মাঝিকে জিজ্ঞাসা করল যে ওটা কি। মাঝি তার উত্তরে বললো যে ওটা রাক্ষসের দ্বীপ। ওখানে যারা থাকে তারা কাঁচা মানুষ খায়।' তখন মাঝি দ্বীপের আদিম অধিবাসীদের সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা শুরু করলেন : "ও দেশে তাহারা প্রায়ই যায় না। ও জায়গাটা তাহারা বাঁয়ে ফেলিয়া সরাসর দক্ষিণ দিকে চলিয়া যায়। একবার গিয়াছিল ; ঝড়ে নৌকা বাঁধিবার জন্য গিয়াছিল। অনেক রাক্ষস আসিল। তাহারা একেবারে নেংটা থাকত, কেউ কেউ একটা পাতার কাপড় পরে। যেমন সাল পাতার কাঁটা দিয়া খাবার পাত্র হয়, সেই রকম পাতায় কাঁটা দিয়া কাপড় করে, তাই পরে। তাও সকলে নয়। তারা মাছ ধরিয়া খায়, শিকার করিয়া মাংস খায়, আর একলা-দোকলা মানুষ পাইলেও খাইয়া ফেলে।" উপরোক্ত বর্ণনাটির

মধ্য দিয়ে লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর আদিম জনজীবন ও লোকায়ত জীবন সম্পর্কে ধারণাটি আমাদের স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন দ্বীপে এই ধরনের বহু নরখাদক আদিবাসী বসবাস করে যারা কাঁচা মাংস খায় এবং উলঙ্গ হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

'চণ্ডীমণ্ডপ' গ্রাম বাংলার একটি লোক সমাজের মিলনস্থান। লোকায়ত সংস্কৃতির কেন্দ্রভূমি এই 'চণ্ডীমণ্ডপ'। এখানে যাত্রা গান কথকতা মনসার ভাসান চণ্ডীর গীত ইত্যাদি বিচিত্র ধরনের লৌকিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই চণ্ডীমণ্ডপের একটি বিশেষ গঠন কৌশল আছে যাকে বলা চলে 'লোকায়ত বাস্তু স্থাপত্য শিল্প'। বাংলাদেশের কুটীর গঠনের যেমন একটি নিজস্ব লৌকিক রীতি আছে। ঠিক তেমনি মন্দির বা চণ্ডীমণ্ডপ গঠনের একটি নিজস্ব 'লৌকিক স্থাপত্য প্রকরণ' আছে যাকে লোকশিল্পের (folkart) এর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। প্রাচীন বাংলা দেশেও এই রীতিগুলি কত সজীব ছিল 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে ভুরস্থট নগরের একটি মন্দির ও চণ্ডীমণ্ডপের বর্ণনায় তারই সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। মন্দিরের শিল্প রীতির বর্ণনা: "সব বাড়ীতে একটি না একটি মন্দির আছে। সকলের চেয়ে বড় মন্দিরটির নয়টি চূড়া—"নবরত্ন" বলে। মন্দিরটির সর্বত্র ইট আঁকা বাঁকা হইয়া উঠিয়াছে, আর দরজার ঠিক মাঝখানে মাথার উপর দুইটি ফণা মিলিয়া আছে। এই সর্প মুখোমুখী রাখার নাম কুলকুণ্ডলিনী। দরজার উপরে যে কার্ণিস আছে, তাহাতে দুইটা হাঙ্গর আঁকা। হাঙ্গর দুইটা লেজ জড়াইয়া দুই দিকে মুখ করিয়া আছে। মন্দিরে রোজ পূজা হয়, দেবীর নাম ভবাণী।"

চণ্ডীমণ্ডপের লৌকিক স্থাপত্য রীতি ও সাজ-সজ্জায় একটি নিখুঁত বর্ণনা লেখক উপস্থিত করেছেন এবং এর থেকেই বোঝা যায় মোটামুটি ভাবে এই একই রীতি বহুদিন এদেশে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও চলে আসছে। বর্ণনাটি এই: "চণ্ডীমণ্ডপটির উত্তর পশ্চিম ও পূর্ব দিক মাটির দেওয়াল দিয়া ঘেরা—বড় বড় পাট, নয় দশ পাট উঠিয়া পাট শেষ হইয়া গিয়াছে। মাটির দেওয়ালের উপর খুব যত্ন করিয়া খড়িটী করা। তুঁষ, পাটের কুচা, আর কাদা খুব মিহি করিয়া ছানিয়া তাই দু আঙ্গুল পুরু করিয়া দেওয়ালের উপর বসান, আর বেশ করিয়া পিটিয়া দেওয়া। খড়িটি করা দেওয়ালের উপর রোজ আগাগোড়া নিকান হয়—দেখিতে তক্-তক্ করে। চণ্ডীমণ্ডপটি দক্ষিণ দিকেও দুই ধারে দুই হাত করিয়া দেওয়াল দেওয়া। মাঝে যেটুকু ফাঁক, সেটুকুতে দুইটা মোটা মোটা শালের খুঁটি তাহার উপর বিচিত্র কাজ করা। কাঠের উপর নক্সা করিতে ভুরস্থটের লোক

সিদ্ধহস্ত ছিল।" লেখক এই চণ্ডীমণ্ডপের লৌকিক বাস্তুশিল্পের আরও যে খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছেন তাতে লেখকের লোক শিল্প সম্পর্কে জ্ঞান যে কত গভীর ছিল তা বেশ বোঝা যায়। "খুঁটি দুটির উপর দুইখানি আড়া, আর দক্ষিণের দেওয়াল দুটির উপর দুইখানি আড়া, এই চারি আড়ার উপর চারিখানি প্রকাণ্ড চালা। আড়ার শাল কাঠেও কাজ করা। আড়ার উপর তীর, তার উপর আবার আড়া, তাহার উপর মাঝখানে একটি তীরের উপর মাথালির বাঁশ। চণ্ডীমণ্ডপের সামনে, বারান্দার দক্ষিণ দিকে সব শালের খুঁটি, পূর্ব-পশ্চিম সব খোলা। পূর্ব-পশ্চিমদিকের শেষে দুটি মাটির তাকিয়া করিয়া দেওয়া আছে। কেউ ইচ্ছা করিলে তাহাতে হেলান দিয়া বসিতে পারেন। চালগুলি পরিষ্কার করিয়া শণের পুতালি দিয়া ছিটান। রোয়াগুলি নানারূপ রং করা। সলাগুলি বেশ মাজা-ঘসা ও রং করা।"

উনবিংশ শতকের প্রথম দিকে বাংলাদেশে ছাপাখানা প্রতিষ্ঠার পূর্বে একটি লৌকিক রীতিতে পুঁথি তৈরী করা হত, পুঁথি লেখার পূর্বে তালপাতার দ্বারা কিভাবে পুঁথি তৈরী হতো তার একটি লৌকিক রীতিকে লেখক 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে উপস্থিত করেছেন। তাঁর এই বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে বাংলাদেশে কোন নিজস্ব লৌকিক রীতিতে তালপাতার দ্বারা পুঁথি তৈরী হোত। সিদ্ধল গ্রামের ভবদেব বিরাট পণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ মানুষ। তাঁর বাড়িতেই বিরাট টোল। সেখানে পুঁথি তৈরী হোত। তার বর্ণনা: "গালিচার বাহিরে থাকিত রাশীকৃত তালপাতা। তালগাছের মাজ—পাতা কাটিয়া ছয় মাস পুকুরের পাঁকে পুঁতিয়া রাখা হইত। ইহার নাম 'পাকান'। পরে এই পাতা দুধে সিদ্ধ করা হইত, শাঁখ দিয়া ডলা হইত, তাহার পর কাঠী বাদ দিয়া পাতাগুলিকে সমান করিয়া কাটা হইত, তাহার পর তালপাতার আড় দীর্ঘ বুঝিয়া কোনটির ঠিক মাঝখানে একটি ছিদ্র করা হইত; ঐ ছিদ্রের ভিতর দিয়া সরু পাকান দড়ি চালাইয়া দেওয়া হইত, সেই দড়িতে তালপাতাগুলি বাঁধা হইত। যদি পাতাগুলি লম্বায় বেশী হইত, তবে জায়গায় দুইটি ছিদ্র করা হইত, আরও বেশী লম্বা হইলে তিনটি ছিদ্র করা হইত। পুস্তক বিশেষে ঠিক মাঝখানে ছিদ্র না করিয়া একটু বামের দিকে ছিদ্র করা হইত। বৌদ্ধেরা প্রায়ই বামের দিকে ছিদ্র করিত। পুঁথি লেখা হইলে, পাঠের পুঁথির দড়িতে একটি তালপাতের ময়ূর লাগাইয়া রাখা হইত। পড়িতে পড়িতে হঠাৎ উঠিয়া যাইতে হইলে, ময়ূরটি পাতায় দিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া যাইতে হইত, নতুবা কোথায় থাকিল, ঠিকানা পাইবে কিরূপে?"

এই ভাবে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে অসংখ্য লৌকিক উপাদান একত্রিত করেছেন, লোকায়িত জীবন, সমাজ ও মানুষের বৈশিষ্টগুলি যে যুগ যুগ ধরে বাংলা দেশের মধ্যে প্রবাহিত হয়ে আসছে তারই এক সার্থক রেখা চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক তাঁর উপন্যাসটির মধ্যে। দশম শতকের হিন্দু বৌদ্ধ যুগের পটভূমিকায় সংস্থাপিত করে সে যুগের লোক উৎসব, লোকধর্ম, খাওয়া-দাওয়া, লোক উৎসবের শোভাযাত্রা' লোকবাস্তবিজ্ঞান, লোক শিল্পের নানা বৈশিষ্ট্যকে সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন, এতে একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে লোকসংস্কৃতির এইসব উপাদানগুলি যুগে যুগে তার বৈশিষ্ট্যগুলি বদল ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আজও সমাজ দেহে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সেই অর্থে লোকায়ত সমাজ ও সংস্কৃতি যে কথা বলা যায় যে লোকসংস্কৃতি হচ্ছে Living Fossile তা এক আর্য যথার্থ। বিশেষ করে 'গাজনের' যে লৌকিক চিত্র অঙ্কন করেছেন তা আজকের বিংশ শতকের যে কোন গাজনের প্রসঙ্গে প্রযোজ্য। অর্থাৎ এই যে সেকালে বাগদী বা ডোমরাজার পৃষ্ঠপোষকতা এই সব নিম্নশ্রেণীর লৌকিক অনুষ্ঠান যে জাঁকজমকে এবং বর্ণাঢ্য হয়ে উঠতো আজ আর সেই রাজ পৃষ্ঠকতা না পাওয়ার জন্য এই সব লৌকিক অনুষ্ঠানগুলি আর তেমন 'জাঁকজমক পূর্ণ হয় না, তবে এই সব লৌকিক উৎসব, ধর্মের মেলা আজও' বাংলার লোকায়ত সমাজে গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়, সে দিক দিয়েও যুগের ঐ লোকায়ত চিত্র সত্যই উপভোগ্য।

॥ রায়বাড়ী ॥ (১৯৭৪)

'রায়বাড়ী' একটি বিস্মৃত প্রায় উপন্যাস। লেখিকা গিরিবালা দেবী এককালের নারায়ণ, ভারতবর্ষ, প্রবাসী, মাসিক বসুমতীর নিয়মিত লেখিকা ছিলেন তারপর বেশ কিছুদিন পরে 'প্রবাসী' পত্রিকায় তাঁর আত্মজীবনী মূলক উপন্যাস 'রায়বাড়ী' প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি কয়েক বছর পূর্বে প্রকাশিত হলেও লেখিকা যেহেতু প্রবীণা তাই তাঁর গ্রন্থটিতে পঞ্চাশ ষাট বছর পূর্বের পূর্ববাংলার পারিবারিক জীবন কি ভাবে লৌকিক ভাবধারায় সুসমৃদ্ধ ছিল তার একটি নিখুঁত চিত্র লেখিকা 'রায়বাড়ী' গ্রন্থটিতে উপস্থিত করেছেন। এই অধ্যায়ের পূর্বালোচিত গ্রন্থ 'বেণের মেয়ে' গ্রন্থে লেখক হরপ্রসাদ শাস্ত্রী দশম শতাব্দীর বাংলাদেশের হিন্দু বৌদ্ধ যুগের লোকায়ত জীবন ও জীবনচর্যার একটি বিস্তীর্ণ পরিচয় উপস্থিত করেছেন। সেখানে বৃহত্তর রাষ্ট্রীয় ও সমাজ জীবনের স্পন্দনটিকে দেখানো হয়েছে সেকালীন

আচার-আচরণ লোকবিশ্বাস, লোকশিল্পের উপাদানে সমৃদ্ধ করে। কিন্তু এই লোকায়ত সংস্কৃতির ধারা আজও বাংলার গ্রামীণ জীবনধারার মধ্যে অবস্থান করে তার সংহত সংযত জীবন চেতনাকে আরো সুসমৃদ্ধ করে তুলছে তার পরিচয় আছে 'রায়বাড়ী' উপন্যাসটিতে। অবিভক্ত পূর্ব বাংলার একটি একান্নবর্তী বনেদী হিন্দু পরিবারকে কেন্দ্র করে লেখিকা ওই অঞ্চলের যাবতীয় প্রবাদ প্রবচন, পুজা-পার্বণ, বারব্রত, লোকাচার, আহার বিহার ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির বিচিত্র উপাদানকে সুসংহত করেছেন। আধুনিকতা এবং অনুকরণ প্রবণতার প্লাবণে আজ আমাদের কৃষ্টি, সামাজিক রীতি নীতি আচার ব্যবস্থার, বারব্রত, পুজাপার্বণ লোক সংস্কৃতির সমস্ত কিছু বিস্মৃতির অতল গহ্বরে তলিয়ে যাচ্ছে—সে দিক দিয়ে এই উপন্যাস খানির মধ্যে হারিয়ে যাওয়া সমাজ ব্যবস্থার চিত্র ও লোকায়ত জীবনধারার বিচিত্র উপকরণ এবং উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায়। ভূমিকাতে ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন: "লোক সাহিত্যের কতকগুলি মূল্যবান উপাদান যেমন ছড়া, প্রবাদ এবং ব্রতকথা ইহারা স্ত্রী সমাজ কর্তৃকই রচিত এবং কেবলমাত্র অন্তঃপুরিকার জীবন অবলম্বন করিয়াই বিকশিত হইয়া থাকে। উপন্যাস খানি তাহাদের একটি অমূল্য ভাণ্ডার। যে সকল ছড়া এবং প্রবাদ আজ পর্যন্ত কোথাও প্রকাশিত হয় নাই, আমি এই উপন্যাস খানিতে তাহাদের সন্ধান পাইয়া অত্যন্ত উপকৃত হইয়াছি। সেগুলি আমার সঙ্কলনের জন্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি।" লোকসাহিত্য সংগ্রহ এবং তার উপাদান বিচারের একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি আছে। ডঃ ভট্টাচার্য নিজে একজন লোকসংস্কৃতি বিশেষজ্ঞ এবং লোকসাহিত্য সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পথিকৃৎ। তিনি এই গ্রন্থটিকে কেন লোকসংস্কৃতির উপাদানের আকরগ্রন্থ বলেছেন তার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিটি হচ্ছে এই: বিশেষতঃ আমরা অন্যত্র ইহাদের যে সংগ্রহগুলি পাইয়া থাকি, তাহা ইহাদের প্রয়োগ ক্ষেত্র হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে পাই বলিয়া ইহাদের রস যথাযথ উপলব্ধি করিতে পারি না। কিন্তু এখানে ইহাদের প্রত্যেকটিকেই ইহাদের নিজস্ব প্রয়োগ ক্ষেত্রেই আমরা সন্ধান পাই। কি পরিবেশে এক একটি ছড়া কিংবা প্রবাদ উচ্চারিত হইয়া থাকে, তাহা এখানে নির্দেশ করা হইয়াছে বলিয়া এই সংগ্রহের মূল্য অন্যান্য যে কোনও মামুলি সংগ্রহের চাইতেই অধিক।" 'রায়বাড়ী' উপন্যাসখানি প্রসঙ্গে ভূমিকাকারের সিদ্ধান্ত: সুতরাং বর্তমান উপন্যাসখানি এক ধারে উপন্যাস এবং সমাজতত্ত্ব ও লোকসাহিত্যের আকর গ্রন্থ। তারপরও ইহা বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি নির্ভরযোগ্য দলিল।"

বাংলার উপন্যাসের পর্যালোচনায় দেখা যায় বাংলা উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকগণ বাঙালী জীবনের ব'হুমূ'খী নানা বিষয় নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছেন, কিন্তু শরৎচন্দ্র ছাড়া অন্য কোন ঔপন্যাসিকগণের দৃষ্টিতে বাঙালী পরিবারের অন্তর্মুখী জীবন উপেক্ষিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের ক্ষেত্রেও দেখা যায় তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য বিষয় নিয়ে যে মান অভিমান, বিরহ মিলন, বিবাদ বিসংবাদ অনুষ্ঠিত হয় তার চিত্রও যেমন অঙ্কন করেছেন, ঠিক তেমনি সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সংঘর্ষের চিত্রটিও স্পষ্ট করে দিয়েছেন এবং তার ফলে পারিবারিক জীবনে যে কি বিষম দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়েন উপস্থিত হয় তারও একটি নাটকীয় রূপ অনেক উপন্যাসেই বিধৃত করেছেন। কিন্তু যেহেতু শরৎচন্দ্র মূলতঃ পুরুষ অন্তঃপুরের সঙ্গে তাঁর সেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক হতে পারে না সেজন্যে চেষ্টা এবং আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও বাঙালী মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারের নারী জগতের নিখুঁত রেখাচিত্র তাঁর আঁকা সম্ভবপর হয়নি। তাই শরৎচন্দ্র এবং অন্যান্য সামাজিক উপন্যাসের লেখকগণ বাঙালী পরিবারের ও সমাজের একটি বহির্মুখী পরিচয়, কোন কোন ক্ষেত্রে একটি অংশের কথাই উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন। অন্তর্মুখী এবং বহির্মুখী উভয় বিষয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার অভাবই তাঁদের একটি পরিপূর্ণ সামগ্রিক সমাজ ও পরিবারের জীবন ভিত্তি উপন্যাস রচনার অন্তরায় হয়েছে।

কিন্তু 'রায়বাড়ী' উপন্যাসটি বাঙালী একান্নবর্তী পরিবারের একটি গৃহবধূর আত্মকথা। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই বাঙালীর অন্তঃপুর জীবনের একটি অলিখিত দিক এখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। একদিন বাঙালীর গ্রামীণ জীবনের ভিত্তি মূলে কোন লোকায়ত সমাজ জীবন অবস্থিত ছিল তার পরিচয় এই উপন্যাসে উপস্থিত। লেখিকা যেহেতু নারী এবং পূর্ববঙ্গের একটি বৃহৎ বনেদী পরিবারের অন্তঃপুরচারিনী বধূ, সেই হেতু সেই হারিয়ে যাওয়া বৃহৎ বঙ্গের একটি অঞ্চলের অন্তঃপুরের একটি নিখুঁত লৌকিক চিত্র এখানে অঙ্কিত হয়েছে। বাংলা দেশের সমাজ জীবনে নারীর একটি প্রধান ভূমিকা আছে। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর অধিকার বিশেষ ভাবে স্বীকৃতি দেয়। আর্যদের এ দেশে আসার বহু আগে থেকেই কয়েকটি অত্যন্ত শক্তিশালী মাতৃতান্ত্রিক আদিবাসী অনার্য জাতি এখানে বসবাস করতো। পরবর্তী যুগে আর্যদের পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে অনার্যদের মাতৃতান্ত্রিক সমাজের সংমিশ্রণের ফলে বাংলাদেশের পারিবারিক জীবনে যে সামাজিক বৈশিষ্ট্যটি দেখা গেল তা হচ্ছে পরিবার সংগঠনের শীর্ষে পুরুষের

স্থান নির্দিষ্ট হলো বটে, পারিবারিক জীবনের কেন্দ্র ভূমিতে নারীর অধিকার কিন্তু মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার মতোই রয়ে গেল। পুরুষ কর্তার নামে 'পরিবার পরিচিত হতো বটে, নারীই ছিল সেই পরিবারের কেন্দ্রীভূত পরিচালিকা শক্তি। আর সেই পরিচালনার কেন্দ্রভূমি ছিল পরিবারের. অন্তঃপুর। বাংলা দেশের বাইরের সমাজ জীবনের নানা পরিবর্তন ঘটেছে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে কিন্তু পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রস্থ ক্ষেত্র অন্তঃপুরটি কিন্তু আজও তার আদিম লোকায়ত রূপটি অব্যাহত রেখেছে। 'রায়বাড়ী' উপন্যাসের বাঙালীর পারিবারিক জীবনের এই সংহত সংযত অবিচ্ছিন্ন অন্তঃপুরের এই লোকায়ত চিত্রটি সার্থকভাবে উদ্ঘাটিত।

শ্রীযুক্তা গিরিবালা দেবী একদিন নিজে অন্তঃপুরের যে জীবন যাপন করেছেন সেই অন্তঃপুর জীবনের একটি নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করেছেন বলে এই উপন্যাসটির মধ্যে কতকগুলি অতিরিক্ত গুণও প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের দেশে দাস-দাসী আত্মীয়-অনাত্মীয়, অতিথি-কুটুম্ব পরিবৃত হয়ে একটি বৃহৎ যৌথ পরিবার যে কিভাবে লোকজীবনের কেন্দ্রশক্তি নারীর দ্বারাই পরিচালিত হয় তার একটি নির্ভরযোগ্য দলিল এই উপন্যাসটিতে পাওয়া যায়। বাংলার সামাজিক বিবর্তন একটি মূল্যবান গবেষণার বিষয়। আমাদের দেশে সমাজতত্ত্ব সম্পর্কে গবেষণা এখনও যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করে নি, সেদিক দিয়ে ভবিষ্যতের সমাজতত্ত্ব গবেষণায় এই গ্রন্থটি নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহক (Source book) গ্রন্থ বলে বিবেচিত হবে।

পূজা আসন্ন। রায়বাড়িতে কোলাহল ও ব্যস্ততার সীমাসংখ্যা নাই। পূজার আয়োজনের মধ্যে বাঙলাদেশে এককালে প্রচলিত লোকায়ত সমাজের খাদ্য দ্রব্যের আয়োজন। লেখিকার ভাষায়: "আজ মুড়কি, মোয়া, ছাতুর নাড়ু, গুড়ের কাজ সারিয়া রাখিতে হইবে। আগামী কাল হইতে ক্ষীরের ও নারিকেল পর্বের সূচনা, দুই কাঠের উমুনে বিরাট পিতলের কড়ায় টগবগ করিয়া গুড় ফুটিতেছে! ঘন গুড়ের সুবাস বাতাসে চারিদিকে ছড়াইয়া দিতেছে, মুড়কি শেষ হইয়াছে। এবার চলিতেছে মোয়ার সমারোহ। মুড়ির মোয়া, ঢ্যাপের মোয়া, ভাজা চিড়ার মোয়া, খইয়ের মোয়া।" একটি গ্রাম্যলৌকিক সংস্কার: "সরস্বতী বলিল, "ঠাকুমাকে ছোঁয়া কাপড়ে পূজোর সুপুরি কাটা চলবে না।" মধুমতী হাসিল, "তোমার সুপুরি ঝাঁকায় করে কারা এনে দেয় মেজদি? তারা না

মুসলমান ?" মেজদি রুষ্ট স্বরে বলিল, "কাগজের টোঙায় বাঁধা জিনিষ নৌকায় জলের উপর দিয়ে আনলে দোষ হয় না।"

বৌ যখন কাজ পেল না। তখন ঠাকুমার সংলাপে ঐ সব সংস্কারের প্রতি তুচ্ছোক্তি প্রকাশ পেয়েছে: "শোন্ বৌ' তোরে বুঝি নিয়মের কাজে ওরা হাত দিতে দিলে না ? তুই যে আমার কাছে এসেছিলি তখন, আমার যে জাত গেচে লো, যত জাত আছে তোর ঐ আচারী মেজ ননদের, ও হল গে—'আচারী বামনি বচন মিঠে, দশ কাঠা চালের এককাঠা পিঠে।'

গ্রামের লৌকিক আচার, ঠাকুমার ভাষায়: ঢেঁকিতে কোটা-কাটা যার যা আছে ঐ ইবেলা সেরে তেরে রেখে দে বাপু। ষষ্ঠীর ঘটবসালে ঢেঁকিতে পাড় দিতে নেই, ক্ষার বোল করতে নেই। লক্ষ্মীপুজো না হওয়া অবধি এ নিয়ম মানতে হয়।"

বাঙালীর মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের মধ্যে গিন্নীর স্থান প্রধান। কর্তার ভূমিকা মূলতঃ বাহ্যিক ভূমিকা। কিন্তু গৃহিণীর ভূমিকা একেবারে লোকায়ত সমাজের পারিবারিক জীবনের কেন্দ্রস্থল অন্তঃপুরে। এক গৃহিণী বৃদ্ধ হয়, জ্যেষ্ঠ সন্তানের স্ত্রী গৃহিণী হয়, পদ মর্যদার রূপান্তর ঘটে বটে, কিন্তু পদের কোন পরিবর্তন হয় না। ক্ষমতা কর্তৃত্ব এক হস্ত থেকে অপর হস্তে গমন করে বটে, কিন্তু গৃহিণীর পদটি একান্নবর্তী পরিবারের ক্ষেত্রে অচল অটল থেকে যায়। লেখিকা ঠাকুমার গৃহিণীত্বের অবসান ও কর্তৃত্বের পরিবর্তনটি সার্থকভাবে ধরে ব্যাখ্যা করছেন: কালের কুটিল গতি, যিনি একদিন এখানকার সর্বময়ী কর্ত্রী ছিলেন তিনিই আজ সামান্য বেতনভুক ভৃত্যকে আদেশ করিতে ভুলিয়া গিয়াছেন। সময়ে ভেকের লাথিও হস্তীকে সহ্য করিতে হয়। তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই বোধ হয় ঠাকুমা যখন তখন ছড়া কাটেন 'হাতীরও পিছলে পা, সুজনেরও ডোবে না।' দাস দাসীরা স্বেচ্ছায় তাঁহার আদেশ পালনের পাত্র নহে, কিন্তু সম্মুখেই মহামান্য বড় জামাতা তাঁহার খাতিরেই বিরক্ত ভাবে নবীনকে যাইতে হইল।" এই গৃহিণীত্বের এই পরিবর্তনে পুরাতন যারা, তারা তাদের অভিজ্ঞতাকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে করে। তাই প্রকৃত গিন্নীর লক্ষণ বর্ণনা করেছেন ঠাকুমা: সেকালের গিন্নীদের সকল দিকে নজর রাখতে হত যে। একালের গিন্নীরা খালি ভাবে, 'আমি গিন্নি হব কালে, তেল বিলাব খাবলা খাবলা, পান বিলাব গালে।' তাতেই জয় জয়কার। আমার সাথে ওরা পারবে কেন ? ওরা কাঁচা আমি পাকা—

আমি বিন্দে নাম ধরি, জানি কত ছল,
জলে আগুন দিতে পারি, অগ্নি করি জল।"

এরপরই একটি আশীর্বাদের ভাষা এবং লৌকিক ঐতিহ্যানুযায়ী রূপ। ঠাকুমা হেমন্তকে আশীর্বাদ করছে: "তুমি আমার একটি বড় কাজ করলে দাদা, আমি তোমারে আশীর্বাদ করি, আমার মাথার যত চুল এত তোমার পেরমাই হোক, তুমি নতুন খেয়ো পুরোনো পরো, শিলে ছেঁচে পান খেয়ো লাঠি ভর দিয়ে বেড়িয়ো। ভাগ্যি আমার পাকা চুলে সিঁদুর পরবে। জন্ম জন্ম মাছে ভাতে থাকবে।"

ঠাকুমা চরিত্রটি বৃদ্ধা, বনেদী জমিদার বাড়ির প্রাক্তন গৃহিণী। প্রবাদে প্রবচনে ছড়ায় শ্লোকে একেবার লোকায়ত চরিত্রের সার্থক দৃষ্টান্ত। আজ তাঁর কর্তৃত্ব নাই, সংসারে তাঁর আধিপত্য চলে গেছে, কিন্তু সম্বল আছে জীবন অভিজ্ঞতা—ছড়া শ্লোকের হাস্য পরিহাসে জীবনকে সরস করে রেখেছে এই সব প্রাচীন এর দল। দেবী চৌধুরানী উপন্যাসের ব্রহ্ম ঠাকুরাণী কিংবা পথের পাঁচালীর ইন্দির ঠাকরূণ লোকায়ত জীবনোভিজ্ঞতার মূর্ত প্রতীক। কখনও সমাজের বলি হয়ে, কখনও বয়সের ভারে পরিত্যক্ত হয়েও এই লোকায়ত জীবন চেতনার গুণে এরা পারিবারিক জীবনে একটি বিশেষ ঠাঁই করে নিয়েছে। বউ-ঝিরা যখন জল তোলপাড় করছে তখন ঠাকুমার একটি সংলাপ উপস্থিত করলে লোকায়ত জীবনোভিজ্ঞতার কোন রসে তাঁরা রসিক ছিলেন তা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং প্রবাদ প্রবচন ও ছড়ায় তাদের লোকায়ত ভাষা কিরূপ সরস ও সমৃদ্ধ তারও পরিচয়টি প্রকাশিত হবে। যথা: "ওলো ছুঁড়ীরা, আর কতক্ষণ জল তোলপাড় করবি। এখন উঠে আয়। 'ডুব দিলেই যদি হয় ধর্ম, তবে পানকৌড়ির কিবা কর্ম ?' জলে বেশিক্ষণ থাকিস নে, ম্যালেরিয়া ধরবে। নালের ডাঁটা তুলিস নে, ওতে ত নালের অম্বল হবে না, দুটো খানিকের কর্ম নয়, এ বাড়ীতে। খাবার সখ হলে খাল, বিল থেকে আনিয়ে দেব বোঝাখানিক, পরাণ ভরে খাস, আর দুজনা দুজনের কানে কানে কোস—

নালের অম্বল পান্তাভাত খেলেম বড় সুখে,
বিছানা ভালো, সোয়ামী কালো, মলেম মনের দুখে।
কাগজ কাটা, উলকি ফোঁটা কার লেগে বা পরি ?
কালো সোয়ামী চাই না আমি দহে ডুবে মরি।"

বধূ বিণু সাঁতার কাটার অপরাধে বকুনী খাইয়াছে। লেখিকা তার মনকে অনুসরণ করে বাংলার ছায়া ঢাকা অন্য এক সুশীতল গ্রামে অনুগমন করেছে: "সে এক পাখী ডাকা, ছায়া ঢাকা খণ্ড গ্রাম, যাহার পরিবেশ স্নিগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তটিনীর নির্মল প্রবাহ। তাহাকে করুণময়ী, শান্তিময়ী গ্রামলক্ষ্মী, নাম দিলেই যেন অধিক শোভন হয়। তাহার ভাঙন নাই, উদ্দামতা নাই, তীর ভূমির প্রতি তাহার অপরিসীম মমতা তাহার জোয়ার ভাঁটার কত রূপ, বর্ষায় কি বিপুল সমারোহ।……ভাসিয়া যায় ছোট বড় অসংখ্য নৌকা। কোন খানায় শুভ্র পাল, কোনটায় রঙ্গীন। বৈঠার হটর হটর শব্দের তালে তালে ভাটীয়ালী সুর জলে স্থলে সুধা বর্ষণ করে—

বলুক বলুক বলুক সই, যার মনে যা লয় লো।
ভয় করিব যারে সই, বল করেছি তায় লো।
এবার মরে সোনা হবো, গায়েতে জড়ায়ে রবো
নাকেতে বেসর হবো, হবো গলার চিকদানা,
যায় যদি যাক কুলমান, তবু তারে ছাড়বো না।"

এই ভাবে পূর্ব বাঙলায় বয়ে যাওয়া লোকায়ত জীবন প্রবাহের সার্থক চিত্র অঙ্কন করেছেন গ্রামের প্রাকৃতিক শোভা বর্ণনায় এবং ভাটীয়ালীর গানের প্রবাহে।

মধুমতীর স্বামী এবার পূজোতে আসতে পারবেনা, ঠাকুমা তাকে ঠাট্টা করার সূত্রে দুটি লোক সঙ্গীতের পদ উদ্ধৃত করেছে: "তাই ক'দিন থেকে তোর মুখখানা ভার ভার দেখছি, বৃন্দাবনে সুখের ঠাঁই তাতে রাধার সুখ নাই।'……মন কেঁদে কয়—

বিধি যদি দিত পাখা উড়ে গিয়ে করতাম দেখা;—
ভুলে বিধি দেয়নি পাখা, ক্যামনে করিব দেখা।"

একটি লোক সংস্কার: ঠাকুমা বলছে: "ভোর থেকে কুঁড়ো (বাজ) পাখি উড়ে উড়ে ডাকবে। কুঁড়ো উড়ে ডাকলে খালখন্দ, হিল, বিল, শুকিয়ে যায়। বাসায় বসে ডাকলে তিভুবন জলে জল হয়।'

রায়বাড়ির জ্যেষ্ঠ সন্তান প্রাসাদের আনা কলের গান শুনতে শুনতে বিণুর মনে পড়ে: ন-কর্তার আগমন সংবাদ প্রচার হইতে না হইতেই চারিদিকে সাড়া পড়িয়া যাইত। শুরু হইত সঙ্গীতের মহোৎসব—তাঁহার ভক্ত শিষ্যমণ্ডলীর দল

সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। গ্রাম গ্রামান্তর হইতে আসিয়া জুটিত যাত্রার দল, কবিওয়ালারা, কীর্তনীয়া, ঝুমুর, ঢপ, বাউল, খেমটা ইত্যাদি।"

লোকায়ত সমাজের যে সব আনন্দ এবং আমোদের ব্যবস্থা ছিল তার সঙ্গে যুক্ত হল আধুনিক আনন্দ বিনোদনের আর এক উপাদান, কলের গান। আধুনিকতার সঙ্গে লোকসংস্কৃতির সংমিলন ঘটছে। লেখিকা তারই ইঙ্গিত করেছেন: "গোল বারন্দার নীচে কোমল দূর্বাদলে আচ্ছাদিত অঙ্গণে সতরঞ্চি পাতিয়া বসিবার জায়গা হইয়াছিল সর্ব সাধারণের। তাহাদের মাথায় উপরে আচ্ছাদন হইয়াছিল পদ্মপাতা আঁকা সামিয়ানা। পূজা উপলক্ষ্যে এখানে প্রতি বছর যাত্রা, শ্রীকৃষ্ণলীলা ও সারিগানের আসর বসিত, সপ্তমী পূজা হইতে লক্ষী পূর্ণিমা অবধি চলিত যাত্রায় ঢোলক, কাঁসি, বেহালা, খেমটার ঝুণুঝুণু, ভাসানের উদাস স্বর, পাঁচালীর লীলা কীর্তন। লাঠিয়ালদের লাঠির ঠক্‌ঠক্, মুসলমানদের সারিগান ইত্যাদির মধ্যে সংযোগ হইল কলের গান।" দুর্গাপূজার শাস্ত্রীয় আচার আচরণের পাশাপাশি এককালে যেসব লৌকিক আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, পূজা উপাচার, সাজ সজ্জা, আয়োজন আড়ম্বরের একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন লেখিকা: "মণ্ডপের সামনে প্রকাণ্ড বারান্দা, বারান্দায় যাইবার প্রকাণ্ড সারি সারি দরজা। তিন দেয়ালে লম্বা লম্বা বাঁশের 'আরা' বাঁধা, আরায় ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছে কাঁদি কাঁদি কলা, নারিকেল, আম। উহার ফাঁকে ফাঁকে পঁচিশটা রচনার হাঁড়ি ঝুলিবে। রচনা মানে ছোট ছোট মাটির হাঁড়িতে নিয়মের খই, মুড়কি, মুড়ি, চিঁড়া ও মোয়া তাহার উপরে তিলের নাড়ু, বাতাসা ভরিয়া ছোট ছোট সরায় মুখ ঢাকিয়া দড়ি দিয়া চারিদিকে ঝুলান হইবে। এগুলি পাইবে কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, বাদ্যকর, ছুতার, ভূমিমালি, গঙ্গাবহনের ও বেলপাতা, পদ্মফুল সংগ্রহকারীরা। ইহা ছাড়া তিন দিনের পূজার মাটির থালির বড় আমানী ও জলপানি ধুতি-চাদর, তাহাদের প্রাপ্য, ভিন্ন দুইটা বড় মাটির হাঁড়ি বোঝাই হয় অনুরূপ দ্রব্যে। তাহার একটা পান পুরোহিত, অন্যটা দেউড়ী (প্রতিমা গঠনকারী)। নারিকেল, আখ ও কলা রচনার সঙ্গে সকলকে বণ্টন করিয়া দিতে হয়। সিধাও পায় সকলে প্রচুরতম।" কিংবা,

"সপ্তমীতে মা দুর্গার সাত ভোগ সাত ভাজা, অষ্টমীতে আট ভোগ আটভাজা, নবমীতে নয় ভোগ, নয় ভাজা। তারপর দশমীতে নাল পান্তা। নবগ্রহের নয় ভোগ, পদ্মার ভোগ, নারায়ণের ভোগ, অসুরের ভোগ, চণ্ডীর ভোগ, ঠিক ঠিক করে রাখবি। মোট এক কুড়ি ভোগ লাগবে, লাগবে কাল। কাল ভোগে

কিসের অম্বল হবে? পয়লা দিন কামরাঙা আর কাঁচা তেঁতুল দিতে হয়। যে কেউ ভোগ র‍াঁধিস নে কেনে, আগে ভাগে কড়াই ভরে ভরে অম্বল রেঁধে খাদায় খাদায় ঢেলে রাখিস। পরে ভাজিস পোর, দিব্যি মুচমুচে থাকবে। কথাতেই আছে—আগে অম্বল পরে ভাজা, সেই হ'ল র‍াঁধুনীর রাজা।...পাঁচ কলাইয়ের জল পানিতে নুন, লঙ্কা, আদার কুচি, ফুলবড়ি, মনে করে দিতে হবে। যার ভোগে যে যতই লুচি-পুরী জিলেপী, ছানা; মাখন দাও না কেন, কিন্তু তিন দিনেই কলার বড়া না দিলে ভোগ সিদ্ধি হয় না।"

দুর্গাপূজা আসলে একটি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান হলেও এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে অজস্র ঐতিহ্যানুযায়ী লৌকিক আচার অনুষ্ঠান, পূজার লৌকিক আড়ম্বর আয়োজন। এর মধ্য দিয়েই ফুটে ওঠে সেকালের বাংলাদেশের পূজা-পার্বণের অন্তরালের পারিবারিক জীবনের উদ্যোগ আয়োজনের একটি পরিপূর্ণ রূপ। একদিন এই পুজানুষ্ঠান যে সমস্ত গ্রামেরই পূজানুষ্ঠান ছিল, ধনি দরিদ্র, ছোট বড় জাতিধর্ম, নির্বিশেষে এই অনুষ্ঠানে সকলে সমবেত হত এবং একান্নবর্তী পরিবারে কর্তা ও গৃহিনীরই যে এ বিষয়ে দায়িত্ব ছিল বেশী তারও পরিচয় গ্রন্থটিতে উপস্থিত হয়েছে। গ্রাম সমাজ পরিবারের কেন্দ্রস্থলে একটি বা দুটি ব্যক্তির স্বার্থ ত্যাগেই যে গ্রামীণ অনুষ্ঠানগুলি পরিচালিত হত তার একটি সুন্দর বিশ্লেষণ লেখিকা উপনীত করেছেন। দুটি একটি নরনারীর মহত্ব ও স্বার্থ ত্যাগের উপর যে সমস্ত পরিবার ও সমাজ নির্ভর করে থাকতো তার পরিচয় লেখিকা উপস্থিত করেছেন: "সমস্ত বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য হইয়া ভোজনে বসিয়াছে। এদিকে মনোরমা প্রার্থীদিগকে অন্ন বিতরণ করিতেছেন। পূজার তিন দিন কেহ যেন বিমুখ হইয়া শূন্য হাতে ফিরিয়া না যায়, সেদিকে তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। এ ক্ষেত্রে স্বামীর অন্নদানব্রত স্ত্রী সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছেন। নিমন্ত্রিত অনিমন্ত্রিত, আগত অভ্যাগত, দাস-দাসীকে খাইতে দিয়া বাড়ীর মেয়েরা যখন আহারে বসিলেন তখন রাত্রি আটটা বাজিয়া গিয়াছে।" এর পরেই সারিগান এর আসর বসেছে। 'সারিগান' পূর্ব বাঙলার একটি প্রধানতম লোকগীতি এবং এই শ্রেণীর সংগীতকে অনেক শ্রম সংগীত (group work song) ও বলে থাকেন। এক সঙ্গে নৌকা যাওয়ার সময়ে যে গান হয় তাই হচ্ছে সারিগান। সারিগান তাল প্রধান লোকগীতি এবং এর সঙ্গে নৌকা, নদ-নদী, বিল, হাওরের সঙ্গে সম্পর্ক আছে বলেই পূর্ব এবং নিম্নবঙ্গের ভাটি এবং জলাভূমি অঞ্চলেই এই গীত সীমাবদ্ধ, এই গীতটিকে অনেকে অনুষ্ঠান বা উৎসব গীতি (Festival song) ও বলে থাকেন।

দুর্গাপূজার সময় বিশেষতঃ বিজয়ার দিন দশমীতিথিতে নৌকা বাইচের সময় এই গীত গাওয়া হয়। এ ছাড়াও মনসার ভাসানের দিন অর্থাৎ শ্রাবণ সংক্রান্তির পরবর্তী দিন ১লা ভাদ্র তারিখে ভরা বর্ষায় যে বাইচ প্রতিযোগিতা হয় তাতেও সারিগান গাওয়া হয়। রায়বাড়ি উপন্যাসে সারিগানের ও ধুনুচি নৃত্যের আসরের দুটি সুন্দর বর্ণনা লেখিকা উপস্থিত করেছেন : "আরতি শেষে সারিগানের গায়করা অগ্রসর হইল। ইহারা বাউলের দল নয়। সারিগায়কের দল। ইহারা জাতিতে মুসলমান। পূজার সময় গ্রামান্তর হইতে আসিয়া পূজা বাড়ীতে নাচিয়া গাহিয়া পার্বণী আদায় করে। ইহারা সংখ্যায় সাত আটটা লোক আসিয়াছে। পরিধানে কোরা বিলেতী ধুতি, গায়ে চাদর, পায়ে পিতলের নূপুর ও হাতে একতারা। বাঁ হাতে কোঁচার খুঁট ধরিয়া ডান হাত উর্ধ্বে তুলিয়া মাথায় বাবরি চুল ও বুক সমান দাড়ি দোলাইয়া সকলে নাচিয়া নাচিয়া গাহিতে লাগিল।

হে মা দুর্গে,
ধন্য ধন্য রাঢ়ের দেশে গুপ্ত ছিলেন কালী,
সত্য যুগে দিয়েছিল লোহার পাঠাবলি।
হে মা দুর্গে! সপ্তমী অষ্টমী তিথি হইল সমাপন,
নবমীতে দুর্গা, নিতে আইল ত্রিলোচন।
অকস্মাৎ বজ্রঘাত স্বর্গপুরী হতে,
তত্ত্ব শুনি গিরিরানী দুর্গা নিল কোলে।
মৃত্তিকায় বসে গিয়ে ভাসি নয়ন জলে।
হে মা দুর্গে! নাইরে কাজ গিরিরাজ, বলগে যেয়ে শিবে,
নাইরে দিবে তারা,
তাহার লেগে কেঁদে কেঁদে হইনি হারা।
হে মা দুর্গে! কত দেবের মেয়ে দেয় বিয়ে, থাকে পরম সুখে।
মোর ভবে ভবানী হর মোহিনী জন্ম গেল দুখে
হে মা দুর্গে!

সারি গানের দল নাচিয়া গাহিয়া কর্তার কাছে পারিতোষিক-লইতে গেল।

ইহার পরে ধুপভাঙ্গার পালা। বড় বড় মাটির ধুনুচিতে গন্‌গনে আগুনে ধুপ পুড়িতেছে। তাহারই এক—একটা ধুনুচি হাতে লইয়া মুর্তিমান পালোয়ানদের নৃত্য আরম্ভ হইয়া গেল। ইহার পরে সর্দারেরা লাঠি খেলা দেখাইবে। সর্বশেষে গোল বারান্দার আঙ্গিনায় যাত্রাগানের আসর বসিবে। অন্তকার পালা

'বৃত্রসংহার'। ইহাই লইয়া গ্রামবাসীরা জাগিয়া কাটাইবে সারাটা রজনী।" সারিগান যেমন বাংলার লোকসংগীতের মধ্যে একটি বিশিষ্ট তাল প্রধান কর্ম ও অনুষ্ঠান সংগীত, ঠিক তেমনি 'ধুনুচি নৃত্য' এবং লাঠিখেলা, যাত্রাগান ও বাংলার লোকসংস্কৃতির বিশিষ্ট সম্পদ। লেখিকা এইসব লৌকিক উপাদানগুলির বর্ণনায় তার উপন্যাসটি সমৃদ্ধ করেছেন।

বাঙালী পরিবারের অন্তঃপুরের একটি জীবন আছে, সে জীবনের রস ও রহস্য অন্তঃপুরের সীমানার মধ্যে আবদ্ধ, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পরিবারস্থ পুরুষের দৃষ্টির অন্তরালে থেকে যায়। তাদের বিরহ বেদনা, মান অভিমান, সুখ-দুঃখ নারী ছাড়া আর কারও জানা সম্ভবপর নয়। দিনের পর দিন লোকাচার, পূজানুষ্ঠানের নিয়ম কানুন, উদ্যোগ আয়োজন এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতা যতই বৃদ্ধি পাচ্ছে ততই অন্তঃপুরচারী রমনীদের জীবনও শুষ্কপ্রায় হয়ে আসছে, সহজ আমোদ আনন্দের জগৎ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। লেখিকা তারই বিবরণ দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে রচনা করেছেন : "আজ গানের আসর বসিল রাত্রি দশটার পর। পালা শ্রীকৃষ্ণের পারিজাত হরণ। কিন্তু রায় রঙ্গিনীদের নিকটে হরণ বা বরণের মূল্য নাই। কর্মশালাকে যতই দান কর না কেন, তাহার মর্মভাণ্ডার যেন পূর্ণ হইতে চাহে না। দানে দানে আরও বাড়িয়াই যায়। সেই তরকারির পাহাড়, বাটি বাটি চন্দন ঘষা। পিঠের গোলা জিলাপীর রস। ধামায় ধামায় ভোগের চাল ডাল মাখিয়া রাখা। ভোগ শালার শুচিতা পর্যবেক্ষণ। ইহার ভিতরে পারিজাত হরণের সময় দিবার অবকাশ কোথায় ?"

একটি লৌকিক আচার: বেলা একটার পরে বার বেলা পড়িবে। তাহার পূর্বে বলি ও একটা ভোগ সরাইয়া ভরা তুলিতে হইবে। পরে যথা নিয়মে পুনরায় ভোগ হইবে। ভরা উঠিবে অন্তঃপুরের বড় ঘরের লোহার সিন্দুকের মাথায়। গোবর জল দিয়া ঘর মুছিয়া ধুইয়া তকতকে করা হইয়াছে। সিন্দুরে চন্দনে রঞ্জিত লোহার সিন্দুকের সামনে রাখা হইয়াছে আম্র পল্লবে ভূষিত পূর্ণকুম্ভ। মেঝেয় পাতা শীতল পাটি, রুপার রেকাবীতে ধানদুর্বা। জলশূন্য মাটি-কলসী, ঝাঁটা ন্যাতা গোল হাঁড়ি সারাইয়া ফেলা হইয়াছে অন্তরালে। বলির কোলাহল থামিবার পরে মায়ের সংক্ষিপ্ত ভোগ দেওয়া হইল। পরে বাজিতে লাগিল ভরার বাজনা। শুধু ঠাকুমাই নয়, সমবেত স্ত্রীলোকদের উচ্চ উলুধ্বনিতে চারিদিক কম্পিত হইতে লাগিল।"

প্রাচীন কালে বাঙলাদেশে প্রচলিত একটি লৌকিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান অন্তঃপুরচারিনী লেখিকার বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে :

"অগ্রে পুরোহিত ও মহেশ বাবু, তাঁহাদের পশ্চাতে বিরাট পুষ্পপাত্র মস্তকে প্রসাদ। তাহার সহিত আত্মীয়-স্বজন বালক-বালিকারা। ঠাকুমাকে আগেই ধরিয়া আনিয়া পাটির উপরে বসাইয়া রাখা হইয়াছিল। তিনি সেখানে বসিয়াই গলা ফাটাইয়া উলুধ্বনি দিতে লাগিলেন, তাহার প্রতিধ্বনি তুলিল বাড়ীর দাস দাসীরা ও আগত রমণীগণ।"

"ভরা নামাইয়া রাখার পরে প্রণাম ও আশীর্বাদের ধুম পড়িয়া গেল, গৃহের তুচ্ছ দাস দাসী হইতে বাস্তকরেরা পর্যন্ত গৃহকর্ত্রীর মঙ্গল হস্তের ধানদুর্বার আশীর্বাদ পাইয়া ধন্য হইয়া গেল।" 'ভরা তোলা' যেমন একটি মাঙ্গলিক লোকাচার (Folk ritual), ঠিক তেমনি 'নালপান্তা'র অনুষ্ঠানটি একটি লোকাচার, তার ও একটি নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন লেখিকা : নাল পান্তার ভোগ সযত্নে রক্ষিত হইল ধর্মশালার এক কোণে। থালা থালা ভাজা মাছ, ভাজা শুকতো, ডাল ও তরকারি। পিঠে পায়েস লুচি জিলিপি। যাহা বাসি হইলে নষ্ট হইবে না তেমনি দ্রব্য। দুই গামলা গরম ভাতে কলসী কলসী জল ঢালিয়া পান্তা করিয়া রাখা হইল।" আসলে আজকের অনুষ্ঠান কালই আচারে পরিণত হয়। এটি একটি লৌকিক ব্যাপার। দুর্গা পূজার কয় দিন অমানুষিক খাটুনির পর আর কেউ দশমীর দিন কাজ করিতে পারবে না। তাই পূর্ব দিনেই রাঁধা বাড়া শেষ করার জন্য যে ব্যাপার সংঘটিত হত, পরে সেটিই 'নাল পান্তা'র নামক লৌকিক আচারের পরিণত হয়েছে।

এদিকে ধূপভাঙা, ওদিকে যাত্রার আসর—এই সন্ধি ক্ষেত্রে ঢোলক করতাল বেহালা ও হারমোনিয়ামেরই জয় হল। লোক ছুটে গেল যাত্রার আসরে। যাত্রার পালা ছিল 'বৃন্দাবন লীলা'। রাত্রি শেষের দিকে গানও শেষ হয়ে এল, মধুমতী এতক্ষণ যাত্রাগানে মন সংযোগ করে বধুর দিকে লক্ষ্য রাখেনি। বৌ ত দিব্য থামে হেলে গভীর নিদ্রায় মগ্ন। মধুমতী বিনুকে ঠেলা দিল। যাত্রা শেষের সুন্দর গ্রাম্য বর্ণনা লেখিকা উপস্থিত করেছেন : ঠেলা খাওয়া বিনুর অভ্যাস আছে। সে সোজা হইয়া বসিল, চোখ মুছিয়া আসরে তাকাইয়া রহিল। তখন যুগল মিলন হইয়াছে। বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ বালিকাবেশ ধারিনী শ্রীরাধা কদম তলায় বঙ্কিম ভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়া—এক সুকণ্ঠ যুবক গোঁফদাড়ি কামাইয়া শ্রীকৃষ্ণ

যথা সুবলের পাট লইয়াছিল। সেই সুবল যুগলমূর্তির সামনে বাহু উর্ধ্বে উত্তোলন করিয়া গাহিতে লাগিল,

তমাল পাশে কনকলতা হেরিয়া নয়ন জুড়ালরে,
কিম্বা নব-নীল নীরদ এসে দামিনী পাশে দাঁড়ালরে!
শ্রীচরণ সরোজে কত ভ্রমিতেছে মধুব্রত;
শশধর শশঙ্কিত, শমন ভয় ফুরাল রে।'

এ আজকের আধুনিক থিয়েট্রিক্যাল যাত্রার দৃশ্য নয়, এ একেবারে যখন বাঙলা দেশের যাত্রা লৌকিক সংস্কৃতির উপাদান ছিল, বাংলার লোকায়ত মানুষকে নিছক আনন্দদান করতো—এ সেই যুগের যাত্রার চিত্র।

দুর্গাপূজা সংক্রান্ত তার একটি লোকাচার, সেটি হচ্ছে 'দর্পণ বিসর্জন':

"প্রকাণ্ড মহাস্নানের হাঁড়ির উপরে দর্পণ রাখিয়া পুরোহিত একজন করিয়া দর্পণে প্রতিমার প্রতিচ্ছবি দর্শন করিতে হয় নির্দেশ দিলেন। মেয়েরা পূর্বেই যে যাহার সিঁদুরের রূপার—বা কাঠের কৌটা আনিয়া বসিয়াছিল। মনোরমা আনিয়াছিলেন লক্ষ্মীর ঝাঁপি। পুরোহিত সেগুলি মায়ের চরণ স্পর্শ করাইল, সাধারণ মানুষের ধারণা, দর্পণে যে মূর্তি দৃষ্টিপতে পড়ে, সারা বছরের ফলাফল তাহারই উপর নির্ভর করিয়া থাকে।"

আর একটি লৌকিক সংস্কার: ভোগের নালপাস্তা খাইবার উদ্দেশে এসে কলার পাতা বাছিতে বাছিতে উল্লাসে চীৎকার করিতে লাগিল, ওমা, বড়দি, মেজদি, তোমরা শীগগির বেরিয়ে দেখে যাও, যোড়া ধরে খঞ্জনপাখী চরে বেড়াচ্ছে।"......তরু বার বার হাত ললাটে স্থাপন করিয়া খঞ্জন বন্দনা করিল, "খঞ্জন পাখী নমস্কার,, কাল দেব দুধ-ভাত, আজ দিলাম শুধু হাত।" এই খঞ্জন পাখী-দর্শন সংস্কার সম্পর্কে লেখিকার অভিমত: "পূজান্তে পল্লীগ্রামে খঞ্জনপাখী দর্শন হিন্দুদের অতি আকাঙ্খিত। এই পাখী দেখা দর্পণে দশভূজার প্রতিকৃতি দর্শনের ন্যায় সংস্কার যুক্ত। খঞ্জন কোন মুখে প্রথম দৃষ্ট হয় তাহারও একটা ফলাফল বিচার আছে। খঞ্জন বিশেষজ্ঞরা তাহা নির্ণয় করিয়াছেন। আশ্চর্যের বিষয়, এই পাখীগুলি পূজার পূর্বে কোথায় থাকে কেহ তাহা জানেনা। পূজার পরে লক্ষ্মীপূর্ণিমা অবধি ইহারা গৃহস্থের অঙ্গনে নামিয়া চরিয়া বেড়ায়। তাহার পর কোথায় চলিয়া যায়, কোথায় যায়, কোথায় থাকে, তাহার ঠিকানা নাই। ইহারা বাংলার মাটিতে ক্ষণিকের অতিথি।"

দুর্গা প্রতিমার বিসর্জনের যেমন শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান আছে তেমনি তার সঙ্গেই

আছে লৌকিক আচার আচরণ এবং নানা বিধি নিষেধ। লৌকিক আচার আচরণ এর অভিধান স্বরূপ ঠাকুমার ভাষণেই তা শোনা যাক : বরণের দ্রব্যজাত ঠিকঠাক করে রেখে দে। খই, ইন্দুরের মাটি ; বাতাস দেবার ফুলকাটা পাখা, তামার বড়গাড়ুটা মেজে ঘষে এক গাড়ু জল। জলের ধারা দিয়ে বরণ করতে হয়। কুড়ি তুই আস্ত পান বোঁটা সমেত চিরে জোড়া জোড়া খিলি করে দে। কপালে সিন্দুর দিয়ে পায়ে ধান-দূর্বা দিয়ে প্রণাম করে পানের বোঁটায় পান ঝুলিয়ে দিবি হাতে হাতে। কাঠামোর নকল ঠাকুরের মুখে চিনি দিয়ে মিঠে মুখ করে দিতে হয়, বরণের ডালায় প্রদীপে তেল সলতে ঠিক আছে কিনা দেখে রাখ। ভরার কাছে যাত্রা-কলসী নিয়ে যেতে হবে বরণের সময়। আজ ধানদুর্বো কিন্তু লাগবে গাদা গাদা। যারা প্রণাম করতে আসবে সকলের মাথায় ধানদুর্বো দিয়ে আশীর্বাদ করতে হবে।" এই খই, ইন্দুরের মাটি, জোড়া পানের খিলি, ভরার ডালা, যাত্রা-কলসী, জলের ধারা দেওয়া—এ সমস্ত গুলিই লৌকিক আচরণ যা আজ শাস্ত্রীয় পূজার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছে। সমগ্র দুর্গাপূজাটি আজ শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত হলেও আসলে দুর্গপূজার পিছনে আছে একটি লোকায়ত ধারণা যা হচ্ছে দুর্গাপূজার একটা ভিত্তি। 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে দুর্গাকে "শাকম্ভরী' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর অর্থ যিনি শাক (vegetation) বা তরুলতা এবং শস্য সম্পদে পৃথিবীকে ভরে রাখেন। কৃষিভিত্তিক সমাজ জীবনে শস্য সম্পদের বিশেষ মূল্য আছে। সুতরাং বাংলার কৃষিজীবী সমাজ জীবনে দেবী পরিকল্পনার পিছনে এমন একটি লোকায়ত অনুপ্রেরণা থাকাই স্বাভাবিক। দুর্গা প্রতিমার পার্শ্বে যে একটি নব-পত্রিকা বা কলাবৌ স্থাপন করা হয়, সেটিই হচ্ছে দেবী প্রতিমার আদিরূপ। কারণ নব পত্রিকার প্রতিষ্ঠাই এখনও দুর্গাপূজার প্রথম পালনীয় আচার। নবপত্রিকা কদলী, কচু, হরিদ্রা, যব, বিল্ব, দাড়িম্ব, অশোক মানকচু ও ধান্য—এই নয়টি বৃক্ষ ও শস্য দ্বারাই রচিত হয়। মহাষষ্ঠীর দিন এই নয় জাতীয় শস্য ও বৃক্ষের উপাসনা ও স্নানের এই লৌকিক আচারের মাধ্যমেই দুর্গাপূজার সূচনা হয়। তারপর শস্য এবং বৃক্ষকে স্বতন্ত্র করে বিভিন্ন স্থান থেকে জল এনে আলাদা করে স্নান করানো হয়, যেমন উষ্ণ প্রস্রবনের জলে কদলী, পুষ্করিণীর জলে কচু, শিশিরের জলে হরিদ্রা, পুষ্পজলে যব ইত্যাদি। এ দ্বারা মনে হয় আদিম কালে এই সব শস্য তরুলতা ও বৃক্ষ গুলির পৃথক পূজা হোত এবং যে ঋতুতে যে শস্যের ফলন হোত, সেই ঋতুতে সেই শস্য ঘরে এনে আহার করার পূর্বে সমাজে গোষ্ঠীগত ভাবে কতকগুলি আচার পালন করতো। এখনও বাংলার সীমান্তবর্তী

বহু অঞ্চলে যেখানে আদিবাসীরা বসবাস করে সেখানে করম, জাওয়া, ভাদু, টুসু প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর শস্যোৎসব বিভিন্ন ঋতুতে পালন করে থাকে। বাংলার দুর্গোৎসবের নবপত্রিকার পরিকল্পনার মধ্যে এদেশের আদিম অধিবাসীদের বিভিন্ন ঋতুর শস্যোৎসব এক সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে এই উৎসবকে একটি অখণ্ড জাতীয় রূপ দান করেছে! আসলে দেবী দুর্গা ধরিত্রি বা পৃথিবীর প্রতীক। তিনি শস্য সম্পদে পৃথিবীকে পূর্ণ করেন। সেজন্যেই তিনি শাকম্ভরী। তাঁর দশদিক পৌরাণিক যুগে এসে দশ বাহুতে পরিণত হয়েছে। ধরিত্রীকে শস্যভারে পূর্ণ করবার বাধা অনাবৃষ্টি। মহিষাসুর এই অনাবৃষ্টির প্রতীক। দুর্গাপূজার আর একটি প্রধান আচার দেবীর আনুষ্ঠানিক স্নান,—ইহাকে মহাস্নান বলে আর মহাস্নানের জল পূজার পরম প্রসাদ। এই মহাস্নান ধরিত্রীরই স্নান। সূর্য কিংবা ধরিত্রীর প্রতীককে স্নান করাইলে পৃথিবীতে অনাবৃষ্টি দূর হবে—এটি সমাজের একটি অতি আদিম বিশ্বাস। Anthropologyতে একে Sympathetic magic বলে। বাংলার ধর্মপূজায় সূর্যদেবতার প্রতীককে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্নান করানো হয়, আর দুর্গাপূজায় পৃথিবীর প্রতীককে (কলাবৌ বা নব পত্রিকা) এইভাবে স্নান করান হয়।১ পূর্ববাঙলার লক্ষ্মীপূজার অনুষ্ঠানটি একটি পরিপূর্ণ লোকায়ত অনুষ্ঠান (Folk ritual)। লেখিকা 'রায়বাড়ী' উপন্যাসের মধ্যে এই প্রচলিত লক্ষ্মীপূজার একটি নিখুঁত বর্ণনা উপস্থিত করেছেন এবং এর মধ্য দিয়ে হারানো কালের লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের একটি পরিপূর্ণ রূপ উপলব্ধি করা যাবে। ঠাকুমার বক্তব্যেই শোনা যাক: "শোন্ ত পচার বৌ, কাল লক্ষ্মীপুজো, আজ বাড়ীর চারদিক ঝাড়লেপা আরম্ভ করে দে। মালক্ষ্মী কারোর অনাচার সইতে পারেন না। 'আচারে ভাত, অনাচারে হাভাত'। শুনিস নে লক্ষ্মীর বচন,

'সকাল বেলা ঝাড়-ছড়া সন্ধ্যা বেলা বাতি,
লক্ষ্মী বলেন সেইখানে আমার বসতি।'

ভাল করে লেপা পোঁছা করবি, ফাঁকি দিস নে।" ভাল করে লেপা পোঁছা না হলে, ঝাড়-ছড়া দেওয়ার শৈথিল্য হলে, কোন রকম অনাচার থাকলে লক্ষ্মী আসেন না—এ প্রচলিত লৌকিক বিশ্বাস। লক্ষ্মী পূজার আল্পনা লোকায়ত শিল্পকলার (Folk art) এক সার্থক নিদর্শন। ঠাকুমা তাই আল্পনার বর্ণনা দিয়েছে এবং নির্দেশও দিয়েছে: আমাদের লক্ষ্মী প্রতিমা নেই, ঘটে-পটে পুজো। আসনে আল্পনায় আঁকতে হয়, লক্ষ্মীর মুখ জোড়া জোড়া, চরণ, ধানের শিষ

১. আশুতোষ ভট্টাচার্য। বাংলা লোকশ্রুতি। ১৩৬৭। পৃঃ ১৪৯-১৫৬

পদ্মলতা, শঙ্খলতা। আজকে আসন চিত্তির করে রাখতে হয়, কাল হ'ল গোটা বাড়ী, তুলসীতলা, ধামা, কাঠা, ডালা কুলো, ধানের মরাই, চালের জালার গায়ে লক্ষ্মীর পা আর ধানের শিষ দিয়ে নিয়ম রক্ষা করতে হবে। এ গাঁয়ের তোর যেমন আল্পনার হাত এমনটী আর কারো দেখি নি সরি।" এই আল্পনা যেমন একটি লোক শিল্পের সার্থক নিদর্শন, এবং আল্পনার যেমন একটি প্রচলিত অঙ্কন পদ্ধতি, প্রচলিত বিষয় বা মোটিফ আছে, ঠিক তেমনি এই আল্পনা আঁকার দক্ষতা ভেদে গ্রামের মধ্যে ভাল ভাল লোক শিল্পীও (Folk artist) আছে। তবে লোক শিল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে লোক সংগীত যেমন গ্রামের প্রায় সকলেই গাইতে পারে, তেমনি আল্পনা যেহেতু একটি লোকশিল্প তাই গ্রামের সব মেয়েই আল্পনা দিতে পারে, তবে এর মধ্যেই অনেকে দক্ষতা অর্জন করে গ্রামের মধ্যে নাম করে। রায়বাড়ীর সরস্বতী আল্পনা অঙ্কনে সিদ্ধহস্ত। কেবলই কি আল্পনা 'লক্ষ্মীবসান' ও একটি পদ্ধতি আছে যা বহু বছর ধরে নিয়মের মত করে করে আসা হচ্ছে। ঠাকুমা কামিনীর মাকে বলছে: "লক্ষ্মীবসাবার সময় জলশঙ্খের ভেতরে বেলপাতা ত্রিদল, জবাফুল, সতের গাছা দুর্ব্বা, সতেরটা সেদ্ধ ধানের চাল খুঁটে অর্ঘ্য সাজিয়ে দিয়ে লক্ষ্মী বসাতে হয়। লক্ষ্মীর আল্পনা তেল সিঁদুর দেওয়া কাঠের আসনের দুই দিকে তেল ঘিয়ের প্রদীপ জেলে উলু দিয়ে লক্ষ্মী বসানোর নিয়ম। আমাদের ঘটে পটে পূজো। লক্ষ্মীর পটখানা নামিয়ে ঝেড়ে মুছে রাখতে হবে। দুটো পিলসুজ প্রদীপ, পূজোর তামার ঘট মেজে ঘষে আজকেই রাখা ভাল। পূর্ণিমা লেগে গেলেই যে মা কড়ি শঙ্খ সিঁদুরের কৌটো শাঁখা, আয়না, চিরুণী, পঞ্চশস্যের ডোল নিয়ে বসবেন চেলীর শাড়ীতে মুখ ঢেকে বৌ হয়ে।" আল্পনারই বা কত শিল্পবাহার, কত তার শিল্প কৌশল: "সরস্বতী অখণ্ড মনোযোগ সহকারে আল্পনা দিতেছিল। তাহার ভিতরে শিল্পী সুলভ নৈপুণ্য ছিল অসীম। ধানের শীষ, লক্ষ্মীদেবীর যুগল পদ চিহ্নের পাশে কত লতাপাতার অপূর্ব সমাবেশ তাহার আঙুলের ডগায় ফুটিয়া উঠিতে ছিল। পদ্মলতা, শঙ্খলতা, তরুলতা কুঞ্জলতা, জিলেপিলতা, লবঙ্গলতা, ঝুমকালতা, লতায় পাতায় ফুলের চিত্র বিচিত্রতায় ঠাকুমার হাতীমুখো বারান্দার দুই দিক ভরিয়া গেল।" লক্ষ্মীপূজার শেষ জ্যোৎস্না পুলকিত মধুযামিনীতে বিণুর স্বপ্নে লেখিকা একটী সুন্দর রূপকথার প্রতীকে রূপকথার স্বপ্নময় জগৎ তৈরী করেছেন: বিণু স্বপ্ন দেখিতেছিল—সে যেন বিণু নয়, রায়বাড়ীর বধু নয়। সে কুঁচবরণ কন্যা মেঘবরণ চুল, ডাইনী বুড়ী তাহাকে ভুলাইয়া ধরিয়া আনিয়াছে। তাহার রূপার কাঠির পরশ দিয়া গভীর অরণ্যে

পাথর পুরীতে অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত করিয়া রাখিয়াছে যে পাষাণ পুরীর কানন কান্তারের প্রভাতের আলোর অঙ্গুলি ঝলকিত হয় না। তরুলতা পুষ্পহারে প্রসাধন করে না। বিহগকণ্ঠ নীরব, সমীরণ স্তব্ধ। ভরা নদীর কলতান অবরুদ্ধ। যুগের পর যুগ চলিয়া যায়, কল্পান্তরের পরে কল্পান্তর।

একদা কি এক মহালগ্নে শুভক্ষণে তেপান্তরের রাজপুত্র তাঁহার পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া প্রবেশ করিলেন সেই লৌহ দুর্গে। হাতে তাঁহার সোনার কাঠি।

সোনার কাঠির স্পর্শে কুঁচবরণ কন্যার মহাসুপ্তির ঘোর অকস্মাৎ কাটিয়া গেল। অমনি ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী গাহিতে লাগিল। গাছে গাছে রাশি রাশি ফুল ফুটিল। নিদ্রিত নদী জাগ্রত হইয়া তান ধরিল কুল কুল কুল। মন্তপবন মুখর হইল। কুঁচবরণ কন্যার শিথিল বাহুমূল পরম সমাদরে আপনার কর পল্লবে ধারণ করিয়া তেপান্তরের রাজপুত্র চুপে চুপে কহিল, তুমি আমার বধূ, আমি তোমার বর। আমার কাছে সোনার কাঠি আছে; তোমাকে আর ঘুমাতে দেব না।"

বিণু স্বপ্নে নিরীক্ষণ করিল যে তেপান্তরের রাজপুত্র আর কেহ নয়। তাহারই নবীন বর প্রসাদ।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে বাঙ্গালীর জীবন মানস প্রধান, ধর্ম প্রধান নয়। মনোরাজ্যে নারীর সার্বভৌমত্ব এবং কর্মের রাজ্যে পুরুষের সার্বভৌমত্ব। সুতরাং মানস প্রধান উপন্যাস রচনার পক্ষে নারী যে অধিকার, পুরুষের তা নাই। আমাদের দেশে অন্তঃপুরই মানসিকতার অভিব্যক্তির লীলাভূমি। 'রায়বাড়ী' উপন্যাসখানি একটি সুবৃহৎ বাঙ্গালী পরিবারের একান্ত অন্তঃপুর জীবন অবলম্বন করে একজন প্রতিভাশালিনী অন্তঃপুরিকা কর্তৃক রচিত। তাই এর মধ্যে বাঙালীর পারিবারিক জীবনে এককালে অন্তঃপুরিকাদের জীবনযাত্রা কিরূপ ছিল তার একটি সার্থক রেখাচিত্র ফুটে উঠেছে। এ সম্পর্কে লেখিকার, উক্তি: "আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির নিশীথ রাত্রে রায়বাড়ীর 'গারসী' পূজা। এ বার মেসে লক্ষ্মীব্রতের পর্যায়ে পড়ে। এখানে একটা উপলক্ষ্য হইলেই হইল। রক্ষণশীল মেয়ে মহল হইতে কোনটাই বাদ যায় না ছোট-খাট নাটাই-পাটাই ষষ্ঠী মঙ্গলচণ্ডী, মনসা সমানে সজাগ হইয়া বিরাজ করিতেছে রায়বাড়ীতে, ইহাদের ভ্রমেও ভুল না, ত্রুটী হয় না। পৃথিবীর বাহিরের দরজা বন্ধ করিয়া সীমাবদ্ধ অন্তঃপুরের ক্ষুদ্র পরিসরের ভিতরে ইহাদের রাজত্ব। সুখ-দুঃখ, হাসি কান্না।"

'গারসী পূজার' আয়োজন: শত সহস্র ছিদ্রযুক্ত চালুনি ডালায় গারসী পূজার উপকরণ সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছে। তেল, তেলের প্রদীপ, সিঁদুর, কাঁচা

হলুদ. কাঁচা তেঁতুল, পান, সুপারি, আদা, মাস কলাই ভিজানো, কলা বাতাসা, পাটকাঠি, কুলা,।' নিদ্রিত পুরীতে প্রথমে জেগে উঠেছেন ঠাকুমা। দ্বারে দ্বারে করাঘাতে জাগাতে লাগলেন সকলকে—ও সরি তন্বি পদ্মি রাজেশ্বরী, তোরা ওঠ লো ভান্বি রে ডাক দে, গারসীর সময় হইচে।' লবঙ্গদের বাড়ির দিকের প্রাচীরের দ্বার খোলা হল ক্ষিতির হাতে কুলা ও একখণ্ড পাট কাঠি. ভানুমতির হাতে বরণডালা। তরুর হাতে আর একখানা কুলা। কামিনীর মার হাতে পাটকাঠির বোঝা। আর বাকী সকলের হাতে হারিকেন লণ্ঠন। লেখিকার বর্ণনা : কুলা সশব্দে বাজিতে লাগিল, দুমাদুম, দুমাদুম। ঠাকুমা উলুধ্বনি দিয়া বচন ঝাড়িতে লাগিলেন, 'ভূত-প্রেত দূরহ, লক্ষ্মী এস ঘরে। ভূত-প্রেত দূরে যা লক্ষ্মী আসুক বাড়িতে। আপদ বালাই দূরে যাক, লক্ষ্মী আসুক ঘরে।' একটি শেয়াল যেমন প্রহর ঘোষণা করিবার সঙ্গে সঙ্গে সকল শেয়াল জিগির দেয়, তেমনি রায় বাড়ির কুলার বাজনায় পাড়ায় পাড়ায় কুলা বাজিতে লাগিল, কলরোল উচ্চারিত হইল, ভূত প্রেত দূরে যা, লক্ষ্মী এস ঘরে।

এই 'গারসী পূজাটী আসলে অলক্ষ্মী অর্থাৎ যাবতীয় ভূত-প্রেত দৈত্য দানো (Evil spirit) ইত্যাদিকে বিদায় দিয়ে, অমঙ্গল অশুভকে দুর করে লক্ষ্মীদেবী অর্থাৎ সৌভাগ্যের দেবী (goddess of Fortune) বা শস্যের দেবী (goddess of hervesting) কে গৃহাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত করা। এই প্রসঙ্গে এই পূজায় যা যা করা হচ্ছে তার পিছনে ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ায় (Magical power) অশুভ শক্তি Evil spirit) কে দুর করার যে প্রচেষ্টা বা যাদুমন্ত্র ও যাদু অনুষ্ঠান রূপে আদিম সমাজে (primitive society) যা প্রচলিত ছিল সেটির একটি লোকায়ত রূপ এই এর মধ্যে ফুটে উঠেছে। অতীন্দ্রিয় শক্তির ওপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করে যেমন দেব-দেবীর কল্পনা করা হয়েছে, তেমনি এ শক্তির উপর ব্যক্তিত্ব আরোপ করে ভূত-প্রেত, দৈত্য দানবের কল্পনাও করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মৃতের আত্মাই প্রধানতঃ ভূতে রূপান্তরিত হয়। দেহ ধ্বংস হলেও, দেহাবস্থিত আত্মা মানুষের সমাজ ছেড়ে যেতে চায় না, এদের সংখ্যাও কম নয়, এদের বিচিত্র কার্যাবলীরও অভাব নেই। অপদেবতাদের সঙ্গে দেব-দেবীদের পার্থক্য ও মিল দুইই আছে। দেব দেবীদের (good spirit) মত অপদেবতা (Evil spirit or ghosts) মানুষের মঙ্গল ও ক্ষতি উভয় কাজই করতে পারে। বাংলাদেশের লোকায়ত সমাজের ধারণা বা বিশ্বাস গাছের আগায়, পাহাড়ে গুহায়, বাঁশ ঝাড়ের অন্ধকারে শাওড়া গাছের ঝোপে, ঘরের আবর্জনা স্তূপে, অন্ধকার ঘরের কোণায়, ছাইগাদায়

এই সব অশরীরী জীবেরা ঘোরা ফেরা করে ও ওঁত পেতে বসে থাকে মানুষের ক্ষতি করার জন্যে। তাই কেবল লোক সমাজেরই নয়, সকল দেশের সকল ধর্মেরই কোন না কোন ব্যক্তি বা শ্রেণীকে ধর্মের বিধি নিষেধ অনুযায়ী নৈর্ব্যক্তিক শক্তি (impersonal power) বা অতি প্রাকৃতিক শক্তি (supernatural power) যেমন দেব-দেবী, ভূত প্রেত প্রভৃতির সন্তুষ্টির জন্য কিছু না কিছু অনুষ্ঠান যাগ-যজ্ঞ, আচার ব্রত বা ক্রিয়ানুষ্ঠান পালন করতে হয়। এতে অপদেবতা পালিয়ে যায়, দেবতা সন্তুষ্ট হন। পূর্ব বাঙলার এই গারসী পূজানুষ্ঠানটি সেই রকমই একটি অপদেবতা বিদায় ও দেবতার প্রতিষ্ঠার জন্য একটি অনুষ্ঠান। লেখিকা যে ভাবে এই অনুষ্ঠানটির বর্ণনা দিয়েছেন তার মধ্য থেকেই উপরোক্ত মন্তব্যের যাথার্থ অনুধাবন করা যাবে। যথা :

'পথের মাঝখানে গারসী পূজার দ্রব্য সম্ভার নামনো হইল। লবঙ্গরাও কুলায় কাঠি দিতে দিতে বাহির হইয়া আসিল। কামিনীর মা পাট কাঠিতে আগুন ধরাইয়া দিল। আগুন জ্বলিতে লাগিল দাউ দাউ করিয়া। ভানুমতী বরণের ডালা হইতে প্রত্যেকটি জিনিস অগ্নি স্পর্শ করাইতে লাগিল। পাটকাঠির ছোট ছোট জলন্ত অংশ লইয়া আরম্ভ হইল ধুম পান। গারসীর পাটকাঠির ধোঁয়া গলায় গেলে সর্দি-কাশি হয় না, গলার অসুখ হয় না। এমনি জাগ্রত এবং মহা মূল্যবান সেই ধোঁয়া।' এই কুলার বাজনা, পাট কাঠির আগুন, তার ধুমপান ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি আদিম যাদু ক্রিয়ারই একদিন অংশ ছিল এখন তা লৌকিক পূজানুষ্ঠানে রূপান্তরিত। এরপর ভূত তাড়ানোর মন্ত্র শুরু হয়েছে : ঠাকুমা পাটকাঠিতে দুই একটা টান দিয়া কাশিতে কাশিতে ভূতের মন্ত্র আওড়াইতে লাগিলেন—

ভূতের বাপের বিয়ে জলার কাঁধায় বাদ্যি বাজে
তাথই থই থই থিয়া।
প্যাঁচায় চড়ে লক্ষ্মী আসেন ঘরে, ভূত পালায় ডরে।
লক্ষ্মীর হাতে ধানের বালা মাথায় সোনার ছাতি,
ভূত পালালো, জ্বালা তোরা হাজার সোনার বাতি।'

তারপরই ঠাকুমা ভূত প্রেতের সংক্রান্ত বিধি নিষেধ নির্দেশ করলেন : "সকালে উঠেই আদা কুচিয়ে মাসকলাই, কলা, বাতাসা, খেতে দিস সবাইকে। তাহলে ভূত প্রেতের ভয় থাকে না। একখানা সোনা নিয়ে যাস হেমন্তর জন্তে দোতলায়,

ও যেন ধোঁয়া নেয় গলায়।" গারসী উদযাপনের নিয়ম রজনীর শেষ যামে। তখনই নাকি পথে ঘাটে ভূত প্রেতের মেলা বসে যায়। কিন্তু কুলা পিটিয়ে পিটিয়েও যখন সূর্য ওঠার কোন লক্ষণ দেখা গেল না তখন জানা গেল রাত দুটো বাজে, তখন ভানুমতী বলে উঠলো : রাত চারটাই বা কি, দুটোর বা কি? এত পুজো আচ্চা নয়, মেয়েলী ব্যাপার। চিরকাল শুনে আসছি রাত দুপুরেই ওঁনাদের বাতাস চলাচল করে।' এই সিদ্ধান্তে সকলে কুলো বাজাতে বাজাতে ছড়া কাটতে কাটতে ঘরে ফিরলো, ভূত প্রেত আপদ বালাই পোকা মাকড় চলে গেছে, লক্ষ্মী এলেন ঘরে। এস লক্ষ্মী, বস ঘাটে সোনার দিয়ে মাথে। আদিম কালের যাদু ক্রিয়াগুলি (Magical Function) পরবর্তী কৃষিসভ্যতার যুগে এসে লোকায়ত সমাজ জীবনে মেয়েলী ব্রতানুষ্ঠানেরই রূপ কেবল নেয়নি, সেই যাদুক্রিয়ার আদিম রূপটি আজও লোকায়ত সমাজ জীবনে ঝাড়ফুক, তুকতাক, জড়িবুটি, জল পড়া, ভূত তাড়ানো ইত্যাদি ক্রিয়ানুষ্ঠানের মধ্যে সজীব ও প্রত্যক্ষ হয়ে আছে। আজকের লোকায়ত সমাজ তা বিশ্বাস করে তাদের টিকিয়ে রেখেছে, সজীব ভাবে এইসব যাদুবিদ্যাকারিনীর দল এবং ওঝার দল এখনও বাংলার লোক জীবনে যে বর্তমান লেখিকা এই উপন্যাসে তার একটি সুন্দর রেখাচিত্র অঙ্কন করেছেন। সুবর্ণ স্বামীর চিঠির দেরী হওয়ার জন্যে বিনুকে নিয়ে এসেছে 'বগলা সখীর' স্থানে। সুবর্ণর মত গ্রামের মেয়েদের আজও বিশ্বাস : "বগলা বিধবা হয়ে অভয় মিস্ত্রিরীর সাথে বেরিয়ে এসে এখানে কালীর বার করেছে। কালীপুজো করে বারে বসে সে সব কথা জানতে পারে, বলে দেয় লোককে। রাজ্যের ভূতে-ধরা লোকেরা ভুত ছাড়ায়। অভয় দেয় শিকড় বাকড় ওষুধ, জলপড়া ধুলোপড়া তেলপড়া।" বেণুর এ প্রসঙ্গে মনে পড়েছে : "তাদের গ্রামেও শনি মঙ্গলবারে শ্রীমতী গোপিনী বারে বসে মা কালীর প্রতিনিধি হইয়া ভূত ভবিষ্যৎ বলিয়া দেয় ইতর সাধারণকে। শ্রীমতী বাল বিধবা, তাহার ভৈরব হইল তারিণী চরণ নমঃশূদ্র। সেখানেও ভূত-প্রেতের মেলা বসিয়া যায়।" আদিম যুগ থেকেই এই সব যাদুক্রিয়া প্রকরণের জন্য একটু উদযোগ আয়োজন এবং পরিবেশ তৈরীর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিলো, সে যুগ থেকেই এই রীতি চলে আসছে লোকায়ত গ্রামীন সমাজেও। কারণ ভূত প্রেত প্রভৃতির মত অতিপ্রকৃত শক্তিকে বশ বা পরাভূত করতে হলে এবং সাধারণ লোক সমাজকে তা বিশ্বাস করতে গেলে একটু আড়ম্বর এবং ক্রিয়া কৌশলের প্রয়োজন। বর্তমান গ্রন্থে 'বগলার থান বর্ণনায়' এবং 'ভূত-তাড়ানো ক্রিয়া বর্ণনায় এর পরিচয় উপস্থিত হয়েছে। 'বগলার থানের'

বর্ণনা: ঢেউ তোলা আটচালা ঘরখানা তিনজনে বিভক্ত। সম্মুখের অংশে জল-চৌকির উপরে এক মাটির কালীমূর্তি। সামনে মাটির ঘটের উপরে আম্র-পল্লবের উপরে সিন্দুরের কৌটায় শোভিত একটি নারিকেল। সামনে একখানা বিবর্ণ চটের আসন পাতা। সেই আসনে বসিয়াছে এক আধা বয়সী আধময়লা থান পরা এক স্ত্রীলোক। মাথায় তাহার লম্বা লম্বা জটা বক্ষে বাহুতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। গলায় ও বাহুমূলে রুদ্রাক্ষের ও জবাফুলের মালা। ইনিই বগলা দাসী, ইহারই বার হয় শনি মঙ্গল বারের ভরা দ্বিপ্রহরে। একটি বিল্বদল ও জবা মায়ের পায়ের অর্পণ করিয়া খানিকটা জিভ বাহির করিয়া বগলা দাসী কালী হইয়া যায়। উঠানভরা নিম্নশ্রেণীর স্ত্রী-পুরুষ। সকলে ভূমিতলে লুন্ঠিত হইয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিতে লাগিল। স্ত্রীলোকেরা উলুধ্বনি দিয়া উঠিল।" স্বর্ণ কালী প্রতিমাকে প্রণাম করে বসতে না বসতেই বগলা আধবোজা চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্বর্ণকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো: 'স্বর্ণ দিদি আইচে জানতে ডাক্তারবাবুর বার্তা। তেঁই ভাল রইচে। পত্তর আসিবেন শিগ্‌গির, ভাবনের কিছু নাই। ঠিক কইচি কি না?" স্বর্ণ অঞ্চলে বাঁধা পাচটা পয়সা সেখানে পুনরায় প্রমাণ করে মাথা তুলল। আবার উলুধ্বনি হল চারিদিক থেকে। কারণ মায়ের ভর যথাযত হয়েছে এবং ভবিষ্যত ঠিক বলা হল। যাদুবিদ্যা প্রসঙ্গে ফ্রয়েড বলেছেন: magic has to serve the most veried purpose—it must subject natural phenomena to the will of man, it must protect the individual from his enemies and from dangers and it must give him power to injure his enemies. (Freud Sigmund, Totem and Taboo p-78-79) অর্থাৎ যাদুবিদ্যা বিভিন্ন রকমের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে—এ বিদ্যা অবশ্যই মানুষকে শত্রু ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা করে এবং এ-বিদ্যা অবশ্যই শত্রুকে আঘাত হানার শক্তি মানুষকে দেয়, যখন গ্রাম্য মানুষদের ও অলৌকিক শক্তির কাছে একান্তভাবে অসহায় তখনই এইসব যাদুবিদ্যা লোকায়ত সমাজে তার আধিপত্য বিস্তার লাভে সক্ষম হয়। রায়বাড়ী উপন্যাসে বাগদীবৌ মলার ভূত তাড়ানোর যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার মধ্য দিয়ে উপরোক্ত মন্তব্যের যাথার্থ অনুধাবন করা যাবে।

"এবার বাগ্দী বৌ মলার ভূত ছাড়াইবার পালা। মলার বয়স বেশী নয়, মাত্র পনের—ষোল বছরের দিব্য হৃষ্টপুষ্ট লাবণ্যবতী মেয়ে। মাথায় আধ-ঘোমটা, সঙ্গে পিতামাতা ও স্বামী নফর আসিয়াছে। সাত আটদিন হইল মলার উপরে

প্রেতের আবির্ভাব হইয়াছে। সে আপনার মনে কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কথা বলে। কিছু খাইতে চায়না, স্নান করিতে আপত্তি করে।

প্রৌঢ় বয়স্ক অভয় মিস্তিরি সহসা রঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইল মলার ভূত ছাড়াইতে তাহার পরিধানে লাল টকটকে একখানা চেলির শাড়ী, গায়ে কালী নামের নামাবলী। গলায় জবাফুলের মালা। লম্বা চুলের গ্রন্থিতে একটা জবাফুল বাঁধা হস্তে একখানা সরু লিকলিকে বেত।

অভয় আচমকা মলার পিঠে এক ঘা বেত মারিয়া বিকট কণ্ঠে চিৎকার করিল 'তুই কে? কেন আইচিস মলার লগে?

কঠিন আঘাতে মলার মাথার কাপড় খসিয়া গেল। গায়ের কাপড় আলুথালু হইল। সে ভীত ব্যাকুল হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল, 'আমারে মাইরো না ওস্তাদ, দুঃখু লাগিচে।'

'মাইরব না, মাইরা তরে ছাতু ছাতু কইর‍্যা দিমু। তুই কেনে আইচিস ওর ঠাঁই, তুই কে, ক কয়ে ফ্যাল, বালতে বলিতে অভয় সজোরে আরও দুই ঘা বেত বসাইয়া দিল মলার পৃষ্ঠে বাহুতে।

মলা দুইহাতে তাহার মাকে জড়াইয়া ধরিয়া ডুকরাইয়া কাঁদিতে লাগিল 'ওরে, মারে, আমারে মাইর‍্যা ফেলাইলো, ফুলে ঢোল হইল বেবাক অঙ্গ। জলনে লাগছে আগুনের নাগাল। মারে আমারে একটুখানি জল খাইতে দে।'

মার চোখ দিয়া জল ঝরিতেছিল বার বার করিয়া। সে অভয়কে জিজ্ঞাসা করিল, 'ওস্তাদ বাবা, ম্যায়াডারে জল দিমু এ্যকটু ;

'জল দিবে, কিসের লেগে, আগে ওইটা ঘাড়ে থিকা নামুক তবে না জল? কহিয়া ওস্তাদ আর এক ঘা বেত লাগইল মলার কোমরে।

মলা মায়ের কোলের উপরে আছাড়ি বিছাড়ি করিতে লাগিল।

এক, মাটির সরায় কিসের শেকড়-বাকড়ের আগুন করাই ছিল। তাহার মধ্যে কয়েক খণ্ড হলুদ নিক্ষেপ করিয়া অভয় সরাখানা ধরিল মলার নাকের সম্মুখে ধরিয়া ফের হুঙ্কার দিল, 'ক, শিগাগরি তুই কে? তোর মার নাম কি? বাপের নাম কি? তুই কয়মাসের জ্যাহিরা? ইহারে পাইলে কনে? ক, না কইলে তরে এমনি শ্যাষ করে দিমু।'

অর্ধমূর্ছিতা মলার মুখ হইতে কাতরোক্তি বাহির হইতে লাগিল, "মোর বাপ হইচে করিম সেখ, মা হইচে কাতু বামুনি। চার মাসের সময় পাঁচি ওষুধ দিইয়া আমারে নষ্ট করে দিইছেল। আমি পাগাড়ে তেঁতুল গাছের মগডালে বস্তা

ছেলাম। মঙ্গলবারে দুপুরে মলা গেইছেল আগলা চুলে পাতা কুড়াইতে। চুল বায়ে ওর ঘাইর‍্যে চইড়্যা আইচি মুই।"

"আইচিস্ যেমতি—তেমনি এহন ছাইড়্যা যাইবি কিনা তাই ক ?"

"চাড়ুম কেনে ? সরেশ মাল পাইচি, মজা কইরা রইব ?"

"তর মজা কইর‍্যা থাকন বার করচি শয়তান। চাবুকের চোটে গায়ের ছাল —বাকলা তুইলা ছাড়ুম।" বলিবার সঙ্গে সঙ্গে চলিল চাবুক।

বিনু এই ভয়াবহ অত্যাচার দেখে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে বাড়ি যেতে চওয়াতে স্বর্ণ বললো, "ভূতটা ছেড়ে গেলেই চল যাই। ভূত-প্রেত ডাক্তার বিশ্বাস করেন না। বলেন হিষ্টিরীয়ার ব্যারাম।" এখানেই বিজ্ঞানের সঙ্গে লোক সংস্কার ও লোক বিশ্বাসের বিরোধ। স্বর্ণর কৌতুহল ক্রমশঃ বেড়েই চলে ভূত তাড়ানোর আন্তরিক প্রক্রিয়া যতই অগ্রসর হয়।

"এবারের প্রহারের চোটে মলা অজ্ঞান অবস্থায় অতি কষ্টে উচ্চারণ করিল, 'মুই যাইচি, যাইচি।" "তুই যে ছাড়ি যাইচিস তার নিশানা দে। নিশানা কি!" মলা গোঁ গোঁ শব্দে কি বলিল সাধারণে বুঝিতে পারিলনা। অভয় কিন্তু ঠিক বুঝিয়া অট্টহাস্য করিয়া কহিল, "কাঁচ্চা ব্যাল নিশানা। হাঃ হাঃ, কাঁচ্চা ব্যাল।"

জঙ্গলের মধ্য হইতে অকস্মাৎ একটা কাঁচা বেল ধুপ করিয়া উঠানে আসিয়া পড়িল। মেয়েরা আনন্দে উলুধ্বনি দিতে লাগিল, মলার স্বামী সোয়া পাঁচনা পয়সা কালী প্রতিমার সামনে রাখিয়া আভূমি নত হইয়া প্রণাম করিয়া, নখে খুঁটিয়া খানিকটা মাটি লইয়া স্ত্রীর মাথায় সারা গায়ে মাখাইয়া দিতে লাগিল। কিন্তু মলা অচৈতন্য, তাহার সাড়া নাই।" এরপর শুরু জলপড়া. তেল ও ধুলা পড়ার চিকিৎসা। এটি একটি লৌকিক পদ্ধতির চিকিৎসা। যথা :

"অভয় পাকা ওস্তাদ ভূত ছাড়াইবার, সে তাড়াতাড়ি লইয়া আসিল এক ঘটি জলপড়া, তেলপড়া, মাটির সরায় করিয়া পড়া ধুলা। মলার দাঁতে দাঁত লাগিয়া গিয়াছিল। লোহার শিক দিয়া দাঁত খুলিয়া জল দেওয়া হইতে লাগিল মুখে-চোখে। তেল দেওয়া হইল থাবলা খাবলা মাথায়। নফর সারা গায়ে ধুলা মালিশ করিতে লাগিল। সেবাযত্নে অনেকক্ষণ পরে মলার জ্ঞান হইল, সে চারিদিকে তাকাইতে লাগিল ফ্যাল ফ্যাল করিয়া।

এবার আসরে প্রবেশ করিল একটি কুড়ি বাইশ বছরের কৃষাণ ছেলে, তাহাকে তেপান্তরের মাঠে শেওড়া গাছের পেত্নী দৃষ্টি দিয়েছে।"

এইভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় আজ গ্রামবাংলার লোকায়ত সমাজে সেই

আদিম ভূত-প্রেত বিশ্বাস যেমন বাসা বেঁধে আছে, ঠিক তেমনি, আদিম যুগের গুণিন বা সর্দারের মত গ্রামের লোকায়ত সমাজে ওঝা (Magic Practitioner) গুণিনও অবস্থান করেছে। তাই ভূত তাড়ানোর বেত মারার মত আসুরিক প্রক্রিয়াও যেমন আছে, তেমনি পাশাপাশি শিকড় বাকড়ে আগুন, হলুদ নিক্ষেপ, নিশানা দেওয়া ইত্যাদি তুকতাক গুলিও বর্তমান আছে। আবার এরই সঙ্গে জল পড়া, তেলপড়া, ধুলোপড়া—সবকিছু লোক ওষুধের (folk-Medicine) ও ব্যবহার হচ্ছে। যদিও লোকজীবনের অভ্যন্তরে বহু পরিবর্তন ঘটেছে, কিন্তু তার অভ্যন্তরে সমাজদেহের ভিতরে এখনও আদিমযুগের লৌকিক বিশ্বাসগুলি প্রবাহিত হয়ে চলেছে। 'রায়বাড়ী' উপন্যাসের লেখিকা এই উপন্যাসের ভিতরে এ ধরণের বহু লৌকিক উপাদান উপস্থিত করেছেন।

'ধুতুম পাখী' সম্পর্কিত একটি পুরাকথা (Myth) লেখিকা উপস্থিত করেছেন বিনুর জবানীতে। কেন ধুতুম পাখী তার ডাকে বলে, 'ধুতুম, তুই থুলি না মুই থুলি, টাকার থলি কুথায় থুলি'। তার পিছনকার একটি পুরাকথা আছে। বিনুর জবানীতে শোনা যাক :

"ধুতুমের গল্প আর কি—এক গাঁয়ে ছিল দুই বামুন আর বামুনী। দুইজনার টাকার লোভ খুব। ভিক্ষে করে না খেয়েদেয়ে তারা এক থলে টাকা জমিয়েছিল, হঠাৎ টাকার থলেটা কোথায় হারিয়ে গেল। টাকার শোকে তারা পাখী হয়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল টাকার থলি। খুজতে খুজতে যখনই দেখা হয় দুজনার তখনই ঝগড়া বেধে যায়। টাকার থলি তুই রেখেছিলি না আমি রেখেছিলাম ? কোথায় গেল ?" তাই ওই বিকট ধুতুম, 'তুই থুলি না মুই থুলি ?'

সুতরাং বলা যেতে পারে রায়বাড়ি উপন্যাসখানি সে যুগের লেখিকার এযুগের প্রকাশিত উপন্যাস হলেও এটি একাধারে একান্নবর্তী পারিবারিক জীবনের উপন্যাস সমাজতত্ত্ব ও লোক সাহিত্যের আকর গ্রন্থ। প্রবাদ-প্রবচন-ছড়া ব্রতকথা, পূজানুষ্ঠান, আচার আচরণ, লোকবিশ্বাস, রূপকথা, পুরাকথার একটি কোষ গ্রন্থ রূপে এই উপন্যাসটিকে অভিহিত করা যেতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসে ভাষা ও প্রবাদ প্রবচন

লোকসাহিত্যে প্রবাদ একটি বিশিষ্ট বিষয়। এই প্রবাদ সম্পর্কে বলা হয়েছে A proverb is a short sentence based on long experience অর্থাৎ প্রবাদ হচ্ছে সংক্ষিপ্ততম বাক্যে জীবনের দীর্ঘতম অভিজ্ঞতার প্রকাশ। কিন্তু প্রবাদের বা প্রবচনের সবচেয়ে বড় পরিচয় প্রবাদ ভাষাকে সমৃদ্ধতর করে এবং ভাষার মধ্যকার প্রাণ শক্তিকে বিপুল ভাবে বর্দ্ধিত করে। কারণ প্রবাদ লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয়ের তুলনায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ রচনা। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কথায়, রূপকে, উপমায়, এবং ব্যঞ্জনায়, ব্যঙ্গ, সরসতায়, জীবনের এক একটি গভীর সত্য ক্ষুদ্রতম বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয় বলে প্রবাদ একদিকে যেমন জীবন সত্যকে প্রকাশ করে অপর দিকে ভাষাকে জোরালো বক্তব্য ধর্মী ও সজীবতর করে তোলে। একজন লোকশ্রুতি বিদ বলেছেন যে প্রবাদের ছয়টি গুণ থাকা প্রয়োজন: সংক্ষিপ্ততা, সরলতা, সাধারণ জ্ঞান ও গুণ সম্পন্নতা, অলঙ্কার, প্রাচীনতা এবং সত্যতা। প্রথমতঃ প্রবাদ অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হবে, দ্বিতীয়তঃ অত্যন্ত মহৎ ও সাধারণ হবে, তৃতীয়তঃ প্রবাদ সাধারণ গুণ ও জ্ঞান সম্পন্ন হবে, চতুর্থতঃ রূপক উপমা অলঙ্কারের সৌন্দর্য প্রবাদে প্রকাশিত হবে, পঞ্চমতঃ এর মধ্যে প্রাচীন বা অতীত জীবনের নানা তথ্য সন্নিবেশিত থাকবে আর ষষ্ঠতঃ প্রবাদের মধ্যে জীবন সম্পর্কে সত্যতা প্রকাশিত হবে। প্রবাদ সম্পর্কে যে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রচলিত আছে তাতে দেখা যায় প্রবাদের প্রধানতঃ তিনটি গুণ বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তাঁরা বলেছেন: সংক্ষিপ্ততা (brevity) অর্থ বহতা (sensibility), সরসতা (saltness)। উপরোক্ত গুণ বা বৈশিষ্ট্য গুলির প্রেক্ষাপটে প্রকৃত প্রবাদের বিচার করা চলতে পারে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের নাটক, উপন্যাস ইত্যাদির ভাষা ব্যবহারে প্রবাদের প্রভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়। প্রবাদকে যদি লোকায়ত জীবনের ভাষাগত উপাদান হিসাবে গ্রহণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা গঠনের ক্ষেত্রে প্রবাদের দান অসামান্য। নাটকের প্রথম যুগে রাম নারায়ণ দীনবন্ধু ইত্যাদিদের ভাষার মধ্যে যেমন প্রবাদ প্রবচন অত্যাধিক, ঠিক তেমনি

বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগে প্যারিচাঁদ, বঙ্কিমচন্দ্র ইত্যাদির মধ্যে প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহারও অধিকতর ভাবে। এর প্রধান কারণ হিসাবে বলা যায় আধুনিক গদ্য সাহিত্য গঠনের প্রথম যুগে কি নাট্য সাহিত্য, কি কথাসাহিত্য উভয়কেই প্রাচীন বাংলা ভাষা, সংস্কৃত ভাষা রীতি এবং লৌকিক শব্দ ধারা ব্যবহার করতে হয়েছিলো। পরবর্তী যুগে আধুনিক সাহিত্যের একটি মিশ্র ভাষা রীতি গড়ে উঠার ফলে একক ভাবে লৌকিক প্রবাদ প্রবচন এর ব্যবহার কমে আসলেও প্রবাদের প্রভাবে যে প্রবাদমূলক বাক্যাংশ এবং বিশিষ্টার্থক শব্দ গুচ্ছ বা idiom গড়ে উঠে ছিলো তার ব্যবহার কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণে রয়ে গেল। আবার পরবর্তী যুগে নবনাট্য আন্দোলন এর সময় এবং উপন্যাসের ক্ষেত্রে কল্লোলের যুগের লেখকরা যখন আঞ্চলিক উপন্যাস এবং নাটকে বাস্তবতা তীব্রতর করার জন্য এবং সাহিত্যকে জীবনমুখী করার জন্য আবার বাক্যের মধ্যে এবং ভাষা ব্যবহারে আঞ্চলিক শব্দ ও প্রবাদ প্রবচনের ব্যবহার শুরু করে ছিলেন।

সর্বক্ষেত্রেই প্রবাদ আর প্রবাদমূলক বাক্যাংশ এক নয়। প্রচলিত এমন অনেক বাক্য বা বাক্যাংশ আছে, যাদের অনেক সময় প্রবাদ বলেই মনে হয়, কিন্তু আসলে সেগুলি প্রবাদ নয় এগুলি খণ্ড প্রবাদ বা প্রবাদের খণ্ডাংশ ইংরাজীতে যাকে বলে proverbial phrase। বাংলা উপন্যাসের ভাষায় প্রবাদ ব্যবহারের বহু ক্ষেত্রেই প্রকৃত প্রবাদ ছাড়াও বহু এ ধরনের প্রবাদ মূলক বাক্যাংশ এর ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় যেমন আলালের ঘরের দুলালে এরকম বহু প্রবাদ মূলক বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়েছে যথা: হাড় কালি হইল, হলাহলি গলাগলি ইত্যাদি। এ ছাড়াও প্রবাদকে অনেক সময় বিশিষ্টার্থক শব্দ গুচ্ছ বা idiom রূপেও দেখা হয় কিন্তু সে গুলিও আসলে idiom নয়। বাংলা উপন্যাসেও এর যথেষ্ট ব্যবহার হয়েছে। যথা: আলালের ঘরের দুলাল এ (ক)/অনাথার দৈব (খ) গোকুলের ষাঁড়, (গ) দেঁতোর হাসি, বঙ্কিমচন্দ্রের দেবী চৌধুরানীতে, (ঘ) রূপের ধ্বজা, প্রভাত মুখোঃ (ঙ) তাল পাতার সেপাই।

এছাড়াও প্রকৃত প্রবাদ ব্যবহার বাদে বাংলা উপন্যাসের ভাষায় বহু নুতন প্রবাদ যুক্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে লেখকরাই প্রচলিত প্রবাদকে ভেঙে গড়ে নুতন ভাবে তৈরী করে নিয়েছেন। ভরতচন্দ্র থেকেই এ ট্র্যাডিশন চলে আসছিলো, যথা: বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ অথবা আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে। আধুনিক সাহিত্যের মধ্যেও এর যথেষ্ট উপাদান আছে। হুতুম পেঁচার নক্সায় এ ধরণের একটি প্রবাদ তৈরী করা হয়েছে, যথা:

ছোটবাবু ইয়ারের টেক্কা, বেশ্যার কাছে চিড়িয়ার গোলাম, নেশায় শিবের বাবা। বঙ্কিমচন্দ্রও এ ধরণের প্রবাদ তৈরী করেছেন, যথা : এইমাত্র বুড়ো বয়সের ঢেঁকি পাড়িয়া বঙ্গ-দর্শনের জন্য ধ্যান।

পরবর্তী অংশে বিভিন্ন উপন্যাস ও উপন্যাস জাতীয় রচনায় কি ধরনের প্রবাদ ব্যবহার করা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা উপস্থিত করা হলো যার থেকে বোঝা যাবে লৌকিক উপাদান কি ভাবে বাংলা উপন্যাসের ভাষাকে সমৃদ্ধ করেছে।

প্রবাদ, বিশিষ্টার্থক শব্দ ও ছড়া প্রয়োগের তালিকা :

আলালের ঘরের দুলাল

১. অনলে জল পড়িল ২. অনাথার দৈব ৩. অন্ধকারে ঢেলা মারিয়া
৪. অরণ্যে রোদন করা
৫. অষ্টম খষ্টম আগে মিটাইয়া নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিতে হয়
৬. আকাশে ফাঁদ পাতিয়া ৭. আগুনের ফিন্‌কি কি শেষ হয় নাই
৮. আটখানার পাটখানাও হয় নাই ৯. আপনার কথা পাঁচ কাহন
১০. আবাগের বেটা ভূত ১১. আলালের ঘরের দুলাল
১২. উঠসার কিস্তিতেই মাত ১৩. উপরে চাকণ চিকণ, ভিতরে খ্যাঁড়
১৪. উনপাজুরে বরাখুরে ছোঁড়ারা
১৫. এক কলসী দুধে একফোঁটা গোবর ১৬. ওক্ত বুঝে হাত মারবো
১৭. কড়িতে বুড়ার বিয়ে হয় ১৮. কপালে পুরুষ
১৯. কাঁচাকড়ি। ২০. কাকের মাংস
২১. কর্ম পড়িলে যবনও বাপের ঠাকুর হইয়া উঠে
২২. কাগের ছা বগের ছা
২৩. কাটিলেও রক্ত নাই-কুটিলেও মাংস নাই (ধাঁধা)
২৪. কার শ্রাদ্ধ কে করে
খোলা কেটে বামুন মরে। (ছড়া)
২৫. কারবারের হেপায় অস্থিল হইয়া গেল ২৬. কিল খেয়ে কিল চুরি
২৭. কুম্ভকর্ণের ন্যায় নিদ্রা ২৮. কেঁদে কি মাটি ভিজান যায়?
২৯. ক্ষুদ্রে পীপড়ার কামড় ৩০. খড়ে আগুন লাগা
৩১. গণ্ডায় এণ্ডা ৩২. গর্ভস্রাবে গেল ৩৩. গয়ং গচ্ছ রূপে

৩৪. গরু কেটে জুতা দানি ধার্মিকতা ৩৫. গলা ফুলা পায়রা
৩৬. গলায় দড়ে জাত ৩৭. গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল
৩৮. গুড়ের গন্ধেই পীপড়ার পাড় পিল পিল করিয়া আইল
৩৯. গুণ করে ভেড়া বানিয়েছ' ৪০. গোকুলের ষাঁড়
৪১. গোবধ করা মাত্র ৪২. গো মড়কে মুচির পার্বন।
৪৩. গোবর কুড়ে পদ্মফুল
৪৪. ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াইতে পারি না
৪৫. চণ্ডীচরণ ঘুটে কুড়োয়
রামা চড়ে ঘোড়া (ছড়া)
৪৬. চাকরে কুকুরে সমান ৪৭. চাগা আপন প্রাণ বাঁচা
৪৮. চাড় পড়িলেই ফিকির বেরোয় ৪৯. চার পো বুক হইল
৫০. চার ফেলিলেই মাছ পড়িবে ৫১. চারের উপর চার দিয়া ছিপ ফেলা
৫২. চিঁড়া দই পেকে উঠিল ৫৩. চিতেন কেটে বাহবা লওয়া
৫৪. চুলের টিকি দেখা ভার ৫৫. ছুবড়ির ফলে আমিত্তি হারাইতে হয়
৫৬. ছুঁচ চালুনা বেঁটে চালান ৫৭. ছেড়ে দিলে কেঁদে বাঁচি
৫৮. ছেলে নয় পরশ পাথর ৫৯. ছেলে মুখে বুড়ো কথা
৬০. ছেলের হাতে পিটে ৬১. ছ্যাং চেংড়ার কীর্ত্তন
৬২. জলের উপর আঁক কাটা ৬৩. জিলাপির ফের চলে
৬৪. ঝড়ে বুটা কাটিয়া মুনসিয়ানা খরচ করে ৬৫ ঝোপ বুঝে কোপ
৬৬. ঢেঁকির কচকাচ ৬৭. ঢেউ দেখে ডুবাও কেন?
৬৮. ঢোঁড়া হইয়া পড়িলেই জাঁক যায় ৬৯. তপ্ত খোলা
৭০. তিন কাল গিয়েছে-এক কাল ঠেকেছে ৭১. তীর্থের কাক
৭২. তেলা মাথায় তেল ৭৩. তেলে বেগুনে জ্বলে উঠে
৭৪. থুতকুড়ি দিয়ে ছাতু গোলা ৭৫. দক্ষিণ মশান প্রাপ্ত হওয়া
৭৬. গয়া একেবারে রফা ৭৭. দাদার ভরসায় বাঁয়ে ছুরি
৭৮. দুঃসময়ে পোড়া শল মাছটাও হাত থেকে পালিয়ে যায়
৭৯. দুধ দিয়া কাল সাপ পুষিয়া ছিলো
৮০. দুনিয়াদারি মুসাফিরি-সেরেফ আনা যানা ৮১. দৈত্যের হাসি
৮২. দৈত্যকুলের প্রহ্লাদ ৮৩. না রাম না গঙ্গা
৮৪. নাচতে বসেছি ঘোমটাই বা কেন? ৮৫. নানা মুনির নানা মত

৮৬. নেকড়ার আগুন
৮৭. পয়ের মুখে ঝাল খাওয়া
৮৮. পর্বতের আড়ালে ছিলে
৮৯. পাকা ধানে মই
৯০. পাখী পড়াইয়া
৯১. পাতা ছাপা কপাল
৯২. পাথরে কোপমারা
৯৩. পাপের কড়ি হাতে না
৯৪. পুঁটি মাছের প্রাণ
৯৫. পুঁটি মাছের মত ফর ফর করিয়া বেড়ায়
৯৬. পুরুষের দশ দশা
৯৭. পৃথিবীকে শরাখান দেখে
৯৮. পেট মোটা হইল
৯৯. প্রেতনীর শ্রাদ্ধে আলেয়া অধ্যক্ষ
১০০. প্রজা জমিদারের বেগুন ক্ষেত
১০১. প্রহারেণ ধনঞ্জয়
১০২. বগল বাজাইয়া নেচে উঠিল
১০৩. বড় গাছেই ঝড় লাগে
১০৪. বড়র পিরীতি বালির বাঁধ
ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেক চাঁদ / ভারতচন্দ্র।
১০৫. বর্ণচোরা আঁব
১০৬. বসুধাবার মত ফোঁটা ফোঁটা পড়ে
১০৭. বাঁচিলে জানেতে মহব্বত রবে
১০৮. বাঁশবনে রোদন করা
১০৯. বাওয়াজেকে বাওয়াজি তরকারিতে তরকারি
১১০. বাঘে গরুতে জল খায়
১১১. বাটীতে ঘুঘু চরিবে
১১২. বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী
১১৩. বানের জলে ভেসে যাবে
১১৪. বাপ যে পথে যাবেন ছেলেও সেই পথে যাবে
১১৫. বাপের সঙ্গে বস্তে গেলাম
১১৬. বালির বাঁধ
১১৭. বাহিরে কেচোর পত্তন ঘরে ছুঁচার কীর্ত্তন
১১৮. বিড়াল তপস্বী
১১৯. বিপদে আপদে প্রকাশ পিরীতি
১২০. বুকে বসে ভাত রাঁধে
১২১. কুড়িতে চতুর কিন্তু কাহণে কানা
১২২. বুদ্ধির ঢেঁকি! গুণবানের জেঠা
১২৩. বৃহৎ পক্ষী ছিলেন এক্ষণে দুর্গ টুনটুনি হইয়া পড়িলেন
১২৪. বেগুন ক্ষেত ঘুচে মুলা ক্ষেত হবে
১২৫. বেড়া আগুনে পড়িয়াছে
১২৬. বেল পাকিলে কাকের কি?
১২৭. ব্রজের ভাব
১২৮. ভাজেন পটোল, বলেন ঝিঙ্গা
১২৯. ভাত ছড়ালে কাকের অভাব
১৩০. ভিজে বেড়াল
১৩১. ভিটায় ঘুঘু চরাইয়াছেন
১৩২. ভিটে মাটি চাটি
১৩৩. ভেবে ভেবে দড়ি বেটে গেলি
১৩৪. মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা
১৩৫. মণিহারা ফণী
১৩৬. মতলব দ্বৈপায়ন হ্রদে ডুবাইয়া রাখা

১৩৭. মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন

১৩৮. মাটি মুটটা ধরিলে সোনা মুটা হইয়া পড়ে ১৩৯. মাণিক জোড়

১৪০. মানুষকে ঘরে মারে ১৪১. মানুষের তেলে জলেই শরীর

১৪২. মায়া কান্না ১৪৩. মুখে কালি চুণ

১৪৪. যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্য ১৪৫. যাহার কড়ি তাহার জয়

১৪৬. যাউক প্রাণ থাকুক মান

১৪৭. যে যাহাকে দেখিতে পারে না সে তাহার চলনও বাঁকা দেখে

১৪৮. যে হয় ঘরের শত্রু সেই যায় বরযাত্রী

১৪৯. যেমন কর্ম তেমনি ফল ১৫০. যেমন দেবা তেমনি দেবী

১৫১. রক্তবীজের ন্যায় বৃদ্ধি হইতে লাগিল

১৫২. রাম না হতে রামায়ণ ১৫৩. লক্ষ্মীর বরযাত্রী

১৫৪. লঘু পাপে গুরু দণ্ড ১৫৫. লাভের খুলিরাবণের চুলির মত জ্বলছে

১৫৬. লাভের মেঘও কখন দেখিতে পান নাই

১৫৭. লোভে পাপ পাপে মৃত্যু

১৫৮. সাঁকের করাত যেতে কাটি আসতে কাটি

১৫৯. শিবরাত্রির শলিতা ১৬০. শ্মশানই বৈরাগ্য

১৬১. সত্যের মার নাই ১৬২. সবে ধন নীলমণি

১৬৩. সময় জলের মত যায় ১৬৪. সমুদ্রে পড়িয়া কুল পাইলেন

১৬৫. সিংহের সন্তান কি কখন শৃগাল হইতে পারে ?

১৬৬. সুদু হাঁড়িতে পাত বাঁধিয়া ১৬৭. সুতা হাতে সার হইয়া

১৬৮. সে গুড়ে বালি ১৬৯. সোনার কাটি রূপার কাটি

১৭০. হঠাৎ বাবু ১৭১. হয়কে নয়,⋯নয়কে হয়

১৭২. হলাহালি গলাগলি ১৭৩. হাই তুলিলে তুড়ি দেয়

১৭৪. হাড় কালি হইল ১৭৫. হাড়ে ভেলকি হয়

১৭৬. হাত খাক্তি হইয়াছে ১৭৭. হাত তোলা রকমে

১৭৮. হাতের নোয়া খুলিতে হইবে ১৭৯. হিতে বিপরীত

১৮০. সাহিত্যিক ছড়া

খোপে খোপে গাঁদা মালা
রাঙা কাপর রূপার বালা,

এতক্ষণে বিয়ের শালা সাজে
সামেয়ানা ফর ফর
তালি তাতে বহুতর
জল পড়ে ঝর ঝর হাজে ।।
সেঠিয়াল মজপুত দরওয়ান রাজপুত
লুচি চিনি মনোহরা ভাড়ারেতে খুব ভরা
আল্পনার ডোরা ডোরা সাজে পৃঃ ৪৯

১৮১. সাহিত্যিক ছড়া :

হলাধর গদাধর উস্থুখুস্থু করে
ছটফ্‌ট্‌ ছট্‌ফট্‌ করে তারা মরে
ঠক চাচা হন কাচা শুনে বাজে কথা
হলধর গদাধর খাইতেছে মাথা
পড়াপড় পড়াপড় ফাড়িবার শব্দ
গুপাগুপ গুপাগুপ কিলে করে জব্দ
ঠনাঠন ঠনাঠন ঝাড়ে ঝাড়ে লাগে
সট সট্‌ সট্‌ সট্‌ করে সব ভাগে
মতিলাল দেখে কাল বসে বসে দোলে
স্থতাসার কি আমার আছরে কপালে ।

মদ খাওয়া বড় দায়

১. প্রথম প্রথম আমড়া গেছে রকম এক একবার বলে
২. প্রাণটা বাঁচলে বাপের নাম
৩. যে দিবসে উইলসেনের হোটেলে যে মাংস খাইয়ে ছিলাম, সে বড় উপাদেয়
৪. উলুবনে সম্বরণ কুল পাওনা গো
৫. এং যায় বেং যায় বল্‌লে বলে আমিও যায়,
৬. বৈঠকখানা কুরুক্ষেত্র হইয়া পড়ে
৭. অধিক খোঁচাখুচি করতে গেলে কেঁচো খুড়িতে সাপ বেরোয়
৮. তখন পরীক্ষা বলিল, হাঁ বাবা এতদিনের পর তুমি একজন কৃষ্ণ বিষ্ণু হইলে
৯. পল্লীগ্রাম হইলে হইত, সহর ছুঁতে মাছি কাটে, বাপরে
১০. খ'য়ে বন্ধন ঘোর বন্ধন, কর কাটন গো

১১. গরু কেটে জুতো দান
১২. তোমরা আমাকে গাছের উপর উঠাইয়া একর্ম কেন করাইলে '
১৩. সময় কাটানও চাই, গায়ে মানে না আপনি মোড়ল গিরি করাও চাই
১৪. যদি যথার্থ জাত জাত করিয়া বেড়াও তবে আপনাদিগের গায়ে হাত দিয়া কথাকহ
১৫. গুণ হইয়া দোষ হইল বিদ্যার বিদ্যায়
১৬. একটু পায়ের ধুলা দাও, তুমি শাস্ত্রের কল্পতরু তোমার বালাই লইয়া মরি
১৭. পক্ষিরাজ তাহার ঘরের ঢেঁকি কুমীরে হাসিতে তক্ত্য হইয়া
১৮. যে-পর্যন্ত চক্ষু কর্ণের বিবাদ না ঘুচিয়া যায় সে পর্যন্ত অতিশয় অস্থির হইতেছি
১৯. এ চাঁদের হাট ছাড়িয়া কোথায় পাত্র অন্বেষণ করিবে ?
২০. তোর চুলের টিকি দেখতে পাইনা কেনরে
২১. মত্ততার এমনি গুণ যে চক্ষে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও দেখে না
২২. চোরা শুনে ধর্মের কাহিনী, মাতালকে ভাল করা ব্যক্তের কর্ম নহে
২৩. তবে আমিও প্রস্থান করি, আর ছেঁড়া চুলে খোঁপা দেন
২৪. ছোট মুখে বড়া কথা কেন
২৫, সাহেবকে কি বলিবেন গাড়ীতে বসিয়া জড় ভরতের ন্যায় ভাবিতে লাগিলেন
২৬. ঠক বাছতে গাঁ উজড় হইবে
২৭. বাবা, ভাল ডুবে ডুবে জল খাচ্চ—তোমার পেটে এত বিদ্যা
২৮. তাহা সফল না হইলে একেবারে ঢেউ দেখিয়া না ডুবাইয়া বসিতেন
২৯. প্রথমে তিলকাঞ্চনী রকম আরম্ভ করিয়া···ক্রমে দান সাগরী গোচ হইত
৩০. বাগবাজারের নব্য সম্প্রদায় বড় ত্রিপণ্ড, তারা সর্বদা কৌতুক আমোদ লইয়াই থাকে
৩১. নেশাটি দুধ মরে ক্ষীর হইলেই বৈঠকখানা কুরুক্ষেত্র হইয়া পড়ে
৩২. ইহা শুনিয়া পক্ষিরাজের হরিষে বিষাদ হইয়া যেন দুর্যোধনের ন্যায় মৃতবৎ হইলেন
৩৩. অবশ্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন সর্বদাই করিতে হইবেক
৩৪. এখানে কৌশলের দ্বারা সকল করিতে হইবে—ধরি মাছ না ছুঁই পানি
৩৫. বাটী আসিয়া না রাম না গঙ্গা কিছুই না বলিয়া নীরব ভাবে থাকিলেন
৩৬. এ বেটারা নেকড়ার আগুন পুনুকে শত্রু ভাল করতে না পারুক মন্দ করিতে পারে

হুতোম প্যাঁচার নকশায় প্রবাদ ব্যবহার

১. আমাদের শহরে বড় মানুষদের অরগুন নেই, বরগুন আছে

২. অসইরণ সইতে নারি, দিয়ে শিকেয় ঝুলে মরি

৩. তিনি আকাশে ফাঁদ পেতে চাঁদ ধরে দিতে পারেন, হয়কে নয় করেন নয়কে হয় করেন

৪. তাহলে সাধ করে ঘোড়ার ডিম ও আকাশ কুসুমের দলে গণ্য হতেন না

৫. আপনার মুখ আপনি দেখ

৬. আপ—রুচি খানা, পর রুচি পর্‌না

৭. ছোটবাবু ইয়ারের টেক্কা

৮. উকিলের বাড়ির বাবুর পাকা চালে নজর রেখে সরে বসতে হবে, নইলে ওঠ সার কিস্তিতেই মাত

৯. জলও—উড়ন চণ্ডীর মত, জায়গা খালি হয়ে হটে যেতে লাগল

১০. বরাখুরেরা জোয়ারের বিষ্ঠার মতো সব ভেসে ব্যাড়াচ্ছিলেন

১১. শান্‌কির ইয়ারেরা 'বারে বারে মুরগী তুমি' দলে ছিলেন

১২. ইনস্‌পেক্টর মহলে একাদশে বৃহস্পতি

১৩. অ্যাং যায় ব্যাং যায়, খলসে বলে আমিও যাই

১৪. 'যায়সা দিন রহেগা' অঙ্কিত আঙটিটি পরেছেন

১৫. কচ্ছপ জলে থেকেও ডাঙ্গাস্থ ডিমের প্রতি যেমন মন রাখে। সেইরূপ অনেকে দালানে বসে বাবুর সঙ্গে কথাবার্তার মধ্যে আপনার জুতোর ওপোরও নজর রেখেছিলেন

১৬ বড় বড় বাঁশ ঝাড় সমূলে উচ্ছন্ন হলে কঞ্চিতে বংশলোচন জন্মাতে লাগলো নবো মুন্সী ছিরে বেনে, পুঁটে তেলি রাজা হলো

১৭. কাঁচ পোকার আরশুলা ধরবার রূপান্তরের মত তাদের মধ্যে অনেকেই চেহারা বদলেছেন

১৮. খ্যাঁদা পুতের নাম পদ্মলোচন

১৯. চুপে থাক থাকরে ব্যাটা কানায়ে ভাগ্নে

২০. কুকুরের বিয়েয় লাখ টাকা খরচ শহুরে অতি কম হয়ে পড়েছে

২১. কামিমনে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়লো। সেই পাপের বিষে নীলদর্পণ জন্মালো

২২. বিবিজানের সঙ্গে একত্রে বসেই চলেছেন খাঁতির নদারৎ

২৩. লোকে জানুক যে আমরাও ঐ দলের একজন ছোটখাট কেষ্টবিষ্টুর মধ্যে
২৪. কেউবা খেউড় জিতে গায়ের জ্বালা নিবারণ করলেন
২৫ আশাসোটাওয়ালা খেতাবী খুড়ো
২৬. খেলেন দই রমাকান্ত, বিকারের বেলা গোবর্দ্দন
২৭. ঘরে আছেন গুণবতী গঙ্গাজলে গোবর গুলে
২৮. গায়ে ফু দিয়ে গাড়ী ঘোড়া চড়ে ব্যাড়াচ্ছেন
২৯. গিল্‌টি কাজে পালিশ করা, বাঙ্গা টাকায় তামা ভরা
৩০. হঠাৎ যদি একটা গেঁড়ি ভাঙা কেউটে রাস্তায় শুয়ে আছে দেখতে পান
৩১. একটি গেরোর ওপর আর একটি গেরো দিলে পূর্ব্বের গেরোটি যেমন আলগা হয়ে যায়
৩২. এক পাশে কতকগুলো গোতিমওয়ালা ছেলে ন্যাংটা দাঁড়িয়ে আছে
৩৩. গোলাপ জল দিয়ে জলসৌচ
৩৪. গণ্ডায় গণ্ডায় সায় দিয়ে গোলে হরিবোল সাল্লেন
৩৫. ক্রমে অষ্ট প্রহর ঘণ্টার গরুড়ের মত উমেদারিতে . ..
৩৬. বাবু ফররা দিল ও লাল চোখে রাজাউজির মারুন
৩৭. হেথায় ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে বলিহারি ঐক্যতা
৩৮. ঘেঁটু পুজোতে চিনির নৈবেদ্য
৩৯. ...তাহলে সাধ করে ঘোড়ার ডিম ও আকাশ কুসুমের দলে গন্য হত্তেন না
৪০. ঘোমটার ভিতর খ্যামটা নেচে ঝমঝমাবো মল
৪১. চড়ুকে বা চড়কীর হাসি
৪২. চুঁচুড়ার সঙ্
৪৩. চোর চায় ভাঙ্গা বেড়া
৪৪. দশ দিন চোরের, এক দিন সেধের
৪৫. অনেক স্থলে নিমন্ত্রিতে ও কর্মকর্তায় চোরে কামারের মত সাক্ষাতও হয়না
৪৬. রাজপুত্তুর জিজ্ঞাসা কল্লেন, ছাঁদন দড়ি গোদা বাড়ী. এখন তুমি কার ? না আমি যখন যার তখন তার
৪৭. ছুচোর ছেলে বুঁচো
৪৮. ছেলের হাতে ফল দেখলে কাকেরাও ছোঁ মারে, মানুষতো কোন্ ছার
৪৯. সহুরে জয়কেতুরাও যখন যার তখন তার
৫০. হয়ত সেকালের নবাবদের মত "জান সাচ্চা এক গাড়" হবার হুকুম হয়েছে

৫৮. মদ মুরগী খেয়ে টুপভুজঙ্গ হয়ে বঙ্গমাতার মুখে চুন কালি দিচ্ছ

৫২. হিন্দু ধর্মের পাপের পুণ্যে ফাঁকি দেখাবার যত ফিকির আছে, গোসাইগিরি সকলের টেকা

৫৩. ডুবে জল খেলে শিবের বাবার সাধ্য নেই যে টের পান

৫৪. ঢাকীরে মার সঙ্গে বিসর্জন দেওয়া

৫৫. কোন পানসি খানিতে একজন তিলকাঞ্চনে নবশাখ বাবু……চলেছেন

৫৬. কায়ক্লেশে তিলকাঞ্চনে সেটির নকল কল্লে হবে

৫৭. কোথাও উকীলের বাড়ীর হেড কেরানী তীর্থের কাকের মত বসে আছেন

৫৮. হরিহর বাবু একেবারে তেলে বেগুনে—জ্বলে গ্যালেন।

৫৯ সুপারিশ ওয়ালাদের খোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেল

৬০. আগামী (বৎসরকে) দাঁড়া গুয়াপান দিয়ে বরণ করে ন্যান্

৬১. হুতোম তত দুর নীচ নয় যে দাদ তোলাকি গাল দেবার জন্য কলম ধরেন

৬২. অনেকে দু নৌকায় পা দিয়ে বিষম বিপদে পড়লেন

৬৩. ধারে হাতী কেনেন, পেমেণ্টের সময় ঠাঙ্গাঠেঙ্গি উপস্থিত হয়

৬৪. অনেকের সর্দি গর্মি উপস্থিত, কেউ কেউ সিঙ্গে ফুকলেন। অনেকেই ধুতরো ফুল দেখতে লাগলো

৬৫. শুভ কর্মে দানের দফায় নবডঙ্কা

৬৬ নামটা ঢাকের মত, ভেতরটা ফাঁক

৬৭. ছোটবাবু ইয়ারের টেক্কা, বেশ্যার কাছে চিড়িয়ার গোলাম, নেশায় শিবের বাবা

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রবাদ ব্যবহার

১. অন্ধের দিন রাত্রি নাই, ও ত কিছুই বুঝিতে পারিবেনা (দুর্গেশ নন্দিনী)

২. আমরা আকাশে ফাঁদ পাততে জানি, তাই তোমার আকাশের চাঁদ ধরে এনেছি (ইন্দিরা)

৩. আমার প্রাণটা বুঝি আঙুল ফুলিয়া কলা গাছ হইল (ইন্দিরা)

৪. আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে কাজ কি (সীতারাম)

৫. ফুলমণি তখন এক আষাঢ়ে গল্প ফাঁদিল (দেবী চৌধুরাণী)

৬. আমি আহ্লাদে আটখানা হয়ে . (ইন্দিরা)

৭. ডিপুটিটা সাহেবকে এক হাটে কিনতে আর এক হাটে বেচিতে পারে (লোকরহস্য)

৮. দেবেন্দ্র স্থির করিলেন, স্বয়ং হীরার বাড়ী গিয়া এসপার কি ওসপার যা হয় কিছু একটা করিয়া আসিবেন (বিষবৃক্ষ)

৯. কাজকর্মে মন নাই, কেবল ঘরে বসিয়া কড়ি গণিতেন (বিষবৃক্ষ)

১০. কণ্ঠ কণ্টকে গড়িল বিধি মৃণাল অধমে (মৃণালিনী)

১১. কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল মরিবার জন্য (বিষবৃক্ষ)

১২. কেউ মরে বিল ছেঁচে, কেউ খায় কই (কমলাকান্তের দপ্তর)

১৩. তাই লোকে বলে যে, সে খেলে যে কান কড়িতেও থেকে (বিষবৃক্ষ)

১৪. রূপের ধ্বজা! যেন গাল ফুলো গোবিন্দের মা (দেবী চৌধুরাণী)

১৫. যখন মিত্রজা এত বড় গোবর গণেশ, তাকে নিয়া একটু রঙ্গ করিলে হয় না (ইন্দিরা)

১৬. আমি যদি হারামজাদী বলে থাকি, তবে যেন গোল্লায়—যাই (ইন্দিরা)

১৭. ভাল রুটির যম কিন্তু কাজে ঘোড়ার ডিম (বিষবৃক্ষ)

১৮. সে বিদ্যা বড় বিদ্যা যদি না পড়ে ধরা (ইন্দিরা)

১৯. আমার প্রণীত ছাই ভস্ম যাহা কিছু লেখা থাকে, তাহা পাঠাই (কমলাকান্তের দপ্তর)

২০. ছেলের হাতে মোয়া নয় যে ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে (কমলাকান্তের দপ্তর)

২১. আমি কমলাকান্তের ঢেঁকি—স্বর্গে ধান ভানিব (ঐ)

২২. তেলা মাথায় দেওয়া মানুষ্য জাতির রোগ (ঐ)

২৩. সূর্য্যমুখীর পোঁতা মুখ ভোঁতা হবে (বিষবৃক্ষ)

২৪. ধরি মাছ না ছুঁই পানি করিয়া তাঁহাদের ইঙ্গিত করিলাম (ইন্দিরা)

২৫. এই মাত্র বুড়া বয়সের ঢেঁকি পাড়িয়া বঙ্গদর্শনের জন্য ধান ভানিতেছিলে, আবার এ শিবের গীত কেন? (কমলাকান্তের দপ্তর)

প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে প্রবাদ ব্যবহার

১. কিন্তু—তুমি ভাটপাড়া মা গোঁসাই (রত্নদীপ)

২. খাও দাও কাঁসি বাজাও, পরের কথায় থাকতে আছে (রত্নদীপ)

৩. কথায় বলে ব্রাহ্মণের রাগ খড়ের আগুন দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে দেখিতে দেখিতে নিভিয়া যায় (জীবনের মূল্য)

৪. গঙ্গার পানে পা করেছে, তার আবার বিয়ে করা কেন (জীবনের মূল্য)

৫. কথায় বলে, গাই—বাছুরের ভাব থাকলেও বনে গিয়ে দুধ খাওয়ায় (ষোড়শী)

৬. কলকাতার লোকেদের কেতাই বুঝি এই রকম, গুরু জ্ঞান তাদের লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে (রত্নদীপ)

৭. তা যখন হল না, এই হলেই বাঁচি, ঘর পোড়া বাঁশ বা লাভ (রত্নদীপ)

৮. তাকে দেখে কি আমি চতুর্ভুজ হব (সিন্দুর কৌটা)

৯. আমরা বাড়ী শুদ্ধ লোক এতক্ষণে চোখে যে সরষে ফুল দেখছিলাম (রত্নদীপ).

১০. আপন ভাই নই, মাসতুতো ভাই, অর্থাৎ চোরে চোরে যা হয় (রত্নদীপ)

১১ সে সব কিছুই নাই—আমি হইয়াছি ঢাল নাই ভরোয়াল নাই নিধিরাম সর্দার (রত্নদীপ)

১২. তুফান উঠবে ভেবেই নৌকা ডুবিও না (রসাসুন্দরী)

১৩. ঠেলা মারলে পড়ে যান তালপাতার সেপাই (রসাসুন্দরী)

১৪. আপনি যখন ডেকে এসে দাঁড়ালেন, দেখি যে এক তালপাতার সেপাই (বাল্যবন্ধু)

১৫. আমাদের তাঁতীকুল বৈষ্ণবকুল দুকুলই যে যেতে বসেছে (মনের মানুষ)

১৬. কি ব্যবস্থা করবেন? তার তিনকুলে কেউ নেই (সিন্দুর কৌটা)

১৭. কথায় কথায় বলে বার বার তিনবার (জীবনের মূল্য)

১৮. দশের লাঠি একের বোঝা, সকলেই কিছু কিছু দিলেই হইয়া যায় (জীবনের মূল্য)

১৯. ইলগো! দাঁত দেখি তোর বয়স কত (নবীন সন্ন্যাসী)

২০. বুড়োকে চেনা ভার, দুধটুকু মরে ক্ষীর টুকু হইয়াছে (কুড়ানো মেয়ে)

২১. ঠিক ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে নিক্তির ওজনে ন্যায়মত কর্ম করে জমিদারী চালানো, তা একালে অসম্ভব (নবীন সন্ন্যাসী)

২২. ছোট লোকের ছেলে দুকলম লেখাপড়া শিখেছে কিনা, ধরাকে শরা জ্ঞান করে (নবীন সন্ন্যাসী)

২৩. ধানের গাছ দেখনি বোধ হয়? ধানের গাছে লাল লাল ফুল হয়, গুড়ি চিরে বড় তক্তা হয় (ষোড়শী)

২৪. সৌভাগ্য বশতঃ বড়বাবু এমন নীতিবায়ুগ্রস্ত ননীর পুতুল নহেন (নবীন সন্ন্যাসী)

২৫. ঐ গদাই পালই যত নষ্টের গোড়া (নবীন সন্ন্যাসী)

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে প্রবাদ ব্যবহার

১. বৈকুণ্ঠ মুদীর স্ফীত আঙ্গুলের সহিত কদলীকাণ্ডের উপমা (বৈকুণ্ঠের উইল)

২. আমাকে আই বুড়ো নাম খণ্ডাতে আর একজন্ম এগিয়ে যেতে হবে (শ্রীকান্ত ২য়)

৩. আতুরের নিয়ম নেই বাবা (শ্রীকান্ত ৩য়)

৪. তবু তাকে বলো না যে, আমি নিজের পায়ে নিজর কুড়ুল মেরে চলে গেলুম (চরিত্রহীন)

৫. ইট মারলেই পাটকেলটি খেতে হয় তাতে রাগ করলে ত চলবে না. (বৈকুণ্ঠের উইল)

৬. বেনাবনে মুক্তা ছড়ান (মেজদিদি)

৭. দুকান কাটার গল্প শোননি? তারা পথের মাঝখান দিয়ে চলে (শেষ প্রশ্ন)

৮. কয়লাকে ধুলে তার রং বদলানো যায় না মা, তাকে আগুনে পোড়াতে হয় (পল্লীসমাজ)

৯. মুখ দিয়ে শুধু আমার বার হল, হায় রে! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর (স্বামী)

১০. না, কেউ কোথাও নেই কা-কস্য পরিবেদনা—থাকলে কি এই সূর্য্যি মামার দেশে আসতে পারতাম (শ্রীকান্ত ২য় পর্ব)

১১. গরীবের রাঙ্ই সোনা (শেষ গ্রন্থ)

১২. কাঁচ পোকা যেমন করিয়া তেলা পোকাকে টানিয়া আনে (চরিত্রহীন)

১৩. কাঁচ পোকা যেমন তেলা পোকা ধ'রে নিয়ে যায় তেমনি নিয়ে যেত (শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব)

১৪.. বলি, তোদের ঘাড়ে কি আর একটা করে মাথা গজিয়েছে রে (রমা)

১৫. কারো সর্বনাশ, কারো পৌষ মাস (পল্লীসমাজ)

১৬. কালীঘাটের কাঙালীর মত, সাধ্য কি তোমার একজনকে চুপি চুপি কিছু দিয়ে পরিত্রাণ পাও (চরিত্রহীন)

১৭. শাস্ত্রে আছে কুকুরকে প্রশয় দিলে মাথায় ওঠে (পণ্ডিত মশাই)

১৮. এক একটা মা কুম্ভকর্ণের ঘুম ঘুমাইলে, তাহার কচি ছেলেটা…যে প্রকার রহিয়া রহিয়া কাঁদে (শ্রীকান্ত)

১৯. ভাগ্যে কুম্ভকর্ণের নিদ্রা পলকে ভাঙ্গে না (ঐ ৪র্থ)

২০. এ পৃথিবীতে এক সম্প্রদায়ের লোক আছে তাহারা যেন খড়ের আগুন (বড় দিদি)

২১. খাল খুঁড়ে কুমীর এনো না, উপীন দা (চরিত্রহীন)

২২. কিন্তু ব্যাপারটা যেন খিচুড়ি পাকিয়ে গেল (ষোড়শী)

২৩. তুমি আর খুঁচিয়ে ঘা ক'রো না (নববিধান)

২৪. সে যে দাদার গলগ্রহ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ইহায় তাহাকে উঠিতে বসিতে বিঁধে (পণ্ডিত মশাই)

২৫. এরা আপনার লোক, জ্ঞাত গোষ্ঠী, এমন কি মণি মাণিক্যের এপিঠ ওপিঠ বললেও অত্যুক্তি হয় না (দেনাপাওনা)

২৬. ঐ যে কথায় বলে, গাঁয়ের যুগী ভিক্ষা পায় না (বৈকুণ্ঠের উইল)

২৭. তিন মাস হইতে শিক্ষকেরা মাহিনা পায় নাই, সুতরাং ঘরের খাইয়া বন্য মহিষ তাড়াইয়া বেড়াইতে আর কেহ পারিতেছে না, (পল্লীসমাজ)

২৮. বিদেশী বিধর্মীর হাতে আমাদের মত বিভীষণ আর কেউ নাই (গৃহদাহ)

২৯. সেজ বৌ অধিকতর কঠোর স্বরে বলিলেন, আমরাও ঘাস খাইনে দিদি, আমরাও সব বুঝি (নিষ্কৃতি)

৩০. ওরে বাপু, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেলে কি চলে (চরিত্রহীন)

৩১. ঘরে ঢুকলে জাত যাবে না? ঘ্রাণে ও যে অর্দ্ধভোজনের কথা শাস্ত্রে লেখা আছে (নববিধান)

৩২. শিরোমণি মশায় ঘ্রাণে অর্দ্ধভোজনের কাজটা সেরে নিলেন নাকি (ষোড়শী)

৩৩. আচায্যিত চুনো পুঁটি, রুই, কাতলাও আছে (পল্লীসমাজ)

৩৪. ইতিপূর্বে পাঁচ ছয় দিন ইন্দ্র চুরি বিত্তা বড়বিদ্যা সপ্রমাণ করিয়া প্রস্থান করিয়াছে (শ্রীকান্ত ১ম)

৩৫. যখন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলুম…… (নিষ্কৃতি)

৩৬. চামার, চোখের চামড়া বলে কি কোন বালাই নেই (শ্রীকান্ত ৪র্থ)

৩৭. তোমার বাপকেও সে চোখের জলে নাকের জলে করে ছেড়েছিল (পল্লীসমাজ)

৩৮. আরে তোর কর্ম মেয়ে মানুষ রাখা? ছাগলকে দিয়ে যব মাড়ানো গেলে লোকে আর গরু পুষত না (চরিত্রহীন)

৩৯. তুই থাম, ছেলে মুখে বড়ো কথা বলিস নে (পল্লীসমাজ)

৪০. আরে, না, না, একি ছেলের হাতের নাড়ু (শ্রীকান্ত ৩য়)

৪১. কুমীরের সঙ্গে বাদ করে কি করে জলে বাস করে, তাই আমাকে দেখতে হবে (পণ্ডিত মশাই)

৪২. বহুকাল ধরে আপনাদের জলকে কখনো উঁচু কখনো নীচু ব'লে এ দেহটার মেদ মাংসই কেবল পূর্ণ করেছি (দেনাপাওনা)

৪৩. তোমার অনুচরগুলো সন্ধান পেলে জামাই আদর করবে না (ঐ)

৪৪. ওঃ তোমার মনে জিলিপির প্যাঁচ (শ্রীকান্ত ২য় পর্ব)

৪৫. মনে করেছ, জেঁাকের গায়ে জেঁাক বসে না (একাদশী বৈরাগী)

৪৬. টাকা যার মকদ্দমা তার (দেনাপাওনা)

৪৭. ক্ষেন্তি বামনিকে ঘাঁটালে ঠক বাছতে গাঁ ওজড় হয়ে যাবে (পল্লীসমাজ)

৪৮. ডাইনের হাতে ছেলে বিশ্বাস করা যায় না (নববিধান)

৪৯. একমাত্র পুত্র সমর্পণ ডাইনির হাতে? (দেনাপাওনা)

৫০. মিথ্যে তিলকে তাল করে কষ্ট পাবেন না (চরিত্রহীন)

৫১. ও ডালে ডালে বেড়ায় ত আমি পাতায় পাতায় বেড়াই যে (পল্লীসমাজ)

৫২. ময়ূর পুচ্ছ পাখায় গুঁজে দাঁড় কাক কখনো ময়ূর হয় না (গৃহদাহ)

৫৩. ঝোঁকের মাথায় একটা কথা বলিয়াছি বলিয়াই দাতা কর্ণগিরি করিতেই হইবে তাহার অর্থ কি? (শ্রীকান্ত ৪র্থ)

৫৪. কেবল রাতদিন, ঝগড়া, কিচি-মিচি, দাঁতের বাদ্যি (চরিত্রহীন)

৫৫. তাই আমি হয়েছি দুচক্ষের বিষ (চরিত্রহীন)

৫৬. ওর এমনি কপাল যে, ও চাইলে সমুদ্দুর পর্যন্ত শুকিয়ে যায়, পোড়া শোল মাছ জলে পালায় (শ্রীকান্ত ৪র্থ)

৫৭. ধনে পুত্রে লক্ষ্মী লাভ করে আপনি রাজা হোন (রমা)

৫৮. তোরাও ত বাপু, ধনুক ভাঙ্গা পণ করে আছিস স্বয়ং কার্ত্তিক নইলে মেয়ের বিয়ে দেব না (বামুনের মেয়ে (

৫৯. এ কি ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা আমার (পল্লীসমাজ)

৬০. আপনি যে সকল নষ্টের গোড়া তা তাদের জানতে বাকি নেই (পল্লীসমাজ)

৬১. নিজের নাক কেটে পরের যাত্রা ভাঙবার যে একটা কথা আছে; এলে তাই দেখি (শ্রীকান্ত)

তারাশঙ্করের উপন্যাসে প্রবাদ ব্যবহার

১. খাটে খাটায় দুনো পায় (গণদেবতা)

২. ডান ঠাঙ্‌টা লটর পটর, বাঁ ঠাঙ্‌টা খোঁড়া, বাবা বদ্দিনাথের ঘোড়া (গণদেবতা)

৩. ফেল কড়ি মাখ তেল (গণদেবতা)

৪. দশে মিশে করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ

৫. বেটা ছুঁচোর গোলাম চামচিকে

৬. গ্রামের ছোট বড় নাই

৭. ফাগুনের আট, চৈত্রের আট, সেই তিল দায়ে কাট

৮. পটল ফুইলে ফাল্গুনে, ফল বাড়ে দ্বিগুণে

৯. চৈতে মথর, বৈশাখে ঝড় পাথর জ্যৈষ্ঠে মাটি ফাটে, তবে জেনো বর্ষা বটে

১০. চাষ আর বাস

১১ হারালে পায় মলে জীয়োয়

১২. ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারা

১৩. এক তারা নাড়া খাড়া, দুই তারা কাপালের, তিন তারা চাষী-ভূষি, চার তারা পাটে বসি, পাঁচ তারা ঘোর ঘোর

১৪. ডান পাটা লটোর পটোর বাঁ পাটা খোঁড়া বাবা বদ্দিনাথের ঘোড়া (ধাধা)

১৫. হাসিস না লো কালামুখী আর হাসিস না, লাজে মরি গলায় দড়ি লাজ বাসিস না (কবি)

১৬, আমার বিয়ে যেমন তেমন, দাদার বিয়ের রায় বেঁশে, আর ঢকাঢক মদ খেসে (হাঁসুলী বাঁকের উপকথা)

১৭. রাজার পাপে রাজ্য নাশ, মণ্ডলের পাপে 'গেরাম' নাশ কত্তার পাপে গেরস্ত ছারখার, পিতের অর্থাৎ পিতার পাপে পুত্রের দণ্ড

১৮. আষাঢ়ে কাড়ান পায়কে? শাঙনে কাড়ান ধানকে
ভাদুরে কাড়ান শীষকে, আশ্বিনে কাড়ান কিসকে

গিরীবালা দেবীর 'রায়বাড়ী' উপন্যাসে ব্যবহৃত ছড়া ও প্রবাদ প্রবচণ:

১. অবুঝকে বুঝাব কত, বুঝনাহি মানে, ঢেঁকিকে বুঝাব কত, নিত্য ধান ভানে।

২. বুলবুলি রে ভাই, একটা বড়ই (কুল) ফেলে দে, বাড়ি চলে যাই।

৩. প্রসাদ আমার সোনার ছেলে, তার কপালে ছার কপালে।

৪. আচারী বামনি বচনে মিঠে, দশ কাঠা চালের এককাঠা পিঠে।

৫. কা-কা-কা-তিতে বাড়ি থেকে মিঠে বাড়ী যা, গোয়ালে বাথানে যা, দই দুধ খা।

৬. ছলাদারি বলার বৌ, কত ছলা জান, কলা বনে নাগর রেখে ডাগুর ধ'রে টান।

৭. যেই না আমার কালো-জিরে, তার আবার মাথার কিরে।

৮. ঘিয়ের চাঁছি, দুধের সর, তাতেই বুঝি আপন পর।

৯. একেই উঁই মনসা, তায় ধুনোর গন্ধ।

১০. খায় বাউনি খড়ি ধুয়ে, শোয় বাউনি তুরুক নিয়ে।

১১. বাড়ী না ঘর, আমি থাকি ডোয়ার পর।

১২. যো পেলেই জোলায় বোনে। ১৩. যারে স্বোয়ামী করে হেলা, তারে রাখালে দেয় ঠেলা।

১৪. বসতে জানলে সরে না, কইতে জানলে মরে না।

১৫. ফুল তুলতে আসে বউ, ফুলত লতাপাতা
ফুলের নামে খোঁজ নাই তার বঁধুর সাথে কথা।

১৬. আদরের ধন নয়, কেষ্ট দয়াময়, স্বভাবের দোষে তার অনাদার হয়।

১৭. যেমন ব্রতের যেমন ফল, ঘটে দাও ফুল জল।

১৮. অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চর চর করে।

১৯. অভাগীর লগনে চাঁদ নাই গগনে।

২০. ছা-কর্তা বৌ-গিন্নী, সংসারে উজাড়ের চিহ্নি।

২১. নিম তিতা গিমা তিতা আর তিতা ঘর
তার চেয়ে বেশী তিতা দুই সতীনের ঘর"

২২. ভাতের বড় জ্বালা দুই, হাটু ভেঙে আসে, কানে লাগে তালা।
২৩. দধির প্রথম ঘৃতের শেষ, তরুণ ছাগ বৃদ্ধ মেষ।
২৪. সেদিন গেছে বয়ে, ঢোলকলমি খেয়ে।
২৫. আলপনা জানি মনে মনে, ধার আসে না হাতের গুণে।
২৬. কালে কালে কতই হ'ল, পুলিপিঠের ল্যাজ গজাল।
২৭. কন্যা-কন্যা উদরী রোগ, যাবৎ কন্যা তাবৎ শোক।
২৮. পাণ দিয়ে যে না দেয় চুন, সে বা পানের কিবা গুণ।
২৯. আদা কুটলাম, আদা ধুলাম, নুন দিয়ে আদা আপনি খেলাম, তিন কর্ম একলা করলাম।
৩০. যোগ্য তালির হীরে, অম্বলে পোড়ায় জিরে।
৩১. বড় লোকের নাতাপাতা, পায়ে পাগড়ী, মাথায় জুতা।
৩২. কাজে কামে কয়ো না মা আমি যুবতী,
জেঁতে জুঁতে ভাত বাড়ো, মা আমি পোয়াতি।
৩৩. হারাণী বাড়ানি কাঁঠালের কোশ, যত লোক চুরি করে হারাণীর দোষ।
৩৪. বেগুন পোড়ায় দিয়ে ঘি, নাক পোড়ালেন ঠাকুর ঝি।
৩৫. কালা যখন বাজায় বাঁশি মনে বলে দেখে আসি,
শুনিয়া বাঁশির তান অস্থির হইল প্রাণ।
৩৬. নতুন নতুন তেঁতুলের বীচি, পুরোনো হলে বাতায় গুঁজি।
৩৭. বাপের ছাশের লোক পাই, পক্ষী হয়ে উড়ে যাই।
৩৮. দন্তহীনের হাসি, বড় ভালবাসি। গায়ে মেখে কাদা, বলে দাদা দাদা,
৩৯. মায় বলে ছুটি, বাপ বলে ছুটি, ঘোমটার তলায় আমার পাকাচুলের ঝুঁটি।
৪০. বর্ষার সকল নদী অকূল পাথার ক্যামনে আসিবে বধু না জানে সাঁতার।
৪১. নাক ঘোমটা চোখ টান, সেই বৌ শয়তান।
৪২. দুরন্ত বর্ষার কাল শেয়ালে চাটিছে বাঘের গাল,
ওরে সর্প তোরে কই, কাল গুণে সকলি সই।
৪৩. এক সোন্দর তোমার দাদা, আর সোন্দর তুমি,
মাঝে মাঝে পুর্ণিমার চাঁদ ঝলক দিচ্ছে আসি।
৪৪. মন ভাল না তীর্থকর, মিছামিছি ঘুরে মর।
৪৫. যেমন মা তার তেমনি ঝি, তার বাড়ী তার নাতনীটি।
৪৬. জাত গুণে তাঁত বয়, কপাল গুণে সুতো হয়।

৪৭. খাই দাই পাখিটি, বনের দিকে আঁখিটি।

৪৮. যার মরণ যেখানে নাও ভাড়া করে যায় সেখানে।

৪৯. যত দুঃখ দিলি তুই, রইলো আমার মনে, এই দিন নিয়ে যাব সেই দিনের সনে।

৫০. বৃন্দাবনে নাবিক হয়ে করে ছিলে পার, আমরা আবার কোন কথা না জানি তোমার।

৫১. কি খাব কি খাব পরাণ করে, সুজি, চিনি, দুধের সরে,

৫২. সকল কুটুম টাকা, ইষ্ট কুটুম বাবা।

৫৩. ছোড় দিদি লো, বড় দিদি লো পটোল ভাজা খাবি?
অদল-বদল বংশী বদল, স্বোয়ামী বদল দিবি?

৫৪. যে ঘরে যে পড়ে, ভিন্ন বিধি তারে গড়ে।

৫৫. কেষ্ট বলেন কদমতলে হলাম আমি কালী,
কে আমারে কইবে মন্দ কেবা দিবে গালি?

৫৬. মাংসে মাংস বৃদ্ধি, দুধে বৃদ্ধি বল।
ঘি এ রক্ত বৃদ্ধি, শাকে বৃদ্ধি মল।

৫৭ কালা কালা করিস নে লো, গোয়ালের ঝি।
বিধাতা করেছে কালো, আমি করবো কি?
এক কালো যমুনার জল, সর্বলোকে খায়,
কালো মেঘের ছায়ায় বসে শরীর জুড়োয়।

৫৮. অসৎ কর্মের বিপরীত ফল, মশা মারতে গালে চড়।

৫৯. আমি যাব ব্রজের পথে, আমার কপাল যাবে সাথে সাথে।

৬০. হাড় মুড়-মুড় কালো জিরে, রোস্থণ কুসুম পানের বিড়ে।

৬১. আলতি ঝিঙে, জালতি ঝিঙে, ফুটলো ঝিঙের জালি,
মা বলিয়া দিল ডাক, উঠলো মনের কালি।

৬২. কা-কা-কা-! চন্দ্রমনি লেখন দিকে মাথা তুলে চা।

৬৩. নবমীতে—গা গদগদ, বাসনে এঁটো, তরকারি সুঁটো।

৬৪. যে যায় যমুনা পার, ফিরে ত আসে না আর।

৬৫. দিন গেল বৃথা কাজে রাত গেল নিদ্রে—
না ভজিলাম রাধা কৃষ্ণের চরণার বিন্দে।

৬৬. বিয়ের পরে বাড়, কলা গাছের ঝাড়।

৬৭. বাঙ্গালের সব বিটকেল, মরে যে তবু দাঁত সিঁটকেল।

৬৮. আরসী দিচি চিরণ দিচি, চুল বাঁধনের ফিতা দিচি আর কি দেওন যায়।
বাজার গুন্ধাচালি আনি, দিইচি তোর পায়।

৬৯. ভূত আমার পু॰, পেত্নী আমার ঝি, রাম লক্ষ্মণ বুকে আছে, ভয়টা আমার কি ?

৭০. থাকলে পরে চূড়াবাঁশী মিলবে কত দেবাদাসী।

৭১. মহাজন রাধিকা সুন্দরী, দাসখৎ লিখে দেয় ব্রজের হরি,
লিখিত—শ্রীবাঁকানয়ন সাকিন বৃন্দাবন, পেশা হল গোপী মন চুরি,
মানময়ী রাধিকা সুন্দরী।

৭২. বেঁচে থাকতে দেয় না ভাত-কাপড়, মরে গেলে করে দান সাগর।

৭৩. পিপীলিকা পাখা মেলে উড়িবার তরে, আকাশে উড়িয়া যায় পাখীরা ধরিয়া খায়!

৭৪. তুমি যাবে ব্রজের পথে, তোমার কপাল যাবে সাথে সাথে।

৭৫. দুই দিকে দুই সোনার চুড়ো, মধ্যিখানে খড়ের নুড়ো।

৭৬. পুকধিনা পুকধিনা মায় ভেঙ্গেছে ডানা।
পিাসছোলা দাঁড়ি, খুড়ী বুড়োধাড়ি।
ছেলেটারে নাচায় না ; পুকধিনা।

৭৭. চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে অলক ছলক দিয়ে,
খোকন সোনা পান খেয়েছে শাশুড়ী বাঁধা দিয়ে।

৭৮. আইছে আশ্বিন, গা করে মিন মিন।

৭৯. কেমনে যাও নায়ের নেয়ে নৌকা বাইয়া ?
নাও ভিড়ায়ে যাইবে পিছে পাণ খাইয়া।
আকড় ধানের হুড়ুম দিমু পাণের সাথে গুইয়া,
খাওন দাওন শ্যাষ করিয়া ডিঙ্গায় যাইও নাইয়া।

৮০. পিঠে নাই চাম, রাধা কেষ্ট নাম।

৮১. যত অনাসৃষ্টির কারখানা, শেষ রাতের কাজ দুপুর রাতে সাড়া তাড়া।

৮২. মনে বিষ, মুখে মধু, কত রঙ্গ জান যাদু।

৮৩. পবন মাঝির নাও, বাতাসে চলে যাও।

৮৪. ও ডালিম, তুই যাসনে বাপের বাড়ী,

দোলের মেলায় দিমু তোরে আসমান-তারা শাড়ী।

৮৫. সোনামণি দারকিনীর বিয়া, গুয়া নাও মীয়া—
রুই মাছ উঠ্যা কয়, আমারে না মাইরো গোঁসাই আমারে না ধইরো
আমি যামু এ বিল দিয়া, সে বিল দিয়া গাঙ বরাবর জোলা দিয়া।
অবন মাছের পবন স্বর, পাঁচ কুসুমের বিটি।
কি গলায় রসের কাটি—চাঁদা, যাবি না লো ?

৮৬. অতি দর্পে হত লঙ্কা, অতি দর্পে কুরুক্ষয়।
অতি দর্পে বলি রাজার পাতালে বসতি হয়।

৮৭. শিব গেলেন শ্বশুর বাড়ী বসতে দিলেন পিঁড়ে,
জল পান করিতে দিলেন শাল ধানের চিঁড়ে।
শাল ধানের চিঁড়ে নারে বিন্নে ধানের খই,
মস্ত মস্ত সবরি কলা কাকমারে দই।

৮৮ হায়, কি জ্বালা গলার মালা বিষম জ্বালা হ'ল,
ছাড়িতে না ছাড়ে কালা অঙ্গ মাঝে র'ল।

প্রথম অধ্যায়-এর উল্লেখ সূচী

১। World Literature/Ed. by calvin S. Brown/Pages 169/ 7th Printing, June, 1961

২। Standard Dictionary of Folklore, Mythology and legends/Ed. by Maria Leach Vol. I/ Pages 399

৩। বাঙালীর ইতিহাস / ডঃ নীহার রঞ্জন রায়। পৃঃ ৫৭৫/ সং ১৩৫৬

৪। After strange Gods, 1934 / selected Prose/ T. S Eliot/ P-20/ Penguin Edition; 1963

৫। Do | Do | Do | Do

৬। Oral Tradition / Jan Vanshina / English Edition

৭। SDFML / Page 319

৮। World literature / Ed. by calvin S. Brown / Page 169

৯। Do | Do | Do

১০। লোকসাহিত্য / রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর / পৃঃ ৫৭।

১১। ঐ | ঐ | পৃঃ ৫২।

১২। বাঙলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত / ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / পৃঃ ৩৯৫

১৩। আধুনিক বাঙলা সাহিত্য / মোহিতলাল মজুমদার

১৪। ঐ | ঐ

১৫। বাঙলা নাটকের ইতিহাস / ডঃ অজিত ঘোষ / পৃঃ ৮ / ৪র্থ সং

১৬। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস / ২য় খণ্ড / ডঃ সুকুমার সেন / পৃঃ ১০৭

১৭। বাঙলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড / ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য / পৃঃ ৭১

১৮। বাঙলা প্রবাদ / ডঃ সুশীলকুমার দে / পৃঃ ১৯ / ২য় সং ১৩৫১

১৯। বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা / ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় / পৃঃ ১২